SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Editor : *Dr. Krishnanath Bandyopadhyay*

Sub-Editor : Dr. N. K. Singh & Dr. G. K. Pathak

ISSN:2394 4889 Vol : II, Issue : IV 21 July, 2016

BOOK CORNER

An Exclusive Book Suppliers

Purana Bazar,
Dhanbad

Phone : 0326-2304268
Mob : 9835934963

Published by : *Dr. Jaygopal Mandal*, C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara, Hirapur,
Dhanbad, Jharkhand, Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

SAHITYA ANGAN ● Vol : II, Issue : IV 21 July, 2016

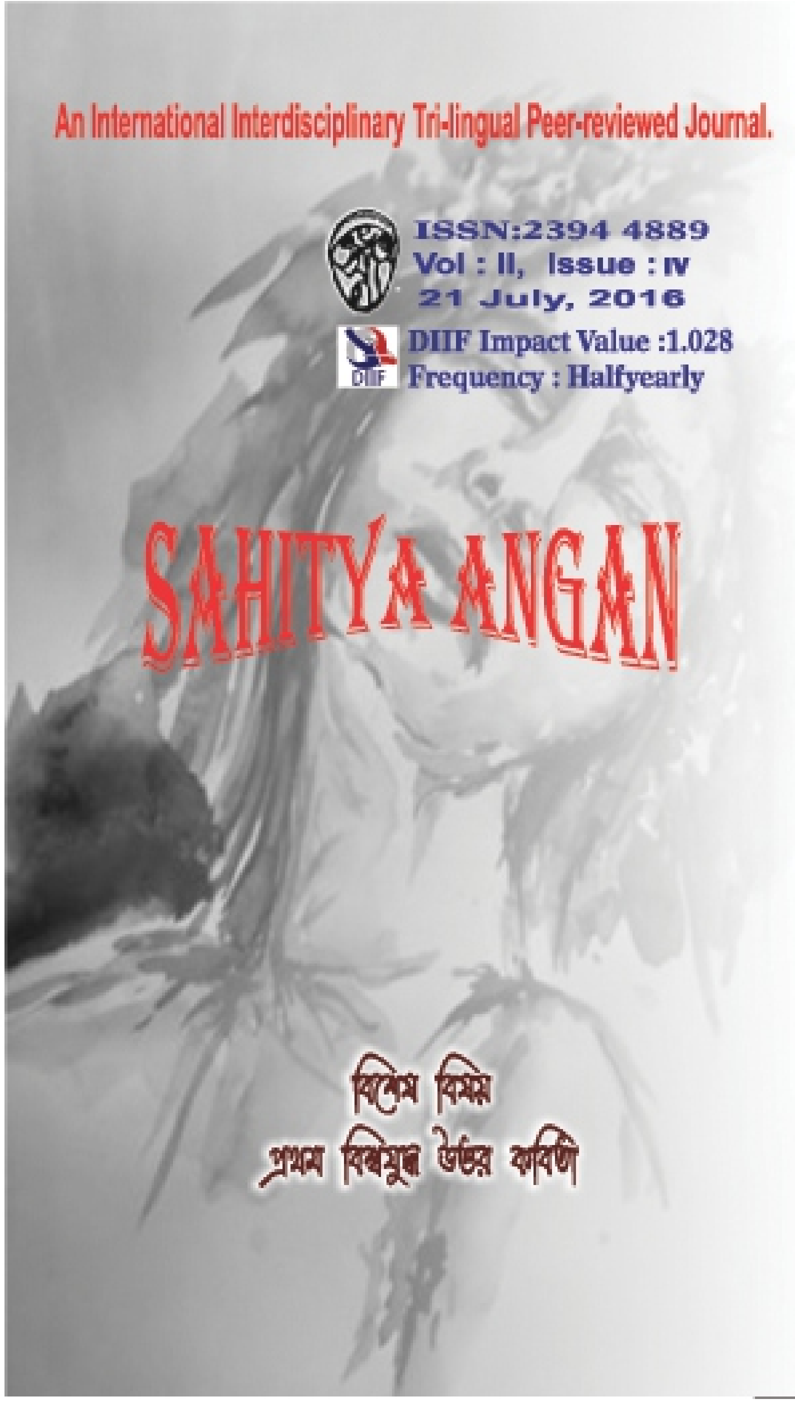

An International Interdisciplinary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

ISSN:2394 4889
Vol : II, Issue : IV
21 July, 2016
DIIF Impact Value :1.028
Frequency : Halfyearly

SAHITYA ANGAN

বিশেষ বিষয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উত্তর কবিতা

সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)

ISSN : 2394 4889,

Vol. : II, Issue : III, 15th February, 2016

Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ
শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,
ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal

ISSN : 2394 4889,

Vol. : II, Issue : IV, 21 July 2016

Chief Editor : ***Dr. Jaygopal Mandal***
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand
Editor : ***Dr. Krishnanath Bandyopadhyay*** (Physics)

Sub-Editor : ***Dr. N. K. Singh*** (Hindi) & ***Dr. G. K. Pathak*** (English)

Members from the other Countries:
Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, BanglaDesh)
Sisir Dutta(Chittagong , BanglaDesh)
Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)
Professor Barsanjit Mazumder (USA)

Advisory Board :
Dr. Tapas Basu, Dr. Sudha Goswami, Dr. A. C. Gorai, Dr. Subrata Kumar Pal, Dr. Prakash Kumar Maity, Dr. S. P. Singh, Dr. Suranjan Middey, Dr. Sudip Basu, Dr. J. M. Lugun., Dr. Soumitra Basu, Dr. S. K. Agarwal, Dr. Sukalyan Maitra, Dr. S. N. Ojha, Dr. M. M. Panja, Professor A. Ghosal, Dr. A. Bhattacharya, Dr. N. Ghosal, Dr. J. N. Singh, Dr. N. Mahto

Editorial Board :
Dr. Sharmila Banerjee, Dr. Sanjay Kumar Singh, Dr. Dhananjay Singh, Raju Ram, Rajeev Pradhan, Dr. Bhrigunandan Singh, V. Aind, Sabyasachi Mandal, Sukumar Mahanta, Dr. (Md.) Kutubuddin Molla, Dr. Samaresh Bhoumik, S. S Munda, Nasiruddin Purkait and Rajani Sukeshi Bara

© Dr. Jaygopal Mandal

Type Setting :
Manik Kumar Sahu
Kolkata - 152
Phone : 9830950380

Price : ₹ 100.00

Published by :
Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand
Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com
Website : www.sahityaangan.com

CONTENTS

কবিতার বিভিন্ন গমক—সুমন গুণ/7

কবিতায়—শ্রীজাত, শোভনা ঘোষ, দেবরাজ নাইয়া, সুমন গুণ, অনীক রুদ্র, শ্রীজয়,সব্যসাচী সরকার, নির্মল করণ, তরুণ মুখোপাধ্যায়/13-21

निर्मला पुतुल की कविताओं में नारी जीवन—संजय कुमार सिंह/22

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ—জয়ন্ত মিস্ত্রী/31

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রোমান্টিকতার আবহে গ্রাম বাঙলা —শম্পা বসু/41

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ ও তিরিশের কবিদের বাংলা কবিতায় প্রেম—স্বরাজ কুমার দাশ/55

কালান্তরে কবি অরুণ মিত্র—সাত্ত্বিক মিত্র/65

চিরপদাতিক কবিসুভাষ—রিজওয়ানা নাসিরা/77

কাব্যচিন্তার বর্ণমালা ঃ শব্দ-শক্তি-সুনীল—জয়গোপাল মণ্ডল/83

A CRITICAL STUDY OF POST-INDEPENDENCE INDIAN ENGLISH POETRY–GAGAN KUMAR PATHAK/92

শক্তির পদ্যের অঙ্গসজ্জা—সোমা মুখার্জি/98

প্রসঙ্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরা—পুতুল বৈদ্য/103

उर्मिला की विरह–भावना—निलेश कुमार सिंह/111

Ecofeminism : Interweaving Nature and Women in Theory and Practice —Soma Mandal (Halder)/116

মুক্তিপ্রেমী কবি শামসুর রাহমান—মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা/122

NO LONGER MEEK- A Global Call Of Judith Wright and Kamala Das–Indrajit Kumar/134

ছড়ায় কবিতায় খাদ্য উপকরণ—সমরেশ ভৌমিক/145

সোহরাব হোসেন ঃ কবিতার নবনির্মাণ—তৌষিক আহমেদ/158

প্রসঙ্গ ঃ ফিরে এসো, চাকা ও ব্রাত্য কবি বিনয়—পীযুষ কান্তি অধিকারী/174

কবিতায় ভাবপ্রকাশে পদারীতির গভীরতা—সুকুমার মোহান্ত/184

COST REDUCTION IN STEEL INDUSTRIES SPECIALLY BOKARO STEEL PLANT —B. N. Singh/189

Potential & Prospects of Industrial Development in Jharkhand--A Study —Manoranjan Singh/200

A Study of Dhanbad District Revenue Administration in Jharkhand State —Sharmila Sengupta/213

With Best Compliments from :

LP

LAKSMI PRESS

JHARIA (DHANBAD)

MOBILE : 9470385522

Offset Printers, Stationers, Survey Materials, Computer Stationery & General Order Supplier

প্রাসঙ্গিক

ঝলমলে আলোর ফোয়ারা, আনন্দে উদ্বেল উৎসবে মশগুল অসংখ্য প্রাণ। ফুলের সৌরভে মাতন অফুরান গন্ধ ভ্রমর। রথের রশি নেই শাস্ত্রকারদের হাতে, জনতার প্লাবনে দ্রুত গতিতে ছুটছে। রোজা পালনে মত্ত মাতাল সাধারণ নাগরিক। সেখানেও ইফতার করেন রাষ্ট্রনায়কেরা। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত গোঁড়া ধর্মপ্রাণ যুবকের দল যুদ্ধে নেমেছে অস্ত্র হাতে, একে একে নিধন করছে ফুলের বাগান। এক প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, আর এক দেশের প্রধানমন্ত্রী—দুই মুসলিম মহিলা রাজনৈতিক নেত্রীর প্রশ্ন ঃ এরা কি প্রকৃত মুসলমান? সত্যি তো সন্ত্রাস কোন ধর্ম-বর্ম পরে নেই। অথচ সারা বিশ্বে সেই ধর্ম রূপ বর্ম নিয়েই তো চলছে কচুকাটা। এবার রাষ্ট্রনেতাদের (রাজনৈতিক নায়কদের) পক্ষপাতিত্ব করার নাটক থেকে বিরত হওয়া উচিত। সবাই তো মনে প্রাণে অসাম্প্রদায়িক। তাহলে কেন এত খুন-খারাপি ধর্মের জিগির তুলে? যারা নানা সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের সদস্য (মূলত মৌলবাদী সংগঠন)— তারা কী করে কোনোও দেশের নাগরিকত্ব পায়! কতদিন আর চোখে ঠুলি পরার ভান করে মানুষ খুন করতে প্রশ্রয় দেবেন দেশের পরিচালকগণ? ভয় হয় রামরাজ্যে অভিষিক্ত শাসকদল মানুষের উন্নয়ন কিংবা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় যতটা মগ্ন, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দেয় আগামী দিনে কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে তারই রাস্তা নির্মাণে—সেই মৃন্ময়ী পথ হল তোষণ নীতি। বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই সব শাসকদের অসাম্প্রদায়িক তকমা কেনার অভিনয় করা উচিত কিনা ভাববার সময় এসেছে। শাসকদের তো একটাই ধর্ম ক্ষমতায়ন—আর সেই রস সম্পূর্ণ আহরণ করতেই তো নানা নাটকের মঞ্চায়ন। তবুও বলি—ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে একদল ঘৃণ্য কীট দংশন করছে অসহায় নিরীহ মানুষকে, বিধর্মীর নামে নিজের ধর্মের প্রকৃত মানুষকে জবাই করে রক্তের হোলিখেলায় মত্ত হয়েছে। এই অমানবের দল কখনোই প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। মানবের শৃঙ্খলে এই পশুর দল শৃঙ্খলিত হবেই।

কবি চাননি বজ্জাতের এই বেসাতি। তবুও চলছে রমরমিয়ে। এক ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে ভয়ংকর এই যুদ্ধ ভাঙছে সময়কে, সমাজকে, দেশকে। কেউ কেউ কাশ্মীরকে ভারতভূখণ্ড থেকে পৃথক করতে গণভোট দাবী করছেন। তাদের ভাবা উচিত আর কত টুকরো করতে চান, এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। বরং কোন্ কোন্ নাগরিক ভারত ছেড়ে চান তার জন্য সদিচ্ছা ভোট করা যেতে পারে। তবেই বন্ধ হবে ভাঙন। এতো একমুখীন আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ শুরু হলে বিপন্ন হবে হিমালয়, মানবতার সূর্য হবে অস্তমিত। রক্তপাতই ধর্ম—ধর্ষণে ঘর্ষণে বিস্ফোরণে পথ আল্পনা। পাশের বাড়ির দেওয়ালে রক্তে লেখা বড় বড় হরফে পৃথিবীর মৃত্যু পরোয়ানা। অবিশ্বাসের তরবারি নদীর বুকে বহমান— রক্তাক্ত করছে ঈদের চাঁদকে, কলুষিত করছে কোজাগরী রাত, ফুটফুটে জোছনা ঃ

একটা রাজপথ, ঘন আলো চাঁদের আবছা
উপস্থিতি, সৌর শক্তি ঝলমলে রেস্তোরাঁ
গমগমে জীবনের ঢল—

রমজান উৎসব ইফতার কেনাকাটা
পাশে বসে আছি বন্ধুত্বের ছবিটা—
অস্পষ্ট আলেয়ায় অসংখ্য মুসা
সাক্ষী ঢাকা থেকে মদিনা।

ঝলসে ওঠে অবিশ্বাসের ঝলকানি
আগুন টকটকে নালি
রক্তমাখা মুখ, চোখে হিংস্র সিন্ধু-নাভি
মুহূর্ত স্বপ্নরঙীন এক নতুন রাষ্ট্রের—
—ঘাতকের

এক নাটক—সবাই তোলে ধ্বনি
ছিন্ন ভিন্ন নয় করতে হবে সমন্বয়।

বলো না কোনটা সত্যি
এই প্রোজ্জ্বল যুগে?
অর্জুনের পাখির চোখ দুঃশাসনকে
ত্রস্ত অন্ধকারে নিক্ষেপ করবে এখন!
ইরফানের কণ্ঠে, অভিনয়ের মঞ্চে
সাহসী সত্য ব্রহ্মা-শব্দের গঠন
কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়
যত আর আছে খাঁন—
নিয়ে অশন বাসন আর উদার দর্শন,
মৌলবাদের শেল ঠুকে আপন বুকে
রুখে দাঁড়ায় তসলিমা নাসরিন—
সন্ত্রাসের আঁতুড় ঘর মাদ্রাসা আর মসজিদ
চরণ চাটা রাজনীতিকদের
ওপরে ওঠার সিঁড়ি ঘর।
ক্ষমতা আর আধ টুকরো চাঁদ
তারার সাথে একাকার
ভুলে যেওনা এ ফুটবলে
অধিকার একমাত্র মানবতার।

আলতাফ রক্ষা করো সমন্বয়কে
তলিয়ে যাচ্ছে অসময়ের গর্ভে।

Dr. JaygopalMandal
Chief-Editor
21 July, 2016

থেকে বাংলা কবিতা যে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না, তার কারণ এই 'আমি তোমার মাসিপিসি আমি তোমার শিশি' জাতীয় কবিতার আহ্বানে শক্তিমান কয়েকজন কবির ঝাঁপ দিয়ে দেওয়া।

আত্মমর্যাদাময় এক সংহতি চল্লিশ দশক পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা কবিতার। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো বিপরীত মেজাজের দুজন কবির মধ্যে এই সংহতির জায়গাতেই মিল আছে। কবিতাকে দিয়ে বাইরের কোনও কাজ তাঁর কিছুতেই করাবেন না। অরুণ মিত্রের গদ্যকবিতাগুলো কথা এখানে মনে পড়তে পারে। এত আঁটোসাঁটো , আপোষহীন গদ্যকবিতা বাংলা আমরা খুব বেশি পাইনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নানা ছন্দের কবিতার মোহ আমাদের বশ করেছে, কিন্তু বাংলা কবিতা তাঁর সেই কবিতাগুলো আস্তে আস্তে গ্রহণ করছে, যেখানে তাঁর স্বর জীবনানন্দকে অর্জন করে স্বমহিম হয়ে উঠতে পেরেছে। এমনকি 'চাবি' কিংবা 'যখন বৃষ্টি নামলো'র মতো অন্যছন্দের কবিতাও, খেয়াল করলে বোঝা যাবে, সুর পুরো উহ্য রেখে অসম্ভব কিছু মজা তৈরি করছে। *'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো/ কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমন সম্বলও/ নেই নিকটে—'*

এখানে, প্রথম লাইনটি একটা আবেশ তৈরি করতে না করতেই তা ভেঙে দেওয়া হলো পরের লাইনের কথা তৃতীয় লাইনে বিবৃতির মতো গড়িয়ে দিয়ে। 'সম্বলও' শব্দটি এখানে এই অলৌকিক কাজটি করেছে। আর 'চাবি' কবিতায় এটা করানো হয়েছে একটি অবিনশ্বর প্রশ্ন সাজিয়ে ঃ 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কি না'। গোটা কবিতার মধ্যে যে টলোমলো আর ভারাক্রান্ত একটা ব্যাপার ছিল, সেটা কাটাতে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও কাজ করেছে।

শব্দের তির্যক অর্থান্তরে দিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখ ছিল না, তিনি কথার উদার এক বুনন রচনা করতে চাইতেন। এটা অনেকটা তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথাবলার ঢং-এর মতোই। মাথা উঁচু করে গলা তুলে আহ্বানের এক ভঙ্গিতে কথা বলার অভ্যেস ছিল তাঁর। কবিতাতেও সেই ভঙ্গিমা বজায় রাখতে পারতেন। এটা খুব বড়ো একটা ব্যাপার। সাধারণত আমাদের কথা বলার ধরন আর কবিতার উচ্চারণের আদল খুব একটা মেলেনা। আমাদের সময়ের মান্য কবিদের কথা বলার ভঙ্গি মনে রেখে পাশাপাশি তাঁদের কবিতা মনে করুন—দেখবেন তাঁদের কবিতায় অন্য একটা তল যুক্ত হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, কবিতা তো নানারকম হবেই। সুনীলের ধরন আর শঙ্খ ঘোষের ধরন তো এক নয়। শঙ্খ ঘোষের কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কবিতার স্বরভঙ্গিমার কোন মিল নেই। তাঁর কবিতা আলাদা এক মননভঙ্গির গভীরতা নিয়ে কথা বলে। এমনকি যখন কৌতুক বা ব্যঙ্গে ধরন রাখেন তিনি কবিতায়, তখনও ভাষা তার স্বাভাবিক মন্দ্রতা

হারায় না। কিন্তু এভাবে তো রোজ কথা বলা যায় না। তাঁর কথাবলার মধ্যে অন্য শিল্প আছে। সুনীলের সঙ্গে এইদিক থেকে মিল আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মননভঙ্গির যে -মন্দ্রতার কথা বললাম, তা তাঁর কবিতাকে সম্ভাব্য নানা বিচলিত অস্বস্তি থেকে মুক্ত রেখেছে। কবিতায় সুরের চলনের প্রতি তাঁর একটা প্রশ্রয় আছে। তাঁর খুব চেনা কোনও কবিতার শীর্ষে এমন লেখাও আমরা দেখেছি ঃ 'আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরণের রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে'। এই 'সুর'-এর ওপর তাঁর ঝোঁক, আমার মনে হয়, এসেছে বাংলা কথ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সচেতন মনোযোগ থেকে। এটা একটা আদর্শের ব্যাপার। এটা নিয়ে বেশি কিছু বলা শোভন হবে না। তবে এই সচেতনতা তাঁর কবিতায় অন্তর্ঘাতের নানা সফল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছে। কিছু করার নেই। কিন্তু আবার বলছি, এই সৌম্য মন্দ্রতা তাঁর কবিতাকে অনেক তুচ্ছতা থেকে রক্ষাও করেছে। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখা অক্ষত থেকেছে অন্যভাবে। এমনিতে তাঁরও ছন্দের নানা উচ্চকিত মোচড়ের প্রতি প্রকাশ্য প্রশ্রয় আছে, আমরা জানি। কিন্তু কখনোই তিনি ছন্দের টানে নিজেকে ছেড়ে দেন না। বরং ছন্দের আর শব্দের নানা লাবণ্যময় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ঘোষণার মতো করে বলা কথাগুলোর একটা ভারসাম্য এনে দেন।

'আর্কিড সহজ ফুল-কিন্তু তারও জটিলতা চাই হাওয়ায়, বাতাসে'।

বাংলা কবিতায় জটিলতার এই পর্যটন উৎপলকুমার বসুর মতো আর কেউ আপোষহীন ভাবে মুদ্রিত করতে পারেননি। যে-অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, আর কৌতুকের দাপট ছড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায় তা একবার ধরতে পারলে তার কিছু দরকার পড়ে না। বাংলা কবিতা টলে পড়তে পড়তেও যে হাল ছাড়েনি, তার জন্য উৎপলকুমারের বিস্তীর্ণ অক্ষরবৃত্তাবলীর কাছে আমাদের নতজানু থাকা উচিত।

আরেকজন আছেন। সেই সময়ের। আলোক সরকার। উৎপলকুমার বসু যদি জটিলতার উপাসক হন, তাহলে আলোক সরকার নিরাভরনের। কবিতার গা থেকে তুচ্ছতম আর্দ্রতাও তিনি নির্মমভাবে মুছিয়ে দিতে চান। অনুভবের শুদ্ধতম পরিবহন তাঁর কবিতা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, মনীন্দ্র গুপ্ত, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, ভাস্কর চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ, দেবদাস আচার্য, রণজিৎ দাশ, অমিতাভ গুপ্ত, নির্মল হালদার, মৃদুল দাশগুপ্ত, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, গৌতম বসু, শ্যামলকান্তি দাশ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ, দেবজ্যোতি রায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, পৌলোমী সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর বাগচী, হিন্দোল ভট্টাচার্য, বিভাস রায়চৌধুরী, চিরঞ্জীব বসু, যশোধরা রায়চৌধুরী, শ্বেতা চক্রবর্তী, গৌতম মিত্র সহ আরও কয়েকজনের কবিতা আমার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ।

থেকে বাংলা কবিতা যে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারল না, তার কারণ এই 'আমি তোমার মাসিপিসি আমি তোমার শিশি' জাতীয় কবিতার আহ্বানে শক্তিমান কয়েকজন কবির ঝাঁপ দিয়ে দেওয়া।

আত্মমর্যাদাময় এক সংহতি চল্লিশ দশক পর্যন্ত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল বাংলা কবিতার। রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতো বিপরীত মেজাজের দুজন কবির মধ্যে এই সংহতির জায়গাতেই মিল আছে। কবিতাকে দিয়ে বাইরের কোনও কাজ তাঁর কিছুতেই করাবেন না। অরুণ মিত্রের গদ্যকবিতাগুলো কথা এখানে মনে পড়তে পারে। এত আঁটোসাঁটো , আপোষহীন গদ্যকবিতা বাংলা আমরা খুব বেশি পাইনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নানা ছন্দের কবিতার মোহ আমাদের বশ করেছে, কিন্তু বাংলা কবিতা তাঁর সেই কবিতাগুলো আস্তে আস্তে গ্রহণ করছে, যেখানে তাঁর স্বর জীবনানন্দকে অর্জন করে স্বমহিম হয়ে উঠতে পেরেছে। এমনকি 'চাবি' কিংবা 'যখন বৃষ্টি নামলো'র মতো অন্যছন্দের কবিতাও, খেয়াল করলে বোঝা যাবে, সুর পুরো উহ্য রেখে অসম্ভব কিছু মজা তৈরি করছে। *'বুকের মধ্যে বৃষ্টি নামে, নৌকা টলোমলো/ কূল ছেড়ে আজ অকূলে যাই এমন সম্বলও/ নেই নিকটে—'*

এখানে, প্রথম লাইনটি একটা আবেশ তৈরি করতে না করতেই তা ভেঙে দেওয়া হলো পরের লাইনের কথা তৃতীয় লাইনে বিবৃতির মতো গড়িয়ে দিয়ে। 'সম্বলও' শব্দটি এখানে এই অলৌকিক কাজটি করেছে। আর 'চাবি' কবিতায় এটা করানো হয়েছে একটি অবিনশ্বর প্রশ্ন সাজিয়ে ঃ 'লিখিও উহা ফিরৎ চাহো কি না'। গোটা কবিতার মধ্যে যে টলোমলো আর ভারাক্রান্ত একটা ব্যাপার ছিল, সেটা কাটাতে আরও অনেক কিছুর সঙ্গে এটাও কাজ করেছে।

শব্দের তির্যক অর্থান্তরে দিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের চোখ ছিল না, তিনি কথার উদার এক বুনন রচনা করতে চাইতেন। এটা অনেকটা তাঁর ব্যক্তিজীবনের কথাবলার ঢং-এর মতোই। মাথা উঁচু করে গলা তুলে আহ্বানের এক ভঙ্গিতে কথা বলার অভ্যেস ছিল তাঁর। কবিতাতেও সেই ভঙ্গিমা বজায় রাখতে পারতেন। এটা খুব বড়ো একটা ব্যাপার। সাধারণত আমাদের কথা বলার ধরন আর কবিতার উচ্চারণের আদল খুব একটা মেলেনা। আমাদের সময়ের মান্য কবিদের কথা বলার ভঙ্গি মনে রেখে পাশাপাশি তাঁদের কবিতা মনে করুন—দেখবেন তাঁদের কবিতায় অন্য একটা তল যুক্ত হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক, কবিতা তো নানারকম হবেই। সুনীলের ধরন আর শঙ্খ ঘোষের ধরন তো এক নয়। শঙ্খ ঘোষের কথা বলার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর কবিতার স্বরভঙ্গিমার কোন মিল নেই। তাঁর কবিতা আলাদা এক মননভঙ্গির গভীরতা নিয়ে কথা বলে। এমনকি যখন কৌতুক বা ব্যঙ্গে ধরন রাখেন তিনি কবিতায়, তখনও ভাষা তার স্বাভাবিক মন্দ্রতা

হারায় না। কিন্তু এভাবে তো রোজ কথা বলা যায় না। তাঁর কথাবলার মধ্যে অন্য শিল্প আছে। সুনীলের সঙ্গে এইদিক থেকে মিল আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

শঙ্খ ঘোষের কবিতায় মননভঙ্গির যে -মন্দ্রতার কথা বললাম, তা তাঁর কবিতাকে সম্ভাব্য নানা বিচলিত অস্বস্তি থেকে মুক্ত রেখেছে। কবিতায় সুরের চলনের প্রতি তাঁর একটা প্রশ্রয় আছে। তাঁর খুব চেনা কোনও কবিতার শীর্ষে এমন লেখাও আমরা দেখেছি ঃ 'আশা করি সকলেই বুঝবেন যে এই ধরণের রচনা পড়বার বিশেষ একটা সুর আছে'। এই 'সুর'-এর ওপর তাঁর ঝোঁক, আমার মনে হয়, এসেছে বাংলা কথ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর সচেতন মনোযোগ থেকে। এটা একটা আদর্শের ব্যাপার। এটা নিয়ে বেশি কিছু বলা শোভন হবে না। তবে এই সচেতনতা তাঁর কবিতায় অন্তর্ঘাতের নানা সফল সম্ভাবনা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিয়েছে। কিছু করার নেই। কিন্তু আবার বলছি, এই সৌম্য মন্দ্রতা তাঁর কবিতাকে অনেক তুচ্ছতা থেকে রক্ষাও করেছে। আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর লেখা অক্ষত থেকেছে অন্যভাবে। এমনিতে তাঁরও ছন্দের নানা উচ্চকিত মোচড়ের প্রতি প্রকাশ্য প্রশ্রয় আছে, আমরা জানি। কিন্তু কখনোই তিনি ছন্দের টানে নিজেকে ছেড়ে দেন না। বরং ছন্দের আর শব্দের নানা লাবণ্যময় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে প্রায় ঘোষণার মতো করে বলা কথাগুলোর একটা ভারসাম্য এনে দেন।

'আর্কিড সহজ ফুল-কিন্তু তারও জটিলতা চাই হাওয়ায়, বাতাসে'।

বাংলা কবিতায় জটিলতার এই পর্যটন উৎপলকুমার বসুর মতো আর কেউ আপোষহীন ভাবে মুদ্রিত করতে পারেননি। যে-অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, আর কৌতুকের দাপট ছড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায় তা একবার ধরতে পারলে তার কিছু দরকার পড়ে না। বাংলা কবিতা টলে পড়তে পড়তেও যে হাল ছাড়েনি, তার জন্য উৎপলকুমারের বিস্তীর্ণ অক্ষরবৃত্তাবলীর কাছে আমাদের নতজানু থাকা উচিত।

আরেকজন আছেন। সেই সময়ের। আলোক সরকার। উৎপলকুমার বসু যদি জটিলতার উপাসক হন, তাহলে আলোক সরকার নিরাভরনের। কবিতার গা থেকে তুচ্ছতম আর্দ্রতাও তিনি নির্মমভাবে মুছিয়ে দিতে চান। অনুভবের শুদ্ধতম পরিবহন তাঁর কবিতা।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, মনীন্দ্র গুপ্ত, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, ভাস্কর চক্রবর্তী, কালীকৃষ্ণ গুহ, দেবদাস আচার্য, রণজিৎ দাশ, অমিতাভ গুপ্ত, নির্মল হালদার, মৃদুল দাশগুপ্ত, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, গৌতম বসু, শ্যামলকান্তি দাশ, মল্লিকা সেনগুপ্ত, রাহুল পুরকায়স্থ, দেবজ্যোতি রায়, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, পৌলোমী সেনগুপ্ত, দীপঙ্কর বাগচী, হিন্দোল ভট্টাচার্য, বিভাস রায়চৌধুরী, চিরঞ্জীব বসু, যশোধরা রায়চৌধুরী, শ্বেতা চক্রবর্তী, গৌতম মিত্র সহ আরও কয়েকজনের কবিতা আমার লেখার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ।

কেউ কেউ মনে করেন, যে, বিন্যাসের একটি আয়ত্ত ছক যে-কোনো সৎ কবিরই বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত তাঁর নিজস্বতা রক্ষার জন্য। বরং বিষয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে পারেন তিনি, ছুঁতে পারেন সেইসব অপরিচিত গুল্ম ও জটলা, যা কবিতায় বিন্যস্ত হলে, পরমুহূর্তে, নতুনতর উৎসের দিকে ফিরিয়ে দেবে কবিকে। তবে, প্রকরণ আলাদা হলেও যে কবির বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়ে যায় না, তেমন নজিরও বাংলায় অনেক। বিনয় মজুমদারের 'ফিরে এলো চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' কবিতারই দুটির বিন্যাস পুরো আলাদা, কিন্তু বিনয়ের নিজস্ব উল্লাসে দুটি বই আলাদা আলাদাভাবে আলোকিত। কখনো, নিজস্বতা অর্জনের তাগিদেই প্রকরণ পালটে যায়। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'কয়েকটি কণ্ঠস্বর' অশ্রুত থাকে নি, কিন্তু 'গান্ধীনগরে রাত্রি' বইয়ের খর আর নির্ভুল উচ্চারণেই তাঁর চারিত্র্য ধরা পড়েছে।

এতটা বৈপরীত্য না থাকলেও অমিতাভ গুপ্তের কবিতাবিন্যাসে বহুমাত্রিকতা একটি বড় ধরন, একথা তাঁর অনতিমিত কবিতাসম্ভার পড়লে টের পাওয়া যায়।

প্রকাশ্য রূপকল্পের চিহ্ন না রেখেও কতটা মুখর করে তোলা যায় কবিতা, তা নির্মল হালদার-এর কবিতা পড়তে পড়তে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নির্মলের আজ পর্যন্ত যত কবিতা পড়েছি, সর্বত্র এক মেজাজ ও টান। একজন কবির এই কবিতাবিন্যাসের অবিচল প্রবণতা অবাক করার মত। অনায়াস, গভীর আর নিপুণ এমন কথার মায়ায় তাঁর ভরা তাঁর কবিতা। নিরাভরণ বর্ণনায় সহজ অর্থময়তার আলো ছড়িয়ে রাখতে পারেন নির্মল।

এই নিরাভরণ ও সরল আয়োজনের ঠিক বিপরীত বিন্যাসে কবিতা লেখেন দেবজ্যোতি রায়। 'অসম্পূর্ণ জলরেখা' বইয়ের সূচনাকবিতাটিই চিনিয়ে দিয়েছিল তাঁর স্বাতন্ত্র্যের ধরন। ছন্দের বিভিন্ন বিন্যাসে কবিতা লিখেছেন দেবজ্যোতি। কিন্তু অক্ষরবৃত্তে তাঁর অনায়াস দক্ষতা। সেখানেই তিনি সবচেয়ে সুঠাম। গৌতম বসু, অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্র সহ আরও কয়েকজন খোলা ছন্দের ভেতরেও গহন রূপকথা রচনা করতে পেরেছেন। আমার প্রথম বই 'কলি, নুনদুপুর' পর্বে এই ধরনটির দিকে ঝুঁকে ছিলাম, আমার এক তরুণ কবিবন্ধু ধরিয়ে দিলেন।

রূপক চক্রবর্তীর লেখার আছোঁলা মজা আর ফাজলামি, অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাঙা ভাঙা লাইনের দাপট সহ আরব অনেক কিছু নিয়ে আলাদা ভাবে কথা বলা যায়।

আগে লিখেইছিলাম, এই সময়ের কবিরা অক্ষরবৃত্ত থেকেও সুর বের করে আনতে পারেন। আবার, উলটো সামর্থ্যও যে দেখিনি, তাও নয়। অনেকেই চেষ্টা করেছেন ঢেউ খেলানো ছন্দেই কেজো আর নিস্তরঙ্গ চলন আনার। পৌলমী সেনগুপ্তর এই কবিতায় যেমন : 'খুশি জ্বলে ওঠে রাজশ্রী তোর বাড়ি/মা'র ঘরে তবু এখনো নেবোনো আলো/ ফার্স্ট ডিভিশান হলে এই বাতিটাই/ দশগুণ হয়ে আনন্দে লাফ দিত।'

এই ঝুঁকি নেবার প্রবণতাই বাংলা কবিতাকে রক্ষা করেছে, বাংলা-বরাক-ত্রিপুরা সহ নানা জায়গার বাংলা কবিতার কুশীলবদের সমবেত প্রতি আক্রমণে পথ কেটে নিচ্ছে নিজের। এই মুহূর্তে যাঁরা লিখতে আসছেন, তাঁরা অনেকেই লক্ষ্য করে দেখছি, প্রচারিত মোহের কবল থেকে নিজেদের বের করে নিচ্ছেন। ধারালো আর আত্মপ্রত্যয়ময় লেখালেখির একটা আবহ তরুণতম প্রজন্মের হাতে তৈরি হচ্ছে মনে হয়। তাঁদের নিয়ে পরে লেখার ইচ্ছে রইল।

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam

শ্রীজাত'র কবিতা

ঘুষ

ছোট্ট শব্দ। ঘুষ

জলের সামনে হার মানে ধুলো, আগুনের কাছে তুঁষ

তুমি নিশ্চিত, তুমি নির্ঘাৎ, তুমি তো নিরঙ্কুশ—
তেমন কিছু না। নেহাতই একটা নিরীহ শব্দ। ঘুষ।
শেষমেষ সবই সাজানো ঘটনা
লোকে যা দেখছে আসলে অত না
তদন্ত হবে। অনন্ত হবে। তাহলেই দিলখুশ।

কোনও ব্যাপার না। সামান্য এক নাছোড় শব্দ। ঘুষ।

আহা বিরোধীরা বড় খুঁতখুঁতে
জনগণ তুমি বুঝে নেবে বুথে
সাদরে না এলে আদরের চড়ে ফিরিয়ে আনবে ক্ষমা,
কোথাকার কোন উড়ে এসে বসা শান্তশব্দ। ঘুষ

শুধু বেলা যায়, বেলা চলে যাবে
সিদ্ধান্তের অভাবে অভাবে
সময়ের হাতে পেরেকের দাম......সময়ের কাঁধে ক্রুশ....
ছোট্ট শব্দ। ঘুষ।

শহিদ

শেষ যাত্রায় সঙ্গী হয়েছে দেশ,
জন্মভূমির মাটি লেগে আছে বুটে....
যুদ্ধের রং সাদায় নিরুদ্দেশ,
হাওয়া ছুটে আসে শহিদের দেহ ছুঁতে।

কাঁধ বাড়িয়েছে একশো তিরিশ কোটি।

সকলের কাঁধই একটু একটু ভার...
বেঁচে থাকে যেন সন্তানসন্ততি
তাদেরও তো কিছু গল্পের দরকার

আমার শহরে গাড়ির শব্দে রাত।
আমার শহরে জঙ্গি বলতে রোদ।
আমি তো জেনেছি, যুদ্ধের মানে ভাত।
আমি তো দেখেছি, লেখা মানে প্রতিশোধ।

এসবের চেয়ে বহুদূরে যারা লড়ে,
তারা ছুটে যায় শেষ বুলেটের টানে—
আমরা বুঝি না কতটা ঝাপটা ঝড়ে
শহিদের প্রিয় বাতাসই কেবল জানে।

একরোখা নাড়ি অশোকচক্রে ঢাকা
আরেকটুক দূরে আগুন অপেক্ষায়...
শববাহী গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছে চাকা
সেও যুদ্ধের শেষ দেখে যেতে চায়।

শোক নয় আজ। বরং গর্ব হোক।
আজকের রাত কেনা হল বহু দামে
কোনও কোনও দিন মৃত্যুও সার্থক...
সূর্য উঠুক পাঠানকোটের নামে।

সততা'র গান

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন। চরণে চরণে লেহন—
ভজনায় ম'জে ক'জনায় তাঁরা গণতন্ত্রের কে হন?

পোশাকের আজ যত না বাহার, দ্বিগুণ দেমাক জরি'র
সন্ত্রাস নয়। এমনি এমনি লুটিয়ে পড়ছে শরীর।

উত্তর নেই। মন শুধু বলে এ ঠিক বলছে, ও ভুল...
অন্যায় আজ উদযাপনের। বহু দূরে আছে কবুল।

কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন। চলনে বলনে পথিক...
সকলেরই আছে সততা, কেবল সময়ের নেই প্রতীক।

ইচ্ছে মন-গৌতম গুপ্ত

জল-জামা পরে মিটিয়ে নিও দহন
ওষ্ঠে তোমার রক্তজ্বালা বরফ ধন
আমার ঠোঁটও তৈরী আছে মুক্তো রতন
পরাগ আমায় হার মানাবে ইচ্ছে মন
ছুঁয়ে দিলাম ভালবাসার অমোঘ চরণ

দুগ্ধপায়ী

মৃণ্ময় চক্রবর্ত্তী

ঢ্যামনা কবিদের চুলোচুলি দেখে
লজ্জা হল কবিতার,
লজ্জা হল এই কারণে যে,
তারা তার নাম ব্যবহার করে।
আমার মনে হল এসব চুলোচুলি নয়
শঙ্খ লেগেছে আজ তাদের ভেতরে।
এইসব নির্বিষ ঢোঁড়া ও ঢ্যামনারা দুধ খেতে
বড় ভালবাসে।
তাদের তো শিরদাঁড়া নেই
তাই তার দায়ও নেই,
মগজও সন্দেহজনক হয়ে আসে।
দুধের বাটি যে পাত্রেরই থাক
তারা ছুটে আসবেই বিচিত্র অজুহাতে আর পায়।
আমি বুঝি এটুকুই,
তরজার ত্রিবিধ আড়ালে কিছু দুগ্ধপায়ী
রাজার প্রসাদতুষ্ট হতে চায়।

দুখুমিঞা-বিশ্বযুদ্ধের পরে

শোভনা ঘোষ

ঝড়ের তাণ্ডবে দগ্ধ খাণ্ডবে
আজো টিকে আছি—পরশু.....তারপর.....
সময় সংশয়ী; জীবন ও ধরাশায়ী;
সত্তা বড় একা—অলকে ক্ষয় হয়।

তুমি তো ভেবেছিলে, কপাট গেছে খুলে।
হায় গো, কারাগার অনিঃশেষ—
জেহাদী ধর্মে শোনিত ঘর্মে
মিশেছে; যুদ্ধের নতুন বেশ।

স্বরাজ সেইদিন—দেখেছ নুনহীন।
আজো কেঁদে ফেরে তোমার ফরিয়াদ।
চুন্নী নিভে গেল পতাকা-মিছিলে
স্বার্থ জাল বোনে; মানুষ বরবাদ।

বিংশ শতকের পথ হেঁটেও ঢের
জীবন অনিকেত; আজো মুসাফির।
মৃত্যু অনশন, চিত্ত-বিপনন
পেরিয়ে পেতে চায় বিশ্বাসী তীর।

যুদ্ধ ক্লান্ত—তুমি হে পান্থ
কীভাবে বাঁচিয়েছো তোমার বুলবুল।
গুলবাগিচাকে পারেনি পুরো খেতে
পরমাণু জিভ। এখনো এখানে ফুল।

আজো টিকে আছি; মরণ বাঁচাবাঁচি
রয়েছে পাশাপাশি। বাহিরে ঘরে—
অগ্নিবীণাটিকে বাড়ালে দিকে দিকে
নুব্জ প্রাণ জাগে উন্নত শিরে।

সত্ত্বা বড় একা, গোপন ক্ষয়-রেখা,
চুরুলিয়া দিও দ্বিপাদ তুমি—
চেতন আবডালে এই সন্ধিকালে
প্রবাহ নিয়ে এসো দুখুমিঞা তুমি।।

ট্রেকিং

দেবরাজ নাইয়া

এই সিঁড়ির গল্পটুকুই শুধু নিজের জন্যে তোলা থাক
দু একটা কথাবার্তার বন্যায় সতত ভেসে আসে রক্তের অলাপ
আমার হেঁটে যাবার আহত যাপনে, সুদীর্ঘ প্রস্তুতি
উঠি আর নামি, অথচ কোথাও
পাড়ি জমানো হলোনা কোনোদিন।

রাস্তাটা ভিড় বাড়তে বাড়তে
চওড়া হয়েছে ততোধিক
আর ততোবেশি মানুষের কথাবার্তায়
হারিয়ে ফেলছি নিজেকে,
পৃথিবীর উচ্চতম উচ্চতা থেকে,
ভেঙে পড়া পাহাড়ি শরীর এখন
ছোপ ছোপ মন খারাপ
কেউ ছুঁয়ে দেখবার আগেই
তলিয়ে যায় আহত কৌতূহল

ভুলের রাস্তায় সর্বদা পাথরের ধাক্কাধাক্কি
আহত আঘাতের মত শুধু এইটুকু সহ্যশক্তি
তীব্র করেছে জেদ
পুরনো প্রাচীরের ওদিক থেকে
সূর্যটাকে ডেকে তুলবার ইচ্ছায়
আমরা গাঁইতি চালাচ্ছি
খিস্তি করছি নিজেকে
এই বুঝি ঝগড়া শেষ হল ভাবতে ভাবতে
নতুন রাস্তার খোঁজ শুরু হয়
আর বারবার রাস্তা গুলিয়ে
সমস্ত অপেক্ষার জের ধরে হেঁটে যেতে থাকি।

বিপন্ন

সুমন গুপ

মেয়েটি যখন আরও ছোটো ছিল, স্কুলের সকালে
সামনের রাস্তা দিয়ে গুটি গুটি হেঁটে চলে যেত।
ফর্সা আর তন্বী, গোটা শরীরের ভঙ্গিতে তখনি
ঋজুতা প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু কুয়াশা মেশানো

আস্তে আস্তে, প্রায় অলক্ষ্যেই যেন এই মেয়েটি ডাগর
হয়ে উঠল, একদিন হঠাৎ তাকিয়ে
চমকে উঠি, এত দ্রুত
তরুণীটি, সেদিনের দীঘল কিশোরী, পীনোন্নত হলো!

শীৎকস্ক

অনীক রুদ্র

কুক্কুটের শীৎকারের মধ্যে
বিধৃত থাকে একতারা, অযান্ত্রিকতা,
কীটপতঙ্গের শীৎকারে ক্রমঘন ধ্বনিময়তা
তুলনামূলক মনুষ্য আজন্মের বিভিন্নতা
যুদ্ধজয়ের উল্লাস, পরাভূত হওয়ার গোঙানির রকমফের
চেনা চিত্তাকর্ষক।
অর্থবহ বিশিষ্ট শব্দ ছাড়াও ধ্বনিমাত্রিক শব্দের বিচলন
আবিষ্কার ও নিরীক্ষার পর্যায়ভুক্ত একটি অসম্পূর্ণ তালিকা
অভিধানে যার প্রকাশ সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি
একটি নীরব সঙ্গম দৃশ্য অথবা
ঠাণ্ডা মাথার হনন পক্রিয়া
গভীর অন্বেষা তথা গবেষণার বিধিভুক্ত।
বেতনভুক্ত শব্দকর্তা ও ভাষার আচার্যরা
তার কী নিদান দেবেন, কর্তব্যকর্ম
নির্ণায়ক পন্থার, অপেক্ষা করতে করতে
শীৎকার প্রকরণের এই সামান্য মাত্রা যোজনা।

শ্রীজয়-র কবিতা

জীবনের কিশলয়ে

একবার ভালোবেসে দ্যাখো
দূর থেকে ভেসে আসে তারার আলো,
অনন্ত গান ভাসে জীবনের কিশলয়ে
ক্লান্ত কান্না যায় থেমে,
হলুদ চাঁদে হয় সবুজ ঘাস
পাথরেরও চোখ ফোটে,
ডুবুরিরা ডুব দেয় নীল সাগরে
ঝিনুকের খোল থেকে মুক্ত খোঁজে।

একবার ভালোবেসে দ্যাখো
মুখভার আকাশেতে রোদ ঝলোমলো,
খটখটে রোদ্দুরে বৃষ্টি নামে
ঝর্ণার জলে দ্যাখো সাতরঙ জ্বলে,
ঢেউ ওঠে দুলে শতশত ফুলে
বুকের গহনে তাজা হয় মৃত গোলাপ,
হাঁসেরা ডুব দেয় অথই জলে
শত শত গুগলিতে জীবন খোঁজে।

একবার ভালোবেসে দ্যাখো
দূর থেকে ভেসে আসে মহাজনী আলো।

বাধ্যনগরী

এ্যাই শোনো চেঁচিয়ো না
দেখছো না রাজার মুখে আঙুল,
কোনো শব্দ হচ্ছে না—
বাধ্য নগরী যেন পুতুল।

পাঁপড়ের মতো মড়মড়িয়ে
সৌধটা খসে পড়ছে
দু'দল একাকার—
শীতের কাপড় খুঁজছে।

সূর্য আর চাঁদে যে ফারাকটা
পৃথিবী রেখেছিল ফাঁকে
সেখানে রঙগুলো বন্দী খাঁচায়
নীল-সাদা কৌটায় দেখছো না।

একদম কথা বলো না।
সব রাস্তা কংক্রীটের সাগরে ডুবছে,
খুড়োর কলটাও পোঁতা আছে
সমাপ্তি সঙ্গীতও বাজবে না।

পেয়াদার চাকরী পেয়ে চাষী-মজুর
মদের বোতলে সব রঙ পুরছে
পাথরের পাহাড়ও ভয়ে
একদম নিঃশ্বাস ফেলবে না।

তোমায় আমি বাসি ভালো

উদাস বাতাস বর্ষার জল ধানের স্পন্দন
তোমায় আমি বাসি ভালো,
ভরা নদী আকাশ জোড়া সুধাবর্ষণ
শরৎ সোনালী আলো।

দেশ দেশান্তর মুক্ত কানন
ব্যপ্ত জীবন আনন্দ-শ্বাস
সবুজ ঘাস মুকুল-ফুলে সূর্যকিরণ
হাজার বছর পুরনো মেঘদূত-প্রেমরস।

সূর্যোদয় রক্তরাঙা অমল বাতাস
স্নিগ্ধ নীল মেঘে হল্লোড়
সাদা ফুল প্রফুল্ল চাঁদ
সূর্যাস্তে বিষণ্ণতা নির্জন রাত।

দৈব কবিতা

সব্যসাচী সরকার

আমাকে কেনই বা বিশ্বাস করবে, এ পর্যন্ত যেহেতু
আমি সত্যি কিছুই বলিনি। অন্যথা করেছি। সত্যি
বলার জন্য আমি প্রস্তুত নই, কোষে তরবারি যাতায়াতে
মাঝে কতই মিথ্যে বলে যায়। রক্ত যায় নিতান্ত অভ্যাসে
ধরো, আমিও তোমার অজানা তরবারি, দেহ ওযৌবনের
দায়িত্বশীল ট্রয় প্রহরী, আমারও গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা
আমি রোজ পোশাকের সঙ্গে মেখে সামনে আমি
আমার উদাসীন চোখ, যা নিয়তির আরশিতে অগম্য
আমাকে কেনই বা বুঝবে, বুঝতে গেলেও সত্যি
প্রকোষ্ঠহীন হৃদয় লাগে। আমি স্বার্থপর
হৃদয় তেমনি চাই নিরেট পাথর, সারশূন্যহীন
ধরো, সেই হৃদয়টি ঢেলার মতো কুড়িয়ে নিচ্ছি
শান দিচ্ছি আমার অবিশ্বাসের তরবারি।

হারিয়ে গেল

নির্মল করণ

বিকেলবেলা শনিবার
অফিস ছুটি আজ,
পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে
বেরিয়ে পড়ে বিরাজ।

হেঁটে চলে তরতরিয়ে
ইস্টিশনের দিকে,
থমকে গেল যেতে যেতে
কাউকে যেন দেখে।

চেনা চেনা লাগছে যেন
চেয়ে দ্যাখে সোজা
ছোটবেলার বন্ধু এক
পড়ার সাথী রাজা।

'কী রে রাজা কেমন আছিস
কী করিস এখন?

'আমার কথা ছেড়ে দে
তোরটা শুনি বরং।'

'হাতে তোর কী হয়েছে
কালো দাগ বিচ্ছিরি?'
'দু'বেলা পাথর ভাঙি
হাতে নিয়ে হাতুড়ি।'

ব্যথা লাগে বিরাজের
পুরনো স্মৃতিটায়,
ইস্কুলে গেল না রাজা
বাবা তার মারা যায়।

মনে আছে, রাজা বেশ
ভালো ছিল লেখাপড়ায়,
হারিয়ে গেল ছেলেটা শুধু
অভাবের তাড়নায়।

ভাঙন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

ভেঙে পড়ল সেতু, ভাঙল
উড়ালপুল, রাঙলো
রক্তে রাজপথ, গলি ও ফুটপাত
জুড়ে মানুষের ছিন্ন পা, হাত
আর
বুকফাটা চিৎকার—

ভারি লোহার বিমের তলায় চাপা
ট্রাক, বাস, ট্যাক্সি; রক্তমাখা

বৃদ্ধ, শিশু, নারী, পুলিশ, মজুর, মুটে
চেনা যায়না কাউকে। যারা একছুটে
বাঁচতে চেয়েছিল তারা সবাই
মরণকূপে হিম। যেদিকে চাই
জীবিত ও মৃতের আশ্চর্য যোগফল—

আমরা মধ্যবিত্ত সতত সতর্ক যারা
মোমবাতি জ্বেলে ফেলি দু'ফোঁটা
চোখের জল।

निर्मला पुतुल की कविताओं में नारी जीवन

संजय कुमार सिंह

संथाल परगना की आवाज निर्मला पुतुल जमीन से सरोकार रखने वाली कवयित्री हैं। उन्होंने अपने परिवेश और मिट्टी से जुड़कर कविता का सृजन किया है। नयी सदी के आरम्भ में प्रकाशित उनका काव्य संग्रह 'नगाड़े की तरह बजते शब्द' आदिवासी समाज को पूरी गरिमा के साथ व्यक्त कर भ्रष्ट व्यवस्था और समाज की पहचान कराता है। निर्मलाजी की कविताओं में उस गाँव की झलक है जो शहरी चमक –दमक से दूर है। उन्होंने कर्मठ ,उपेक्षित, गरीब, सुख–सुविधाओं से वंचित भोले–भाले ग्रामीण पात्रों की सोच, आस्था–विश्वास यानि सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन से पाठक को परिचित कराने की कोशिश की है। उनकी कविताओं में आदिवासी समाज की धडकनों को सुना जा सकता है। इसी समाज के आधी आबादी के संघर्ष, स्वप्न, आशा, आकांक्षा, शोषण, विद्रोह को वाणी देते हुए निर्मला पुतुल ने अपनी कविताओं के माध्यम से स्त्री विमर्श की दिशा में एक सार्थक पहल करती हैं। उनकी कविताओं में आदिवासी समाज अपनी पूरी गरिमा एवं चेतना के साथ अभिव्यक्त हुआ हैं। इस समाज में नारी की स्थिति क्या हैं ? नारी शोषण के चक्र कौन–कौन से हैं ? नारी एवं पुरुष के संविधानगत अधिकार क्या समान हैं ? पुरुषों की चारित्रिक पतन का खामियाजा नारी को ही क्यों भुगतना पड़ता हैं ? ऐसे तमाम ज्वलन्त प्रश्नों एवं मुद्दो से टकराती हुई पुतुलजी ने नारी के दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों की पहचान अपने कविताओं के माध्यम से करती हैं। वास्तविक कारणों के पहचान पश्चात् उनके नारी चरित्र अपने अधिकार के प्रति जहाँ एक ओर सचेत होते हैं वहीं दूसरी ओर समसामयिक जागृत चेतना से भी संपृक्त होते हैं।

इक्कीसवीं सदी में जाति–पाँति, वर्ग–भेद, लिंग–भेद आदि को संकीर्ण सोच एवं दकियानूसी बताते हुए देष प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं वहीं दूसरी ओर एक तबका ऐसा है जो इन परम्परागत रुढ़ियों से जकड़ा हुआ जीवन जीने का अभिशप्त हैं। वर्तमान समय की स्वार्थपरक राजनीति ऐसे विचारों एवं हथकंडों को और प्रोत्साहित करती है। लिंग भेद की राजनीति के चलते

स्त्री की दशा आज अत्यंत दयनीय है। अपनी कविताओं के माध्यम से पुतुलजी ने इस विसंगति को उभारा है। 'कुछ मत कहो सजोनी किस्कू' कविता में उनका कहना है कि जब अपना स्वार्थ साधना हो तो सब कुछ जायज हैं, नही ंतो मान–मर्यादा की बात करते हैं –

'ये भूल गये
संथाल – विद्रोह के समय
जब छोड़ गये थे तुम पर सारा घर बार
तुम्हीं ने किये थे तब हल जोतने से लेकर
फसल काटने तक के सारे कार्य – व्यापार
तब नहीं गिरी थी उनकी पगड़ी
आज धनुष छूते ही तुम्हारे
धरती पलट जाएगी।'1

वर्तमान परिस्थितियों का आज ऐसा तकाजा है कि हक की बात करना मानो अपराध है। पुतुलजी का मानना है कि समाज में नारी का शोषण किन–किन रूपों में हो रहा हैं, सब पता है लेकिन हक की बात करने वाले या न्याय की गुहार लगाने वालो के साथ सलूक किया जाता है, यह भी उन्हें पता है। अतः लोकतंत्र में भी हक की आवाज उठाने के लिए हिम्मत की जरुरत है –

'पड़ न जाए कहीं किसी 'पराणिक' की दृष्टि
गूँज उठे ना बस्ती में 'गुड़ित' का हाँका
भरी पंचायत में सरेआम
नचा न दी जाओ नंगी 'पकलू मराण्डी' की तरह।'2

सदियों से पितृसत्तात्मक समाज नारी के प्रति दोहरी मानसिकता रखता है। वह 'पतिव्रता पत्नी' और 'पर स्त्रीगामी पति' की वर्गीय स्वीकृति को मान्यता देता है। इसी मान्यता के कारण नारी यौन– उत्पीड़न झेलने को मजबूर है। पुतुलजी उस क्षेत्र विशेष (संथाल परगना) की उपज हैं जहाँ उन्होंने अपनी खुली आँखों से पुरुषों के चारित्रिक पतन की घटनाओं को देखा है। 'पिलचू बूढ़ी से' नामक कविता में पुरुषों के चारित्रिक पतन को

देखते हुए पिलचू बूढ़ी जो कि आदिवासी समाज (संथाल परगना) की मान्यता के अनुसार सृष्टि की पहली स्त्री से प्रश्न करती हैं कि कैसे तुमने अपने पति को अपने वश में कर रखा था क्योंकि यहाँ तों उनके वंशज अपने चरित्र से गिर गये हैं –

'जो एक छोड़ दूसरी, दूसरी छोड़ तीसरी तक को उठा लाते हैं
और बिठा देते हैं घर
जरुरत बस मन भर जाने की होती है।'3

पुरुषों के इसी चारित्रिक पतन को उनकी कविता 'सुगिया' में भी देखा जा सकता है। सुगिया पुरुषों के चारित्रिक पतन को देखकर हतप्रभ रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्यों प्रत्येक पुरुष उसके किसी न किसी अंग की तारीफ करता है। इन परिस्थितियों के चलते सुगिया का कोमल मन मुरझा जाता है। वह हँसना–गाना–नाचना सब भूल जाती है। उसकी सोच से पुरुष मानसिकता का पता चलता हैं –

'यहाँ हर पाँचवाँ आदमी उससे
उसकी देह की भाषा में क्यों बतियाता हैं ?'4

पुतुलजी स्त्री की इस स्थिति के जिम्मेदार कारणों की पड़ताल करती हैं और इस निश्कर्ष पर पहुँचती हैं कि आदिवासी समाज में पुरुष अक्सर हड़िया पीकर अपना सुध–बुध खो बैठता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी स्त्री को उठाने पड़ती हैं। जब स्त्री घर की चहारदीवारी से बाहर पैर रखती है तो हजारो आँखें उसके शरीर को बेध डालती है। 'चुड़का सोरेन से' नामंक कविता में निर्मला जी सीधी– सरल चुड़का सोरेन को सचेत करती हुई कहती हैं–

'कटुवाई अँगुलियों से दोना पत्तल– चटाई बुन
बाजार ले जाकर बेचते हुए तुम्हारी माँ को भी
हजार–हजार कामुक आँखों और सिपाहियों के पंजे झेलती
चिलचिलाती धूप में
ईट पाथते पत्थर तोड़ते मिट्टी काटते हुए भी
किसी बाज के चंगुल में चिड़ियों की तरह

फड़फड़ाते हुए एक बार देखा था उसे।'5

इसी कविता में पुतुलजी पूरे गाँव की मर्यादा को नंगा करके रख दिया है। वे चुड़का सोरेन से कहती हैं कि तुम सारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बस्ती का जो प्रधान है उसकी कीमत मात्र एक बोतल दारु है जिसके एवज में वह पूरे गाँव को गिरवी रख देता है। हजार–पाँच सौ रुपये देकर गाँव की बेटियों को शहर ले जाता है, जहाँ वे शोषण एवं व्यभिचार के चक्र में पीसने को मजबूर हो जाती हैं। विडम्बना यह नहीं हैं इस देह व्यापार के धन्धे में केवल पुरुष लिप्त हैं बल्कि इसमें स्त्रियों की भी सहभागिता है–

'और हाँ पहचानों
अपने ही बीच की उस कई–कई ऊँची सैण्डिल वाली
स्टेला कुजूर को भी
जो तुम्हारी भोली– भाली बहनों की आँखों में
सुनहरी जिन्दगी का ख्वाब दिखाकर
दिल्ली की आया बनाने वाली फैक्ट्रियों में
कर रही है कच्चे माल की तरह सप्लाई।'6

शोषित स्त्रियों की पीड़ा, दुःख, संत्रास, घुटन आदि को जिस गहराई से पुतुलजी ने सीधी–साधी एवं सरल भाषा में वाणी दी हैं वह अत्यंत ही मार्मिक है। अज्ञानी, अशिक्षित एवं शोषित स्त्रियों की दुनिया बहुत ही छोटी या सीमित है, उन्हें दुनिया के बारे में ज्यादा पता नहीं है कि बाहर कैसे–कैसे अनैतिकता भरे कार्य होते हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं हैं कि कैसे शोषक उनका शोषण कर महानगरों में उनकी नुमाइश लगाकर अपना पैसा बना रहे हैं –

'तस्वीर कैसे पहुँच जाती हैं उनकी महानगर
नहीं जानतीं वे ! नहीं जानती !!'7

पुतुलजी ऐसी नारियो को न केवल सचेत करती हैं बल्कि इस शोषक एवं अमानवीय शक्तियों के खिलाफ खड़े होकर संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती हैं, जो उनकी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है। स्त्री को संघर्ष करने एवं जागृत

करने की कोशिश को 'बिटिया मुर्मू के लिए' कविता में देखा जा सकता है–

'उठो, कि तुम जहाँ हो वहाँ से उठो
जैसे तूफान से बवण्डर उठता है
उठती है जैसे राख में दबी चिनगारी।'8

समसामयिक परिस्थितियों में नारी की दयनीय स्थिति के लिए भ्रष्ट व्यवस्था भी जिम्मेदार है। व्यवस्था का हमेशा प्रयास रहता है कि कोई हमसे सवाल न करे, न विरोध दर्ज करावें, ना ही असहमति जतावें और ना ही उसके कार्यो में किसी प्रकार हस्तक्षेप करें। इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार सभी है, उसकी असलियत को पुतुलजी सबके सामने रख देती हैं और सभी को सचेत करती हैं कि इस व्यवस्था की सोची–समझी साजिश की शिकार पहली और आखरी मैं नहीं हूँ। बल्कि इस भ्रष्ट व्यवस्था के शिकार पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। आज मेरी बारी है तो कल तुम्हारी। दुर्भाग्य तो यह है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था में जनता ने जिसे अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा हैं वह अपने स्वार्थ की खातिर सभी का खून चूसे जा रहा हैं। पुरुष प्रधान समाज में पुरुष से तो क्या उम्मीद रखनी? यहाँ तो स्त्री भी स्त्री के हक में कुछ करने को तैयार नहीं दिखती। 'खून को पानी कैसे लिख दूँ' नामक कविता में इस परिस्थिति का पर्दाफाश करती हुई वे कहती हैं –

'अरे और तो और, आखिर तुम भी घुमा–फिराकर
गोल–गोल बतियाती शामिल हो गई न इया मुर्मू।
कम से कम तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी।
क्या इसलिए सौंपी थी एक दिन हम सबने मिलकर
तुम्हारे हाथों अपनी कमान ?'9

प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट संस्थानों में महिलाओं को सम्मान देने की होड़ सी लग जाती है। लेकिन वास्तविक धरातल पर महिलाओं की स्थिति में सुधार दिखाई नहीं देता है। इस महिला दिवस के खोखलेपन के लिए पुतुलजी भ्रष्ट व्यवस्था को जिम्मेदार मानती हैं। 'एक बार फिर' नामक कविता के माध्यम से वे बताती हैं कि जिन मुद्दों को महिला दिवस के अवसर पर उठाया जाता हैं उसका

कोई सार्थक परिणाम भ्रष्ट व्यवस्था के कारण आ नहीं पाता है। प्रत्येक वर्ष महिला दिवस के अवसर होने वाले कार्यक्रमों में महिलाओं को इकट्ठा किया जाएगा और किराये के भीड़ के बीच हमारे जुलूस का नेतृत्व करने वाली महिलाएं मंच पर आसीन होंगी और चीख–चीखकर व्यवस्था के खिलाफ भाषणबाजी करेंगी–

'एक बार फिर
किसी विषाल बैनर के तले
मंच से माइक पर वे चीखेंगी
व्यवस्था के विरुद्ध और हमारी तालियाँ बटोरते
हाथ उठाकर देंगी साथ होने का भ्रम।'10

भ्रष्टाचार नामक बिमारी पूरे देश को घुन की तरह खोखला किए जा रही है। इसको दूर करने के तमाम उपाय विफल साबित हो रहे हैं। इसके विस्तृत रूप को देखकर लगता है कि वर्तमान समय में सच्चाई एवं ईमानदारी उठ गई है। गरीबों को सरकारी योजना के तहत मिलने वाला लाल कार्ड, इन्दिरा आवास में भी लूट–खसोट इस कदर व्याप्त है कि असहाय गरीबों का हक सरकारी कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि डकार जा रहे हैं –

'पंचायत सेवक को मुर्गा भी दिया
प्रधान को भी दिया पचास टका
पर अभी तक कुछ नहीं हुआ
पूरा डेढ़ साल हो गया
और ब्लॉक के बड़े बाबू को क्या बताएँ
ऐसी चीज कि माँगता है कि बताते भी शर्म आती है।'11

नारी को इस विशम परिस्थिति में डालने वाले जिम्मेदार कारणों की पहचान तो उनकी कविता बखूबी कराती है, जिसके चलते जहाँ स्त्री अपनी दयनीय स्थिति के कारकों को पहचान चुकी है साथ ही वह नई जागृत चेतना से भी युक्त हो चुकी है। पुरुष वर्ग व्याप्त व्यभिचारिता, स्वार्थीपन, अवसरवादिता को नारी पहचान चुकी हैं और उसे बड़ी बेबाकी एवं निडरता के साथ प्रकट भी कर रही है। 'ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में' नामंक कविता में नारी का मुखर रूप सामने आता है –

'ये वे लोग हैं जो दिन के उजाले में
मिलने से कतराते
और रात के अँधेरे में
मिलने को माँगते हैं आमंत्रण।'12

पुरुष की नजर में नारी केवल एक 'वस्तु' मात्र है जिसे जैसे चाहे वह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वर्तमान समय में नारी जागृत हो चुकी है तो वह पुरुष से प्रश्न करती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? पुरुष नारी के जागरुक रूप को देखकर चकित एवं भयभीत है क्योंकि उसके प्रश्नों का उत्तर उसके पास नहीं है। 'क्या तुम जानते हो' नामंक कविता में पुतुलजी ने नारी की जागृत तस्वीर को प्रस्तुत किया है। जहाँ वह स्त्री संबंधी अनेक प्रश्नों को बड़ी निडरता के साथ पुरुष से पूछती है और पुरुष निरुत्तर है, मौन है, आश्चर्यचकित है–

'बता सकते हो तुम
एक स्त्री को स्त्री – दृष्टि से देखते
उसके स्त्रीत्व की परिभाषा ?
अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम
रसोई और बिस्तर के गणित से परे
एक स्त्री के बारे में ?'13

पुरुष प्रधान समाज के नकाबधारी चेहरे को स्त्री आज अच्छे तरह से पहचान चुकी है। पुरुषों की सोच एवं मानसिकता से भली–भाँति परिचित होने के पश्चात् पुरुष के असली चेहरे को बेनकाब भी कर देती है –

'जब बतिया रहे होते तो तुम गोल–गोल
तुम्हारी भाषा की दरारो से झाँक रहा होता है
तुम्हारे भीतर बैठा बदशक्ल आदमी।'14

नारी जान चुकी है पुरुष समाज से अकेले लड़ने में अनेक खतरे मौजूद है। परन्तु वह उन परिस्थितियों से अब घबराती नहीं है बल्कि निडरता के साथ उसका सामना करने को तैयार है –

'तुम्हारी मानसिकता की पेचीदी गलियों से गुजरती

मैं तलाश रही हूँ तुम्हारी कमजोर नसें
ताकि ठीक समय पर/ठीक तरह से कर सकूँ हमला
और बता सकूँ सरेआम गिरेबान पकड़
कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझते हो।'15

पुतुलजी को तमाम विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने की उम्मीद सदैव बनी रहती है। उनका मानना है कि अगर सभी लोग जागृत हो जायेंगे तो यह शोषण रूपी भ्रष्ट व्यवस्था जरुर समाप्त होगी। अगर हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ व्यवस्था चाहिए तो सभी को मिलकर सबके हितों की चिन्ता करनी होगी। वर्ग या जाति विशेष की चिन्ता से यह व्यवस्था और विकराल रूप लेती जाएगी। भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह एवं क्रान्ति का बिगुल बजाती हुई उनकी कविता 'उतनी ही जनमेंगी निर्मला पुतुल' में नये व्यवस्था को सृजित करने का आहवान है–

'यह जो लगी है आग/इस छोर उस छोर तक
तुम्हारी व्यवस्था में/ उसमें जल रही हूँ मैं।
....
इसलिए चुप नहीं रहूँगी अब/ उगलूँगी तुम्हारे विरुद्ध आग
तुम मना करोगे जितना/उतनी ही जोर से चीखूँगी मैं।'16

उनका मानना है कि इस संघर्ष में अगर पराजय भी होती है तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि अब संघर्ष की आग में वे अकेली नहीं हैं अपितु अनेक निर्मला पुतुल इस संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए जन्म ले चुकी हैं। अतः संघर्ष की यह जंग और भी तेज होगी –

'और अगर किसी तरह हारी इस बार भी
तो कर लो नोट दिमाग की डायरी में
आज की तारीख के साथ
कि गिरेंगी जितनी बूँदें लहू की धरती पर
उतनी ही जनमेंगी निर्मला पुतुल
हवा में मुट्ठी बँधे हाथ लहराते हुए।'17

निर्मला पुतुल की कविताएँ स्त्री–विमर्श के दौर में सामाजिक सरोकारों

से जुड़ी हुई है। उनकी कविताओं में पिछड़े, गरीब एवं उपेक्षित समाज के स्त्रियों के दर्द, शोषण, घुटन एवं अमानवीय नारकीय स्थिति को यथार्थ के धरातल पर उकेरा गया है। स्त्री पराधीनता की बेड़ियों के साथ–साथ उसके कारणों को तलाशकर पुरुषवादी सत्ता को बेनकाब करने कार्य उनकी कविताएँ बखूबी करती है। पुरुष सत्ता एवं भ्रष्ट व्यवस्था के चंगुल से बाहर निकलने के स्वप्न के साथ–साथ उससे जूझने की दृढ़ संकल्प शक्ति को प्रकट करती हुई उनकी कविताएँ स्त्री मुक्ति के एक सशक्त दस्तावेज के रुप में प्रतिष्ठित होती जा रही है।

संदर्भ सूची :–

1. निर्मला पुतुल, नगाड़े की तरह बजते शब्द, पृ0–23–24
2. वही, पृ0 25
3. वही, पृ0 67
4. वही, पृ0 81
5. वही, पृ0 19
6. वही, पृ0 21
7. वही, पृ0 11
8. वही, पृ0 14
9. वही, पृ0 32
10. वही, पृ0 60
11. वही, पृ0 43–44
12. वही, पृ0 53
13. वही, पृ0 08
14. वही, पृ0 55
15. वही, पृ0 56
16. वही, पृ0 90
17. वही, पृ0 91

डॉ. संजय कुमार सिंह, सहायक प्रध्यापक, पि. के. आर. एम. कॉलेज, धनबाद

বাংলা কবিতায় আধুনিকতার উন্মেষ

জয়ন্ত মিস্ত্রী

"মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী; মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী; মানুষ রুগ্ণ, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন; মানুষ মুমূর্ষু কিন্তু সে জানুক সে মুমূর্ষু; মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী এবং জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী; বোদলেয়রের সমগ্র কাব্যে, যেমন ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে , এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে। সকলে জানবেনা, জানতে পারবে না বাচাইবে না; কিন্তু কবিরা জানুন ।এই জানেই আধুনিক সাহিত্যের অভিজ্ঞান। " (শার্ল বোদলেয়র ও আধুনিক কবিতা : বুদ্ধদেব বসু, কবিতা , বর্ষ ২৩, সংখ্যা ৪)

মহাকাব্যের যুগে কবির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ছিল খণ্ডিত। কবির ব্যক্তিত্ব তাই চারটি প্রাচীন মহাকাব্যে কাব্যে সাধারণভাবে অনুপস্থিত। সমগ্র যুগই সে সব কাব্যে কথা ক'য়ে উঠেছে। কিন্তু যেভাবে প্রচলিত কাহিনিকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে মহাকাব্যে উপস্থিত করেছেন তাতে তাঁদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব যে সেযুগেও গড়ে উঠেছিল সেকথা না বললেও চলে। চরম বক্তব্য কিছুই হয় না -সবই আপেক্ষিক ;তবু স্বীকৃত যে হোমার বা বাল্মীকি ক্লাসিক কবি । বাংলায় কল্পনা-চালিত রোমান্টিক সাহিত্যের সৃষ্টি মধুসূদনের হাতেই: 'তুমিও আইস দেবি, তুমি মধুকরী কল্পনা' । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' কবি-নায়কের কামচারী মনোরথ চালায় 'কল্পনা-কুমারী। সেই রোমান্টিক কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ বন্দনা করেছেন-এইভাবে: "আজন্ম সাধনধন সুন্দরী আমার /কবিতা কল্পনা লতা"। এই রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই আধুনিক কবিতার প্রারম্ভিক যাত্রা । যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কল্পনাকে সম্বোধন করে লিখলেন :

"কল্পনা , তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারো মাস খেটে লক্ষ কবির এক ঘেয়ে ফরমাস।" (মরীচিকা , ঘুমের ঘোরে , ষষ্ঠ ঝোঁকে)

কালিদাস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "...কালিদাস ফরমাস খাটতে অপটু ছিলেন ব'লে দিঙনাগের স্থূল হাতের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে প'ড়ে মাঝে মাঝে ফরমাস খাটতে হয়েছে তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে । যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস মুখে রাজাকে বলেছিলেন 'যে আদেশ মহারাজ: যা ' বলেছেন তা'ই করবো' অথচ সম্পূর্ণ আরেকটা করেছেন , সেই গুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টি সৎকার হ'য়ে যায়নি-চিরদিনের রসিক সভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।"(যাত্রী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)যার ব্যক্তি স্বতন্ত্র্য নেই সেই ফরমাস খাটে - সে ফরমাস্ রাজার , সমাজের , রাষ্ট্রের , অথবা ভাষার ব্যাকরণের।

রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর -ধ্যান-ধারণাকে তাঁর রোমান্টিক সাহিত্যবোধে গড়ে

তুলেছিলেন। " I.A Richards -এর ভাষায় বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছেন 'at the most conscious point of the age' আর আধুনিক কবিরা অবক্ষয়ী যুগের মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আলোকের দূত আর আধুনিক কবিরা অন্ধকারের আর্তমুখ দেখতেই অভ্যস্ত। বলা যেতে পারে তাঁদের কবি-মানস গড়ে উঠেছে 'at the most crucial point of age' (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিতা, পৃ.৫০, আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা, ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়) ভাবনার দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সাথে আধুনিক কবিতার অবস্থান বিপ্রতীপও।

১৯৫৩ সালে তাঁর সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা সঙ্কলনে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন: এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের , প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের ক্লান্তির, সন্ধানের আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য , অন্তর্মুখিতা বা বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম আর আত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়। " (আধুনিক বাংলা কবিতা : বুদ্ধদেব বসু)

মোহিতলাল সম্বন্ধে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন : "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা ব'লে মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম ।মনে হয় , যজন-যাজনের পাঠ আমরা তাঁর কাছ থেকেই প্রথম নিয়েছিলাম ।আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা , সত্যভাষিতা বা সংস্কাররাহিত্য তা'আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়।' (কলে-াল যুগ: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।)

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন 'নিরাসক্তি ' আধুনিকতার একটা বড়ো লক্ষণ । রোমান্টিক যুগের সাথে তুলনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।" (আধুনিককাব্য, সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) ঈনিশ মতক রোমান্টিক কাব্য-কবিতার যুগ আর বিশ শতকে এলো আধুনিক কবিতা। তবে মনে রাখা দরকার যে রোমান্টিকতা কবি হৃদয়ের সম্পদ সে একটি আন্দোলন মাত্র নয়। তাকে মানুষের একটি মৌলিক , স্থায়ী ও অবিচ্ছেদ্য চিত্তবৃত্তি বলে গ্রহণীয়:

' ... তারই নাম রোমান্টিকতা , যা ব্যক্তি বিশেষকে মুক্তি দান করে , স্বীকার ক'রে নেয় -শুধু ইস্ত্রি করা এটিকেট-মানা সামাজিক মানুষটিকে নয়, নির্ভয়ে মানুষের অবিকল ও সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ; তার মধ্যে যা কিছু অযৌক্তিক বা যুক্তির অতীত , অনিশ্চিত, অবৈধ, অন্ধকার ও রহস্যময়, যা-কিছু গোপন ও পাপোন্মুখ ও অকথ্য, যা-কিছু গোপন ঐশ্বরিক ও অনির্বচনীয় - সেই বিশাল ও স্ববিরোধময় বিস্ময়ের সামনে , সন্দেহ নেই,

মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তির নামই রোমান্টিকতা। এই শক্তি যা কোনো যুগেই একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে থাকেনি কিন্তু কোনো কোনো যুগে - যেমন শেক্সপীয়রের ইংল্যান্ডে-যার বিস্ফোরণ গগনস্পর্শী হয়েছে, তা রুশোর পর থেকে সর্বসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ হ'য়ে উঠল। আরম্ভ হলো ঐতিহাসিক রোমান্টিকতা, বিশ্বসাহিত্যের এক বিরাট ঘটনা, যা মানুষের চিন্তার পরতে পরতে এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে সমগ্র আধুনিক সাহিত্যই রোমান্টিক; এলিয়ট অথবা ভ্যালেরির মতো যাঁরা প্রকরণে বা মতবাদে ক্লাসিকধর্মী তাঁদেরও ভাষা-ব্যবহার পরীক্ষা করলেই রোমান্টিক অন্বয় বেরিয়ে আসে।"(শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা: বুদ্ধদেব বসু;কবিতা পত্রিকা: বর্ষ -২৩, সংখ্যা ৩)

আধুনিক বাংলাকাব্যে কেবল বিদেশী প্রভাব ক্রিয়াশীল নয়-দেশীয় ঐতিহ্যের সাথে যোগসূত্র না থাকলে তা মহত্তম হতেই পারত না। আধুনিক কবিদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সেই দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক। অনুসরণ বা বিদ্রোহ -দুই-ই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করেই। সুতরাং 'সম্মুখে থাকুন বসি পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর ' (আবিষ্কার : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত) বললেও রবীন্দ্রবৃত্তেই তাঁরা একরকম করে আবদ্ধ-ই ছিলেন। আসলে পরিবর্তন যেভাবে দেখা দেয় সেটি একটু বিশে-ষণ করলেই বক্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে। নতুন যুগের মানুষ নতুন যুগের উপযোগী নতুন রোমান্টিকতার সন্ধান করে। চাঁদকে আর আগের মতো প্রিয়ার মুখের সাথে তুলনায় এ যুগের মানুষ আনন্দ পাচ্ছে না- বেশী আনন্দ পেতে সে চাঁদকে নিটোল স্তন ,বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কাস্তে অথবা ব্যঞ্জনাময় করতে ঝলসানো রুটির সাথে তুলনা করছে। এই রোমান্টিক কল্পনায় কোনোটিই কিন্তু অবাস্ত ব নয় স্তন, কাস্তে, রুটি চাঁদ-সবই বাস্তব। প্রসঙ্গত মনে পড়ে :

"তরঙ্গ সম তোমার চুল,
সংগীত-সম শরীর তব,
বুকের রেখায় চাঁদের কথা:
পূর্ণিমা-চাঁদ বুকের'পরে"(রূপকথা : কঙ্কাবতী,বুদ্ধদেব বসু)
কিম্বা
"তোমার যে স্তন- রেখা বঙ্কিম, মসৃণ,ক্ষীণ ,সতত স্পন্দিত -
দেখেছি আস্পষ্টতম আমি শুধু আভাস যাহার ,
যাহার ঈষৎ স্পর্শ আনন্দে করেছে মোরে উন্মাদ-উন্মাদ,
জানি ,তাহা স্ফীত হবে সদ্যোজাত অধরের শোষণ-তিয়াসে।" (প্রেমিক, বন্দীর বন্দনা, বুদ্ধদেব বসু)

কবি একাধারে বাস্তবধর্মী ও রোমান্টিক। রোমান্টিক প্রবণতার সাহায্যে কবি বাস্ত বের ভিতের উপর দাঁড়িয়েও বাস্তবকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যান। ব্যঞ্জনা রোমান্টিক

মনেরই দান। বাংলা কবিতার শুচিবায়ু গ্রস্ততা এবং তরল পেলব কল্পনা বিলাসের চর্চা নিয়ে যতীন্দ্রনাথ লেখেন বিদ্রূপাত্মক কবিতা 'মন-কবি,' মরীচিকা কাব্যের এই কবিতায় সাকার পেয়েছে আধুনিক কবির মন-উপরিলাভ এক চিত্রকল্প :

"বঙ্গবাণীর সাথ
যেদিন অকস্মাৎ
কমল-দ্বীপান্তরে হ'য়ে গেল সাক্ষাৎ
যেমনি ছুঁয়েছি পা ,
চমকি উঠিল মা:
কঠিন পরশে মা'র চরণে লাগিল ঘা।
কমল হ'তেও যার অধিক কমল পাণি-
তারাই পুজিছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।
তা ব'লে কি করবি-
ওরে হতগর্বী?
কিছুদিন ধ'রে হাতে লাগা তেলচর্বি।
পেতে দেরে শয্যা,
দেখে শেখ, চারদিকে ঘট্‌তেছে রোজ্ যা।
অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে
মামুলি প্রেমের নেট -মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি-
অনন্ত,অমধ্য,অভেদ্য ইত্যাদি।"

আধুনিকতার আর এক লক্ষণ প্রকৃতি-মুগ্ধতার বিরুদ্ধতা ।ছাপোষা বাঙালির মধ্যবিত্ত জীবনে ও উদ্দামতার অবকাশ ছিল। কিন্তু আমরাই সাগর বা পাহাড়ের মান রাখিনি - আমাদের জীবনে হিমালয় আর সাগর থেকেও নেই।

"হিমালয় নামমাত্র,
আমাদের সমুদ্র কোথায়?
টিম টিম করে শুধু খেলো বন্দরের বাতি।
সমুদ্রের দুঃসাহসী জাহাজ ভেড়ে না সেথা :
-তাম্রলিপ্তি সকরুণ স্মৃতি।" (ভৌগোলিক , ফেরারী ফৌজ,প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আমাদের জীবনে তারই প্রভাব -সবই নিস্প্রাণ:

'উত্তরে উত্তুঙ্গ গিরি
দক্ষিণেতে দুরন্ত সাগর
যে দারুণ দেবতার বর,

মাঠভরা ধান দিয়ে শুধু গান দিয়ে নিরাপদ খেয়া তরণীর,
পরিতৃপ্ত জীবনের ধন্যবাদ দিয়ে
তারে কভু তুষ্ট করা যায়!" (ভৌগোলিক , ফেরারী ফৌজ,প্রেমেন্দ্র মিত্র)

প্রকৃতি যেহেতু মানব-চৈতন্যের সৃষ্টি নয়- সেই কারণেই আধুনিকতার প্রবর্তক বোদলেয়ার প্রকৃতিকে শিল্পে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মতে যা কিছু কৃত্রিম তাই শুধু শিল্পের বিষয়। 'Art is a movement contrary to nature'এ কথাও আধুনিক কবির চিন্তা প্রসূত-ইনি কবি রিলকে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে। "বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?" রোমান্টিক কবিরা যেখানে কবিতাকে অলৌকিক প্রেরণাজাত বলে ভাবছেন সেখানে মালার্মে বা সুধীন্দ্রনাথ ঐশীপ্রেরণাতে অবিশ্বাসী। তাই সারলা বা জীবনদেবতা আধুনিক কবিদের কাছে অস্বীকৃত। আধুনিক কবিরা তাই 'কটিমাত্র মিল খুঁজে গাধার খাটুনি '-খাটেন এই কথাটাই ইয়েটস্ এর কাছে 'Adam's curse',এই প্রতিক্রিয়াতেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন , 'কল্পনা আমার প্রজা, মগজের আমি জমিদার।"

আমরা বলতে চাই সুন্দরের কল্পনা ,প্রকৃতি-প্রাণতা, হৃদয়ের অনুপ্রেরণা,- সবদিক থেকে উনিশ শতকী রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করতেই যেন আধুনিক কবিতার আবির্ভাব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল নতুন কাব্যধারা এক নতুন ধ্রুপদী ক্ল্যাসিকাল যুগের সূত্রপাত করতে চলেছে। এদেশে রবীন্দ্রনাথ যেমন তেমনি ক্লীনথ্ ব্রুকস্-এর মতো সমালোচকের মনে হয়েছিল আধুনিক ইংরেজি কবিতার উপর ইলিজাবেথান, ডান-প্রমুখ মেটাফিজিক্যাল , অগাস্টানদের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। কিন্তু পঁচিশ বছর পরে 'Retrospective Introduction'লিখতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল : "I should want to lay more stress on the extent to which Eliot, Yeats and the other modern poets built upon the romantic tradition... ..."

প্রকৃতিকে বাস্তবিক বাদ দেওয়া যায় না। 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধের এক জায়গায় 'মর্জি'শব্দটাকে ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন " কবি বার্নের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এলো সে যুগে 'রীতি'-র বেড়া ভেঙে মানুষের 'মর্জি 'এসে উপস্থিত "। 'মর্জি ' কথাটার মধ্যে 'খেয়াল ' কথাটার আভাষ ছিল , পরবর্তীকালে সুধীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতার বাংলা করেছেন ' খেয়াল'। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কবিতা রোমান্টিক এবং সবসময় যে রবীন্দ্র- রোমান্টিকতার বিরোধী সব সময় সে কথাও বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতাকে একটু মোচড় দিয়ে আধুনিক কবিরা তাঁদের কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমনঃ

"চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে ,-
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে ' বক্ষে লই টানি'

-অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন-এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী।
নেত্র তার মৃত্যু-নীল!-অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ! কটিতটে জন্ম রাজধানী।
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস। জানি তাহা জানি।"(পান্থ:বিস্মরণী, মোহিতলাল)

প্রত্যেক কবিকে ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করতেই হয়। তখন তিনি ক্লাসিক ধর্মী, আর যখন উদ্ভাবন করেন তখন হন রোমান্টিক।সুতরাং কবি মাত্রই একাধারে ক্লাসিক ও রোমান্টিক। সতর্কতা আর রোমান্টিকতা আধুনিক কবি সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেছে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতই।"প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি/সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি-" (দায়মোচনঃ মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ) -আধুনিক কবিরা রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্য কে মনে রেখেই প্রেমের কবিতা রচনা করেছেন একথা বলার যথেষ্ট কারণ আছে। হাঁটার সময় এক পা পিছিয়ে থাকে বলেই আর এক পা এগোতে পারে- তেমনি পুরোনো ঐতিহ্যের উপর দাঁড়িয়েই কবি নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করেন। কাজেই ক্লাসিক ও রোমান্টিক কবিতার পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই অবাস্তব। প্রসঙ্গত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'শাশ্বতী'কবিতার কথা মনে পড়বে । এটি ক্লাসিক ভঙ্গিতে লেখা হলেও রোমান্টিক :

'একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;
একটি পলের অমিত প্রগল্ভতা
মর্তে আনিলো ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত করে।"

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ক্লাসিকাল কবিতা নয়, তা মজ্জায়-মজ্জায় রোমান্টিক কবিতা। রোমান্টিকতার উত্তরাধিকার এই যে আত্মসচেতন ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধ তারই ফলে "সকল লোকের মাঝে বসে / আমার নিজের মুদ্রাদোষে/ আমি একা হতেছি আলাদা"। আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতা ও যান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার দিনে বে-ক একই সঙ্গে দেখেছিলেন 'dark satanic mills' এবং মানুষের মুখে নিঃসঙ্গ বিষাদের স্থায়ী ছাপ" (পৃ. ৫,আধুনিক কবিতার ঐতিহ্য, আধুনিক কবিতার দিগ্ বলয়, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী,কলকাতা-৬)

রোমান্টিকদের মতই আধুনিক বাংলা কবিতায় আত্মভাবের প্রাধান্যঃ 'কত বড় আমি

-একবার চোখে হেরিবারে শুধু চাই, অধীর হ'য়েছে। বক্ষকারায় শুধু সেই বেদনাই!'(নাদির শাহের জাগরণ, : স্বপন -পসারী) সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত'-এর মতো মহাকাব্যধর্মী কবিতাতেও কবির বিশ্ববীক্ষা বিধৃত হয়েছে প্রারম্ভিক এবং অন্তিম দুটি ব্যক্তিগত চরণের মধ্যে 'এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে'এবং ' সে এখনও বেঁচে আছে কি না,/ তা সুদ্ধ জানি না।' রোমান্টিকতাকে অস্বীকার করতে চেয়েও সেই কবিধর্মে আক্রান্ত দেখি সমর সেনকে।

" আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,/ নামুক মহুয়ার গন্ধ।" একই প্রবণতা গোপন থাকে নি বিনয় মজুমদারের কবিতায় :

"ইতস্তত অসুস্থ বৃক্ষেরা
পৃথিবীর পল-বিত ব্যাপ্ত বনস্থলী
দীর্ঘ-দীর্ঘ ক্লান্তভাবে আলোড়িত করে ..."

এই অনুসঙ্গে আরো মনে পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে

"এখনো কোনোদিন জ্যোৎস্নায় ভেসে যায় আকাশ
আমার জন্য প্রতীক্ষা করে
নদীর কিনারায় মাটি প্রতীক্ষা করে আছে
আমার পদস্পর্শের
ঘাস ফুলটি হাওয়ায় দুলছে প্রতীক্ষায়
আমি তাকে ছিঁড়ে নেবো... ।"

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে -এই তিন ব্যক্তি কবির মানসিকতায় বিস্তর পার্থক্য তাই সামগ্রিকভাবে এঁদের তুলনা চলে না। সমর সেন ও বিনয়ের কবিতায় যথাক্রমে ক্লান্তি ও অসুস্থতা রয়েছে। সুনীল শুধুই রোম্যান্টিক। সে যাই হোক এ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাইছিলাম আত্মপরিচয়ের মধ্যেই আছে মানুষের সার্বিক মুক্তি। নিজেকে না জানার জন্যই বদ্ধ প্রাণধারা কেবল আবর্তের সৃষ্টি করে এই আবর্তের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কবির বিক্ষত হৃদয় আর্তনাদ করে:

"আবর্তে ঘুরিয়া মরে অন্ধ মোর বদ্ধ প্রাণধারা
বেদনায় সারা , তাহারে দেখাও পথ-
দ্বার খোল, দ্বার খোল রাত্রির প্রহরী!
শুনেছ কি, শুনেছ কি অন্ধকার রন্ধ্রকরি'
আলোকের আর্তস্বর , কাঁদে প্রতি তারকায়
কাঁদে সারানিশি!
তারে মুক্তি দাও।" (প্রথমা, প্রেমেন্দ্র মিত্র)

আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমেই মানুষ আলোর পথের সন্ধান পেতে পারে-তাই সৎ মানুষের

কাজ নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো!এখন স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নটি উঠে আসে তা হলো অন্তঃপ্রেরণাকে বহিষ্কারের যে সংকল্প আধুনিক কবিরা গ্রহণ করেছিলেন তা কি রক্ষিত হয়েছে? নেরুদার আত্মজীবনীতে আমরা জেনেছি কী ভাবে আবিষ্ট হয়ে শ্রুতিলিখন লেখার মতো অনুপ্রাণিত অবস্থায় তিনি El hondero entusiasta লিখেছিলেন । ইংরেজি কবিতার আধুনিক কালের ইতিহাসেও দেখি ইয়েটস্ এবং গ্রেভস্ এর মতো কবিরাও শেলি প্রভৃতির মতো সমান প্রেরণাবাদী। সুধীন্দ্রনাথের কাছে যা 'প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধ্যবসায়',বুদ্ধদেব বসুর কাছে তাই 'দৈবের দান'। সেই দৈব প্রেরণার 'চকিত স্পর্শে কেঁপে ওঠে কল্পনার শ্রোণী/কবিতার জন্ম হয়।' যে-কোনো রোমান্টিক কবির মতোই বুদ্ধদেব বসু অনুভব করেছেন সেই সমর্থ প্রতারক শক্তির আনুকূল্য বিনা কবির গতি নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় ধ্বনিত হলো প্রেমের দুঃসহ আবেগঃ "তুমি আছ, তুমি আছ, এ বিস্ময় সওয়া যায় নাকো : অরণ্য কাঁপিছে । মনে মনে নাম বলি , আকাশ চুইয়ে পড়ে গলানো সোনার মতো রোদ। গলানো সোনার মতো রোদ পড়ে সব ভাবনায়: সোনার পাখায়, গাহন করিতে ওঠে নীল বাতাসের স্রোতে রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।" (নীলদিন : সম্রাট,প্রেমেন্দ্র মিত্র) সেই উত্তরাধিকারের ধারা লক্ষ করা যায় ঠাট্টার মধ্যেও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় :

"বহু অর্চনা করেছি তোমার , এখন ইচ্ছে
টেনে চোখ মারি
হে বীণাবাদিনী , তুমিও তো নারী, ক্ষমা করো এই
বাক্যব্যবহার
তুমি ছাড়া আর এমন কে আছে , যার কাছে আমি
দাস্য মেনেছি
এবার আমাকে প্রশ্রয় দাও , একবার আমি
ছিলা টান করি।"

---যখন স্বাভাবিকভাবে এই প্রেরণা আসে না-তখন মাদক দ্রব্যের বিশেষ করে আফিং -এর প্রসঙ্গ আসে। বোদলেয়র বুঝেছিলেন : `Se tigure-t-on le sort affreux d'un homme dont l'imaguiation paralyse he saurait plus fonetionner saws le secours du hasehisch on de l'opium' ["How terrible the lot of man whose paralysed imagination cannot function without the aid of hashis or opium] 'সুরার উপরে ডাইলান টমাসের নির্ভরতা প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত। বাঙালী কবির বিখ্যাত লাইন এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে : 'মদ্যপান আমাকে পদ্যের কাছে দ্রুত নিয়ে আসে।' আবার মন-মাতালে মাতাল জীবনানন্দকে ডাইলান টমাসের মত মদ-মাতালে মাতাল হতে হয় না। জীবনানন্দ ডুবে যান 'অজ্ঞতার মত্ততায়, নীল, নীল স্তব্ধতার অন্ধকারে।' আদিম ও

অবচেতন এই সত্তার উপর নির্ভরতা থেকেই স্যুররিয়ালিজমের জন্ম ।-সচেতন জাগরণে নয় omnipotence of dream-এই আন্দোলনের আস্থাএই উত্তরাধিকার কি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় মেলে না ?

রাজনীতি সচেতন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও লিখতে দেখি-একইরকম রোমান্টিকতায় ভেসে:

"ভুবনেশ্বরী যখন শরীর থেকে
একে একে তার রূপের অলঙ্কার
খুলে ফেলে ...
সে সময়ে আমি একলা দাঁড়িয়ে জলে
দেখি ভেসে যায় সৌরজগৎ,যায়
স্বর্গ-মর্ত-পাতাল নিরুদ্দেশে... ।"

উদাহরণ আরো বাড়িয়ে কী লাভ ? লক্ষণীয় যে 'মর্জি ' বিহারীলাল ,রবীন্দ্রনাথে রোমান্টিক যুগে সক্রিয় ছিল তা আধুনিক কবিদের মধ্যেও সমান সক্রিয় । নিজস্বতা নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু আধুনিক কাব্য রোমান্টিকতার উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নয় ।এখন প্রশ্ন হলো এই আধুনিকতা ঠিক কোথায়? রোমান্টিকতা থেকে জন্ম নিয়েও সে কীভাবে কোথায় তাকে অতিক্রম করে যায়? হতে পারে রোমান্টিকদের বৈশিষ্ট্যকেই তীব্রভাবে ফিরিয়ে এনেছে আধুনিকতা? রোমান্টিক যুগে বিদ্রোহের যে সুর তাকেই কি আধুনিক কবিরা দিয়েছেন ট্রাজিক স্পর্শ? রোমান্টিক আত্মজ্ঞান কি রূপান্তরিত হলো রোমান্টিক আত্ম-সচেতনতায়? এই পরিবর্তন কি পরিমাণগত না গুণগত? তাছাড়া আধুনিক কবিতার যাত্রা শুরু হলো ঠিক কবে? যেদিন থেকে হলো সেদিন থেকে কি সব কবিই আধুনিক? ইতিহাস বিচারে উনিশ শতককে আধুনিক কবিতার শুরু বললেও বিশেষ আধুনিক কবিতার জন্ম ধরা হয় বিশশতকের তিনের দশক থেকে। বিশেষ অর্থে কবে থেকে আধুনিকতা এলো -এ বিষয়টি নিয়ে বাংলায় কোনো বিতর্ক নেই ।কিন্তু ইংরেজিতে আছে ।ভার্জিনিয়া উল্‌ফের মতে ডিসেম্বর ১৯১০, এলম্যানের মতে ১৯০০, লেভিনের মতে ১৯২২ । এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে T.S Eliot কে " No poperty of cource is ever exactly the same speech that the poet talks and hears : but it has to be in such a relation to the speech of his time that the listener or reader can say that is how I should talk if I could talk Poetry.' This is the reason why the best contemporary poetry can give us a feeling of exitement and asense of fulfilment different from any sentiment aroysed by even very much greater poetry of apast ago.(The music of poetry : T. S. Eliot)" তারিখের সাথে আধুনিকতার সম্পর্ক মানা যায় না-বস্তুত অধিকাংশই মানেন না । কুমুদরঞ্জন মল্লি-ক ও কালিদাস রায় আধুনিক কালের সমীপবর্তী হয়েও আধুনিক কবি নন ।এঁরা আধুনিক

স্বভাবকে আয়ত্ত্ব করতে চান নি-হতে পারে আধুনিকতার মধ্যে রসের সন্ধান পান নি । এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা ।' অতএব পাঁজি মিলিয়ে মডার্ণের সীমানা নির্দেশ অসম্ভব ।তাই তো কবি লি-পো হাজার বছর আগে চীনে আবির্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিক ।কবি ফ্রস্টও একই মানসিকতা থেকে লিখেছেন: A modern poet must be one thst speaks to modern people no matter when he lived in the world.আধুনিক কালে জন্মানোটা তাই আধুনিকতার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া ভ্রান্তি । তিনিই আধুনিক যিনি আধুনিক মেজাজটা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করতে সক্ষম। তাঁর সমসাময়িক কাল নয় আগামী সময়ও আভাসিত হয় আধুনিক মনের সৃষ্টির মধ্যে ।একই কথা বলেছেন সিসিল দে লিউস' Modern Poetry is every poem, whether written last year or five centuries ago, that has meaning for us still.' -C. Day. Lewis.

তথ্য ঋণ ঃ

১) অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়,অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৮১
২) কৃষ্ণগোপাল রায় : অভিনিবেশ একালের কবিতায় :বামা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩
৩) ডঃসুরেশ মৈত্র : শতবর্ষের বাংলা কবিতা :
৪) ডঃ বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা , তৃতীয় সংস্করণ,ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ পৃ.২৪/৬৬)
৫) তরুণ মুখোপাধ্যায় : একালের কবিতা : পাঠকের দর্পণে, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯সোনারতরী ৪এ নর্থ নওদাপাড়া রোড,কলকাতা-৫৭
৬) মোহিতলাল মজুমদার ,সাহিত্যবিতান ,বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড,এপ্রিল ১৯৭৪
৭) বুদ্ধদেব বসু : কালের পুতুল, নিউ এজ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ,দ্বিতীয় সংস্করণ,জুলাই ১৯৮৪
৮) বুদ্ধদেব বসু : প্রবন্ধ সংকলন ,দে'জ পাবলিশিং । কলকাতা-৭৩ ,দ্বিতীয় প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯১
৯) শাশ্বতী : অর্কেষ্ট্রা : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
১০) শার্ল বোদলেয়ার ও আধুনিক কবিতা : বুদ্ধদেব বসু:কবিতা পত্রিকা: বর্ষ -২৩, সংখ্যা ৩
১১) আমার ভালোবাসা, গোবিন্দ -চানিকা
১২) আধুনিক কবিতার ভূমিকা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য
১৩) The music of poetry : T. S. Eliot)
১৪) যাত্রী: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৫) নাসির শাহের জাগরণ, : স্বপন -পসারী)

জয়ন্ত মিস্ত্রী, অধ্যাপক, বিধাননগর সরকারী মহাবিদ্যালয়, সল্টলেক, কোলকাতা

প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রোমান্টিকতার আবহে গ্রাম বাঙলা

শম্পা বসু

বাঙলা কবিতায় রোমান্টিক অনুভূতির সঞ্চরণ ঘটে বিহারীলালের কলমে—একথা স্বীকৃত। কিন্তু তবুও তাঁর কবিতার ভাব ও ভাষা তখনও রোমান্টিকতার পূর্ণ উপলব্ধিকে বিরণ ধারবর পক্ষে যথেষ্ট পারঙ্গম ছিল না। বাঙলা ভাষাও তখনও অতীন্দ্রিয় রোমান্টিক অনুভবকে ধারণ করবার মতো যথোচিত লাবণ্যে বিকশিত হতে পারে নি। যদিও বিহারিলালের আগেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা' কাব্যগ্রন্থে, সেখানে তিনি লিখেছিলেন—

"চন্দ্রিকার নীলাকাশ গায়। দুটি দেবদারু দেখা যায়।
ভীম বনে তলে তার অতি স্তব্ধ অনিবার,
কাল যেন প্রহরী তাহায়।।

....

তারাফুল তারা ধরে, অনন্ত আমোদ করে,
্থপোনে শিহরিহে নভ।।

— সেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবের সীমা অতিক্রান্ত স্বপ্নময় কল্পলোকে এবং সৌন্দর্যধ্যানের অতীন্দ্রিয় পৃথিবীতে ভাষাশিল্পকে প্রকাশ করতে দেখেছি। তবু বিহারীলালই নিঃসংশয়ে বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক অনুভূতি ও কল্পনার প্রথম বাহক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিকতার যে প্রবল প্রস্রবণ প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, তার তুলনা অন্যত্র নেই। তাঁর প্রথম কবিতা সংকলন 'সন্ধ্যাসংগীতেই' সর্বপ্রথম অতীন্দ্রিয় বেদনার রচনাতীত ব্যঞ্জনা ব্যক্তিমনের অনুভব গোচর হয়ে উদ্ভাসিত হতে পেরেছিল। বাঙলা কবিতায় ইন্দ্রিয় চেতনার অনুভব কাব্যকে অতিক্রম করে বাচ্যাতিরিক্তের ব্যঞ্জনা অর্জন করেছিল রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই।

রোমান্টিক অনুভবের পরিসরভুক্ত বহু বিষয়ের মধ্যে পল্লিপ্রকৃতির দিকের প্রতি আমরা এখন বিশেষ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। কারণ এই প্রবন্ধের লক্ষ্য হল প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ শতকের কবিদের কবিতায় গ্রাম বাংলার রূপনির্মাণ, রোমান্টিক কবিরাও কাব্য অনুভব ও কাব্য নিশ্চয়ের দিক থেকে গ্রাম ও নগর বলে কোনো বিভাজন রেখা টানেননি, কিন্তু পল্লিপ্রকৃতিই ছিল তাঁদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ; তার লক্ষন—কারণ পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও অকৃত্রিম প্রাণের প্রকাশ তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল মানবসভ্যতার জটিল বৃত্তের বাইরে এক সরল সুন্দর জীবনে। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে

যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের লেখায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিভিন্ন মাত্রা ফুটে উঠেছে বিভিন্ন বৈচিত্র্যে। আবার পল্লিপ্রকৃতি অর্থে শুধু নিসর্গ প্রকৃতিই নয়, সেই নির্জন প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য এবং পরিপূরক হিসেবে মাটির গন্ধ লেগে থাকা গ্রামীণ মানুষ, তাদের জীবনচর্যা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ বেদনা, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গের বিষণ্ণতা, জীবনের পূর্ণতা-অপূর্ণতা মৃত্যুর হিমশীতল আমোঘ আনন্দের কাছে সম্পর্কিত প্রাণের স্পন্দনও এই পল্লিপ্রকৃতির সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পৃক্ত। এই সবকিছুকে নিয়েই গড়ে উঠেছে বাঙলা দেশের পল্লিগ্রাম। তার রূপ অন্বেষণের উদ্দেশ্যেই এই গবেষণার অভিযাত্রা। বাঙলাদেশ কোনোদিনই শিল্পপ্রধান নয়, কৃষিপ্রধান পল্লিবাঙলার নিসর্গ ও মানব প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল বাঙলা সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথে উক্তি অনুসরণ করে বলা যায়—"দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষে তৈরি।"

বাঙলা সাহিত্যে বয়ঃসন্ধি এবং যৌবন-মুক্তির পরিচয়—মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি ধারায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি; সেকথা কিছু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। আর তার কিছু পরেই শোনা গেছে বিহারীলালের আত্মমগ্ন উচ্চারণ। সেই রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান, আন্তর্বিষাদ, শিঞ্জনই ছন্দের ধ্বনিরই ধারাপথে আবির্ভাব ঘটল রবীন্দ্রনাথের। "কবিকাহিনী ঃ 'ভগ্নহৃদয়,' 'শৈশবসঙ্গীত' এবং 'ভানুসিংহের পদাবলী'র কথা বাদ দিলে 'সন্ধ্যাসংগীত'-কেই (১৮৮২) তাঁর প্রথম স্বকীয়তা চিহ্নিত কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন। অপরিণতির অঙ্কুর অবস্থা থেকে কবির প্রতিভা উন্মেষের প্রথম কাল এটি। 'সন্ধ্যাসংগীত-এই সর্বপ্রথম কবির 'মনের মধ্যে ফাঁকা একটা আনন্দের আবেগ আলিস্য" কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাব্যে কবির ভাবকল্পনা 'ভাবহীন' বস্তুহীন' কল্পলোকের সামগ্রী। তবে এই কাব্যেই একান্ত অন্তর্বদ্ধতা থেকে এলো আত্মনির্মোচনের যৌবন বাসনা। 'সন্ধ্যা সংগীত'—এ যা কেবল ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রভাত সংগীত (১৮৮৩) এ তারই প্রথম পরিস্ফূর্তি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সূচীমুখে নির্ধারিত হয়ে আছে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থটি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা চৈতালি', 'কল্পনা', 'ক্ষণিকা', 'নৈবেদ্য', ঐশ্বর্য পর্ব অতিক্রম করে 'গাতীঞ্জলি-গীতিকাব্য-গীতালি'র আত্মনিবেদনের সুরটি স্পর্শ করে আমাদের অভিসার 'চরৈবতি'র নতুন যুগে। গীতাঞ্জলি (১৯১০) গীতিমাল্য (১৯১৪) এবং গীতালি (১৯১৫)—এই তিনটি গীতিকবিতা সংকলনে ঈশ্বরপ্রেম, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, ভগবানের পূর্ণ উপলব্ধি, আত্ম সমর্পন সাধনা এবং আত্মিক প্রত্যয়ের রূপই প্রাধান্য পেয়েছে। জীবন মুগ্ধতা কেন্দ্রিক রোমান্টিকতা এই তিনটি সংকলনের প্রধান সুর নয়; পল্লিপ্রকৃতির দৃশ্যমালাও স্বাভাবিকভাবেই এই কবিতাগুলিতে রূপায়িত হয়নি। এই কবিতা সংকলনগুলিতে পল্লিপ্রকৃতির প্রসঙ্গ কোনো কোনো স্থানে এসেছে। কিন্তু রোমান্টিক রসমাধুর্যের পরিবর্তে তা এনেছে আধ্যাত্মিকতার

রসব্যঞ্জনা। বস্তুতই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির রচনাকাল মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে বা মহাযুদ্ধ সমকালে। কিন্তু তবু সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই প্রবন্ধে উক্ত কাব্যত্রয়ীর অন্তর্ভুক্তির কারণ 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের চিরচঞ্চল, চির পথিক বহুবিচিত্র ভাব কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্বকে অনুধাবনের জন্যই। আমরা হয়ত ভেবেছিলাম 'গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালিতে' ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদনই বুঝি রবীন্দ্র কবিচিত্তের শেষ আশ্রয় হল। কিন্তু বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতে কবি চেতনার যে বিস্তার ঘটে গিয়েছিল, সেখানে আবার নতুন আহ্বান এল- "আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া"। আর তারই ফলে গীতাঞ্জলি থেকে 'বলাকা'র ভাবনায় উত্তরণ।

তাই গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-র অব্যবহিত পরের কাব্য 'বলাকা'-র (১৯১৬) মূল সুর তত্ত্বকেন্দ্রিক, এটি গতিরাগের কাব্য। শুধু তাই নয় 'বলাকা' ঋতু সন্ধিরও স্বাক্ষর চিহ্নিত কাব্য। একদিকে তার 'গীতাঞ্জলি'র অর্ন্তমগ্ন নির্মোক মোচনের টান। আর একদিকে বিশ্বের মাঝখানে এসে দাঁড়াবার নতুন একাগ্রতা। প্রায় দু'বছর ধরে লেখা 'বলাকা'র ৪৫টি কবিতার ব্যক্তিগত মর্মমন্থন, কৈশোর প্রেমস্মৃতির আন্দোলন সমাজ পরিবেশ তথা যুদ্ধ প্রভাবিত বিনাশিকতার জনিত অন্তর বিক্ষোভ—এর সঙ্গে রয়েছে প্রেম, প্রকৃতিভাবনা ও মর্ত্যপ্রীতির নিবিড় অনুভব—

"আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পা ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
(১৯ সংখ্যক, বলাকা)

আবার কখনো বা নিসর্গ চিত্রের অন্তরালে বিশ্বব্যাপী জান্তব আঘাতের অচলায়তনে নবজীবনের উন্মোচনের ব্যাকুল প্রয়াস চোখে পড়ে—

"পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস।"
(১৩ সংখ্যক, যৌবনের পত্র)

বলাকার কোনো কোনো কবিতায় জীবনের প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘাতের সত্য উপলব্ধ হয়। তাই এখানে পল্লিগ্রাম প্রকৃতিচিত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না একথা স্বীকার করতে হবে। তবে দুটি কবিতায় প্রকৃতি চিত্রের রূপায়নে কোনো তত্ত্ব বা ভাবের অনুসঙ্গ নয়, রোমান্টিক ভাবনারই স্বতস্ফূর্ত প্রাধান্য। একটি প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা একটি ছায়া বট, তার সঙ্গে নদীর ঢালুতটে চাষীর কর্ষণ কার্য, ওপরে জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরের দিকে হংসপংক্তির উড়ে চলা ক্লান্তস্রোত শীর্ণনদী, মাঠের ধারে ধারে

বাঁকা পথ রেখা, ক্ষুদ্র কুটির—কবিকে বারবার উদাস করেছে—

"ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
....
কতদিন দেখিয়াছে কবি।" (৪১ সংখ্যক 'বলাকা')

নিরবচ্ছিন্ন গভীর চিন্তা, ভাব কল্পনা ও রহস্যানুভূতির জগৎ থেকে 'পলাতকা' ৯১৯১৮) কাব্যে কবি নেমে এসেছেন ধরণীর মাটিতে। এই কাব্যের কবিতাগুলি গল্পের ধরণে বলা। স্বচ্ছ মুক্ত, সহজ ও স্বাধীন এই কবিতাগুলিতে কবির অতীন্দ্রিয় জীবনের সুগভীর অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে সুনিবিড় নিসর্গপ্রীতি 'পলাতকা' কবিতা সংকলনে দুধরনেরর কবিতা আমরা পাই, কিন্তু কবিতায় কবির একান্ত নিভৃত, ব্যক্তিগত অস্ফুট বেদনার মূর্চ্ছনা যেন এক নিরেট রোমান্টিক আবেশ রচনা করেছে। অন্য আরেক ধরনের কবিতায় কবি নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে। সেখানে সাধারণ মানুষের জীবনের চিত্রের মধ্য দিয়ে একদিকে সংগ্রাম, অন্যদিকে বাস্তবসংসারের মধ্য থেকেও কিভাবে মানুষের মন সীমাবদ্ধ পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছড়িয়ে যেতে পারে তারই ভাষারূপ পাই 'মুক্তি', 'ফাঁকি' 'নিস্কৃতি' কবিতায়, 'ফাঁকি কবিতার নায়িকা বিনু সমস্ত জীবন সংসারের কর্মের চাকায় পিষ্ট সেই নারীসত্ত্বা আকস্মাৎ শারীরিক অসুস্থতার কারণে বেরিয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। সংসারের চতুর্দিকে এই বন্ধনের বেড়াজাল থেকে যখন সে মুক্তি পেল, বায়ু পরিবর্তনের সময় তখন তার মনে হল—

"নিখিলে আজ একলা শুধু আমি কেবল তার।"

'মুক্তি' কবিতাতেও বাইশটি বছর ধরে এক চাকাতেই বাঁধা অন্ধকারের জীবন থেকে নায়িকার মুক্তি এল মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, আর সেই মৃত্যুকে সে বন্দনা করল এভাবেই—

"এতদিনে প্রথম যেন কাছে
বিয়ের বাঁশী বিশ্ব আকাশ মাঝে।"

উপরোক্ত কবিতাগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে পল্লিগ্রামের উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করতে অসুবিধা নেই যে এরা প্রত্যেকেই গ্রামেরই মেয়ে বা বধু, নাগরিক স্বাধীনতার স্পর্শলাভ করেনি তারা। কিন্তু তাদের মনের স্বপ্নকল্পনার মধ্য দিয়ে কবি রোমান্টিকতার আবেশ রচনা করেছেন। 'শিশু ভোলানাথ' কাব্যগ্রন্থেও কবি শিশুজীবনের শৈশবলীলাকে পল্লিপ্রকৃতির (১৯২২) নির্যাসে পূর্ণ করে তুলেছেন—

"তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে।

নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে।' (মুর্খু)

'ইছামতী', 'জ্যোতিষী' এবং 'বৃষ্টি রৌদ্র' কবিতাতেও পল্লিগ্রামকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক ভাবনা মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

'পূরবী' (১৯২৫) কাব্যেও মন্ময় গীতিকবিতার রোমান্টিক গুঞ্জরণ শোনা গেছে। পরিপূর্ণ প্রেমও সৌন্দর্যবোধ রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের এক অপূর্ব সম্পদ। জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের বাসভূমি থেকে বিভিন্ন কারণে তিনি কিছু দিনের জন্য নির্বাসিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু 'পূরবী'তে আবার প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় যোগ উপলব্ধি করলেন। গ্রীষ্মের খরতাপ বর্ষার মেঘ, শরতের রোদ, সবুজ মাঠ, হরিৎক্ষেত্র, শ্যামলা মাটি মায়ের সঙ্গে সুগভীর আত্মীয়তা, নাড়ীর অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করলেন—

"আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন।" (মাটির ডাক)

এই পল্লিপ্রকৃতিকে ভুলে ছিলেন বলে কবির আক্ষেপও শোনা যায় 'পূরবী'তে —"কোন ভুলে হায় হারিয়েছিলি চাবি' (মাটির ডাক)

'আশা', 'চাবি', 'আকন্দ' বা 'না-পাওয়া' কবিতায়ও লেগেছে গ্রাম-বাঙলার স্পর্শ, সেখানে "কে যে যায় সারি গান গেয়ে। (না-পাওয়া)

'পূরবী'র জগৎ ও জীবন প্রীতি 'মহুয়া'-তে এক নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে. 'প্রসাধন কলা' ও সাধন-বেগের' সঙ্গে গভীর আবেগ ও নিবিড় ধ্যান মাধুর্যের সমন্বয়ে প্রেমের যে পরিপূর্ণ রূপ, সে প্রেম মর্ত্য-মানবচিত্তের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেই সৌন্দর্য ও রহস্যই 'মহুয়া' কাব্যের মূল সুর।' তাই পল্লিবাংলার ছবি 'মহুয়া' কাব্যে সেভাবে লক্ষিত না হলেও 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে নারী রূপের রোমান্টিক কল্পনায় বাঙলার গ্রামের উপমা এনেছেন কবি—

"সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলতানে; (শ্যামলী, নবনী)

অথবা খেয়ালী' তে দেখা যায়—

"মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অনুকারে

....

প্রশবিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,"

'মহুয়া'র পরেই 'বনবাণী' (১৯৩১) কবিতা সংকলনটির পরিকল্পনাই হয়েছিল প্রকৃতি পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা জাগাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ ক্রমশই বিশেষভাবে পরিবেশ সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমে তিনি প্রচলন করেছিলেন এমন কিছু বার্ষিক উৎসবের, সেগুলির সঙ্গে কোন ধর্মীয় অনুসঙ্গ জড়িত ছিল না। যেমন—বর্ষামঙ্গল, হল কর্ষণ, বৃক্ষরোপণ। পল্লিপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়র সংযোগ এই উৎসবগুলির মধ্যে মূর্ত। আশ্রম সন্নিকটবর্তী বোলপুর ও সুরুলের গ্রামের মানুষ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এই উৎসবগুলির সঙ্গে। শান্তিনিকেতনের উৎসবগুলি রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় মুখরিত থাকত, সেই সব গান ও কবিতার সংকলনই 'বনবাণী'। নিসর্গ অনুধ্যান এখানে বায়বীয় রোমান্টিক নয়, জীবনের অস্তিত্বের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। নবীন গাছের চারা এখানে মরুবিজয়ের কেতন। বৃক্ষ এখানে মৃত্তিকার আশ্রয়, বাতাবরণের শুদ্ধতার দূত। রবীন্দ্রকবিতার অন্যান্য ক্ষেত্রে নিসর্গ কেন্দ্রিক রোমান্টিকতার যে অনুভূতি আমরা পাই, বনবানীর নিসর্গবোধ সে তুলনায় অনেক বেশি মৃত্তিকা স্পর্শী। আরণ্যক মহিমার চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ রোমান্টিক অনুভব রয়েছে 'বনবানী'র অভিজ্ঞানে।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'পরিশেষ' কবিজীবনের শেষ অধ্যায়ের আত্মবিশ্লেষণের আত্মপরিচয়ের কাব্য বিশ্বসত্তার গভীর পরিচয়, গভীরতর স্পর্শে আবেগময় প্রকাশ আছে এই কাব্যে। নতুন জীবন, নতুন সম্ভাবনা, নতুন হাতছানির মধ্যেও আছে পল্লিগ্রামের মন ব্যাকুল করা ডাক—

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলগাছের দীর্ঘ পাতে পাতে;
গ্রামের ভাগে ক্ষণে ক্ষণে ধূলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায়" (আছি, পরিশেষ)

"পরিশেষ" কাব্যগ্রন্থের অব্যবহিত পরেই 'পুনশ্চ' প্রকাশিত হয় (১৯৩২)। 'পুনশ্চ'-এ আমরা দেখি কবি জগৎ, জীবন ও প্রকৃতিকে শুধু চোখ দিয়ে দেখছেন না; দেখছেন সমগ্র চৈতন্য দিয়ে। এ কাব্যে কবি যেন দার্শনিক ভাবুকতার মোহে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এখানে তিনি পল্লিকে, প্রকৃতিকে দেখেছেন বাস্তব সৌন্দর্যের সামগ্রীরূপে। তাই পদ্মাপারের উজ্জ্বল শ্যামল রঙ, কোপাই নদীর শীর্ণ পাণ্ডুরতা—সবই একেবারে কাব্যার্থের উজ্জ্বল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। 'খোয়াই' কবিতাটি

রচিত হয়েছে শান্তিনিকেতনের পাশ দিয়ে বয়ে চলা নদীকে নিয়ে—"পশ্চিমে বাগান বনচেষা খেত / মিলে গেছে দূরে বনান্তে বেগনি কল্পরেখায়। মাঝে আসে জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা সাঁওতাল পাড়া /পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে/ রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।"

"পুকুর ধারে' কবিতাটিতেই গাছপালা পুকুর ফুল ফসলে ঘেরা গ্রামের ছবি স্নিগ্ধ প্রশান্তি এনেছে। "ছেলেটা" কবিতায় পল্লি প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক দুরন্ত ছেলের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। 'ছেলেটা' কিংবা 'বালক' কবিতার সঙ্গে 'অতিথি' গল্পের তারাপদ, অথবা 'আপদ' এবং নীলমনি, কিংবা 'ছুটি' গল্পের ফটিকের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। গল্পগ্রন্থের বেশির ভাগ রচনাতেই গ্রাম বাঙলার মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটির বিস্তৃত পরিসরে জুড়ে শহরের কথা থাকলেও স্বল্প পরিসরে সাঁওতাল পরগণার নিসর্গ প্রকৃতি ও সাঁওতাল মেয়ের উপস্থিতির স্বভাবসুন্দর স্নিগ্ধতাটুকু রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছে। 'পুনশ্চ'র 'বাঁশি' কবিতাটির রোমান্টিক আবেদন অপরিসীম। এই কবিতার নায়ক হরিপদ কেরানি শহরের সদাগরি অপিসের কনিষ্ঠ কেরানি। বেতন পঁচিশ টাকা। বেতন কম বলেই হরিপদ—

"ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম" থেকে পালিয়ে এসেছে। কারণ—

"তাঁর দেওরের মেয়ে অভাগার
সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।

....

মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এল না সেতো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।'

তারপর যেদিন—

"হঠাৎ সন্ধ্যায় সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান",

তখন সৌন্দর্যবোধ ও অনুভূতির সূক্ষ্মতা তার মনকে জীবনের সব কুশ্রীতা ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে নিয়ে যায়। তার মনের মধ্যে বয়ে চলে ধলেশ্বরী, যার তীরে তমালের ছায়া, সেখানে চিরদিন যে অপেক্ষা করে থাকে। তার পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর। এই বেদনার সৌন্দর্য হরিপদকে তাঁর তুচ্ছ, ক্ষুদ্র জীবনের হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

"শেষ সপ্তক" (১৯৩৫) ও "বীথিকা' সংকলন দুটিতে কবির দার্শনিক মনেরই বিস্তার ঘটেছে। এই দুটি গ্রন্থের জীবনের পরিণত পর্বে অনিত্যের প্রাঙ্গণ ছেড়ে বৈরাগ্যের

সুর তার লেখায় গুঞ্জরিত হয়েছে। এই দুটি সংকলনের কবিতায় অল্পস্বল্প গ্রাম চিত্র থাকলেই সেগুলি উপমারূপেই ব্যবহৃত যেমন—

'বৈকুণ্ঠের সুর সবে বেজে ওঠে মর্ত্যের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের' পর, (মাটিতে আলোতে ঃ বীথিকা)

অসীমের অপরূপ ব্যঞ্জনা কবিমনে রোমান্টিক অনুভব এনেছে পল্লিপ্রকৃতির অনুষঙ্গে 'পুত্র পুট' (১৯৩৬) কাব্যে—

"আমার ছুটি চারদিকে ধু ধু করছে
ধান কেটে নেওয়া খেতের মতো।
আশ্বিনের সবাই গেছে বাড়ি
তাদের সকলের ছুটির পলাতকা ধারা মিলেছে
আমার একলা ছুটির বিস্তৃত মোহনায় এসে
এই রাঙামাটির দীর্ঘ পথ প্রান্তে।" (২ সংখ্যক)

'শ্যামলী' (১৯৩৯) কাব্য গ্রন্থের অনুভবে বাঙলাদেশের মাটি এবং বাঙালি নারীর নিবিড় স্পর্শ। 'শ্যামলী' নামেই রয়েছে কবির শেষ জীবনের আবাস মাটির বাড়ি 'শ্যামলী'-র স্বপ্ন ভাবনা সুরভি। রবির অস্তালোকে ধূসর ভাবনায় যেন রোমান্সের মায়া নিয়ে আসে বাংলা দেশের স্নিগ্ধ সজল শ্যামলিমা—

"ওগো শ্যামলী,
আজ শ্রাবণে তোমার কালো কাজল চাহনি
চুপ করে থাকা বাঙালি মেয়েটির
ভিজে চোখের পাতায় মনের কথাটির মতো।'

'শ্যামলী'-র আধুনিক প্রেমচেতনায় রোমান্টিক কবিসত্তাই জয়যাত্রা তারই আভাস 'হঠাৎ দেখা' কবিতায়—

"মনে হলো কালো রঙে একটা গভীর দূরত্ব
ঘনিয়ে নিয়েছে নিজের চার দিকে।
সে দূরত্ব সর্ষেখেতের শেষ সীমানায়
শালবনের নীলাঞ্জনে।
থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা
চেনা লোককে দেখলেম অচেনার গাম্ভীর্যে।"

"হারানো মন" কবিতাটিতে পল্লিপ্রসঙ্গ এসেছে আত্মবিস্তৃত চেতনার মধ্য দিয়ে—

"আমার ভালোবাসা

যেন সেই আল ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেক দিন হল চাষি যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে।'

পুরোনো স্মৃতির স্নিগ্ধ মাধুর্য ও বিপন্ন ছায়া পড়েছে 'অমৃত' কবিতায়—

অনেক সন্ধানের পর
দেখা হল শেষে।
কোনো বারো ভুঁইঞাদের আমলের
একখানা তিন কাল পেরোনো গ্রাম
একটি পুরনো দিঘির ধার—
....
একটি নতুন আটচালা ঘর,
সেইখানে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়।"

"শ্যামলী" কবিতাটিতে বাংলাদেশের অন্তরার্দ্রতাসিক্ত, অন্তশ্চলনিবদ্ধ কবিদৃষ্টি চিরায়ত জীবনের অনুভাবনাকেই গভীর বর্ণে চিত্রায়িত করতে চেয়েছে।

জীবনমরণের সীমানাভূমিতে দাঁড়িয়ে উপলব্ধ অভিজ্ঞতা ও অনুভব আশ্রিত 'প্রান্তিক' (১৯৩৮) কবিতা সংকলনেও কবি লিখেছেন

"দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ..................................(৯ সংখ্যক, প্রান্তিক)

চেতনা নিশ্চেতনার অকূল পাথারেও রয়েছে বাঙলার নদীর অতলান্ত গভীরতা, মৃত্যুর ছায়ামুক্ত কবিচিত্ত 'সেঁজুতি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থে আবার স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই 'চলতি ছবি' কবিতায় আবার গ্রাম বাঙলার মুগ্ধতার চিত্র স্পষ্ট হয়েছে—

"রোদদুরেতে ঝাপসা দেখায় ওই যে দূরের গ্রাম
কোন ঝাপসা না জানা ওর নাম।
....
দেখে গেলাম গ্রামের মেয়ে কলসি মাথায় ধরা,
রঙিন শাড়ি পরা
....
ওই গ্রামেরই দিনের অন্তে স্তিমিত দীপ রাতে
তরঙ্গিত দুঃখসুখের নিত্য ওঠা নাবা—"

আর "পালের নৌকা' কবিতায় 'মহাকালের তরী'তে চেপেও নানা প্রাকৃতিক

দৃশ্যের সঙ্গে কবির রোমাঞ্চে ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়—

"দক্ষিণে ও বামে
গ্রামের পরে গ্রাম"।

'সেঁজুতি' শব্দের অর্থ সন্ধ্যাপ্রদীপ। সন্ধ্যাপ্রদীপ বললেই অভ্রান্ত জেগে ওঠে পল্লিবাঙলার গ্রামের চিত্র। এই অনুভূতি সেজন্য এই সংকলনের কবিতার অকৃত্রিমতার স্পর্শে স্নিগ্ধ ও জীবন্ত।

জীবনের সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ কল্পনার দীপ জ্বালিয়ে সেই স্বপ্নময় বিলীয়মান স্মৃতিকে নতুনরূপে উদ্দীপিত করে দেখতে চেয়েছেন "আকাশপ্রদীপ' (১৯৩৯)। এই কাব্যের 'সময়হারা' কবিতাটি তেমনই। সমকালীন অনুভবের বৃন্তে চিরকালীনতার চরিত্র নির্যাসেও আছে কবির প্রিয় ধানের প্রসঙ্গে—

"উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নে ধানের খই,
সরু ধানের চিড়ে দেব, কাগসারে দই।"
"আমারে বলে যে ওরা রোম্যান্টিক।
সে কথা মানিয়া কই
রসতীর্থ পথের পথিক।" (রোম্যান্টিক নবজাতক)

বিশ্বব্যাপী জীর্ণতার প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল 'নবজাতক' (১৯৪০) কাব্যগ্রন্থ। এই কবিতা সংকলনে নিসর্গ প্রকৃতি বা গ্রাম বাঙলার তেমন চিত্র নেই, কিন্তু সমকালীন কবিতার জগৎ তখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাস্তবতা বিমুখ কল্পনা প্রিয় 'রোম্যান্টিক' আতিশয্যের অভিযোগে মুখর হয়েছিল। 'রোমান্টিক' কবিতায় সেই অভিযোগেরই জবাবদিহি উপলক্ষে আপন বক্তব্য দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন কবি—

"দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
সেথায় রমনী দস্যুভীতা—
সেথায় উত্তরী ফেলি পারি বর্ম
সেথায় নির্মম কর্ম।'

তাঁর সৃজনশীল চেতনায় 'সুন্দর' চলেছে 'ভৈরতের সাথে 'হাতে হাতে' ধরে।" সেখানে ভূমিকম্পের ভয়াবহতাকে অতিক্রম করে—

" উপর তলায় হাওয়ায় দোলায় নবীন ধানে
ধানশ্রীসুর মূর্ছনা দেয় সবুজ গানে।"

'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে আসাধারনত্বের স্পর্শ লেগেছে বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে রোমান্টিকতার মেলবন্ধনে।

গীতিকবিতার সৌরভে, ভাবমাধুর্যে ও কল্পমায়ায়, পুরোনো প্রেমের নতুন

আস্বাদনে, নিসর্গের ক্লান্ত মধুর রূপের সুকুমার সম্ভোগে রবীন্দ্রনাথের গোধূলি পর্যায়ে সমস্ত কাব্যের মধ্যে 'সানাই' (১৯৪০) সার্থকতর। তাঁর অসামান্য রোমান্টিক প্রতিভার পরিচয় রয়েছে 'সানাই' কবিতায়। এই কবিতা সংকলনে কবির গীতিময় রোমান্টিক তা কতবার গ্রাম বাঙলার প্রকৃতিকে আশ্রয় করেছে—

'হেথা হোথা পল্লিমাটি স্তরে
পাড়িব নীচের তলে
ছোলা খেত ভরেছে ফসলে।
অরণ্যে নিবিড় গ্রাম নীলিমার নিম্নান্তের পটে;
বাঁধা মোর নৌকাখানি জনশূন্য বালুকার তটে।' (মানসী/সানাই)

আবার 'অসময়' কবিতায় সুর্তির পথ বেয়ে এসেছে পল্লির রিক্ততার ছবি—

"বিকালবেলা ফসল শুকানো
শূন্য খেতে
বৈশাখে কবে কৃপণ ধরণী
রয়েছে তেতে
....
অরুণে শ্যামলে উজ্জ্বল সেই
পূর্ণতারে
মিথ্যা ভাবিয়া ফিরে যাবে সে কি
রাতের অন্ধকারে।"

'সানাই' এ আমরা একজন নতুন রবীন্দ্রনাথকে পাই। সেখানে তাঁর আত্মলীন কল্পনাকে শিথিল করেছে বস্তু পৃথিবীর চেতনা। তাই 'অপঘাত' কবিতায় দেখা যায় 'সূর্যাস্তের পথ হতে বিকালের রৌদ্র 'নেমে গেছে, 'বাতাস ঝিমিয়ে গেছে বেসে,' বাঙলার সুদূর গ্রামের 'জনশূন্য মাঠে' 'বিচালি-বোঝাই গাড়ি' মন্থর গতিতে চলেছে। পিছনে 'দড়ি-বাঁধা বাচুর চলেছে"। পল্লি বাঙলার এক বিস্তৃত পরিসরের চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে এ কবিতায়।" আর এই নিভৃত গ্রামীণ প্রতিবেশে যখন নিবিড়তম জীবনপ্রেমের অধরা ছবিটি চেতনায় বিমুর্ত হয়ে ওঠে, ঠিক তখনই—

"টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে
ফিনল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

রোমান্টিকতার আবেশ যেন পূর্ণতার পরম মুহূর্তে যেন নিষ্ঠুর নাটকীয় ক্লাইম্যাসে স্তব্ধ হয়ে গেল।

রবীন্দ্র কাব্যসৃষ্টি প্রবাহের একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে 'রোগশয্যায়' (১৯৪০),

'আরোগ্য' (১৯৪১), 'জন্মদিনে' (১৯৪১) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' (১৯৪১) সমস্ত মানব সংসার এই কাব্যগুলির আশ্রয়। মানুষ আর প্রকৃতিকে নিয়ে এই 'বিশ্বরূপের খেলার ঘরে' প্রাণের বিচিত্র লীলার কথাই উপরোক্ত চারটি কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি স্বচ্ছ শুভ্র ধ্যান দৃষ্টিতে দেখেছেন মানবসংসার, মাটির ঘর আর সেই মাটির মানুষ। 'রোগযন্ত্রণার কথা থাকলে মানবাত্মার জয় ঘোষণার বাণীতে উচ্চারিত। তাই এই 'অনিঃশেষ প্রাণ' 'আরোগ্যের পথে প্রসন্ন প্রাণের নিমন্ত্রণ পেয়ে ২৭ সংখ্যক কবিতায়।

শ্বাসরুদ্ধ কক্ষের বাইরের জগতকে দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন—

খুলে দাও দ্বার;
নীলাকাশ করো অবারিত
কৌতূহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ;
প্রথম রৌদ্রের আলো।"

ছায়াচ্ছন্নতা থাকলেও 'আরোগ্য'র কবিতাগুলিতে অসুখের অবসাদ বা নৈরাশ্যের ছায়া পড়েনি কোথাও। বরং পৃথিবী মানুষ পশুপক্ষী, তরুলতার সত্য সুন্দর আনন্দরূপ কবিকে নতুন করে এক মধুর রোমাঞ্চিত ভাবনায় অনুপ্রাণিত করল; 'নির্জন রোগীর ঘর'-এর "খোলা দ্বার দিয়ে' জীবনের পুরোনো স্মৃতিগুলি ভেসে উঠল। সেই পদ্মার ভাঙা পাড়ের নীচে নৌকাবাস, পাল-তোলা জেলে-ডিঙ্গি, ঘোমটা পরা পল্লি-মেয়েদের নদীর ঘাটে আসা-যাওয়া, ছায়ায়-ঢাকা আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাঁকাপথ, পুকুরের ধারে সর্ষেক্ষেত, হাটের দিনের নদীর ঘাটে প্রাচীন অশথতলায় পাড়গামী হাটুরেদের ভিড়, পাটবোঝাই গাড়ি, ধানের ক্ষেত, মোষের গলা ধরে চাষীর ছেলের সাঁতার কবির মনকে শান্ত সৌন্দর্যে যেন বিভোর করে রেখেছে। আর ১০ সংখ্যক কবিতায় কবি ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে ছবি এঁকেছেন উপেক্ষিত মানুষদের—যারা চিরকাল

"টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।"

এই মাটির ধরণী ও মাটির মানুষ, এদের কেন্দ্র করেই জীবনের ক্ষীয়মান বাকি কয়েকটি দিন কেটে গেছিল কবির।

"জানব আমার শেষের মাসে ভাগ্য দেয়নি ফাঁকি,
শ্যামল ধরার সঙ্গে আমার বাঁধন রইল বাকি।" (১৮ সংখ্যক আরোগ্য)

জন্মমৃত্যুর মিলন মোহনায় দাঁড়িয়ে কবি যে কাব্য রচনা করলেন, তার নাম 'জন্মদিন"। এ কাব্যের প্রতিটি সুরকেই মৃত্যুর স্থির পদধ্বনি। কিন্তু এই 'পৃথিবীর কবি'

সৃষ্টির বিচিত্র লীলা, জন্মমৃত্যুর রহস্যের গভীরে মগ্ন হয়েও সমসাময়িক মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র্য, পৃথিবীব্যাপী অত্যাচার অবিচার, রক্তোন্মত্ত ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে সচেতনতা ব্যক্ত করতে এনেছেন গ্রামের প্রসঙ্গ—

"হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।" (১৬ সংখ্যক, জন্মদিনে)

১০ সংখ্যক কবিতাটি তাঁতী, জেলে, চাষীর সঙ্গে 'জীবনে জীবন যোগ' করতে না পারার অতৃপ্তিতে ভারাক্রান্ত—

" আমার কবিতা আমি জানি
গেলেও বিচিত্র পথে এই নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।"

এই বর্ণনায় পল্লিপ্রকৃতির আবেগ বিহ্বল রূপ নেই, কিন্তু ২৮ সংখ্যক কবিতায় কবি যখন লেখেন—

"নদীর পালিত এই জীবন আমার!
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে।
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত।
প্রাণে রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।"

তখন বোঝা যায় নদী তাঁর কত 'গভীর চেতন'-এ প্রবেশ করেছিল। জীবনের কোন বেলাতেও নদীকে আশ্রয় করে প্রবহমান সৃষ্টিধারার অসাধারণ রোমান্টিক কাব্যরূপ নির্মাণ করলেন কবি। ছিন্নপত্র-এর অন্তর্ভুক্ত একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"..........এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর এই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর গুণগুণ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে—শ্রাব্য সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে।" একথা শুধু নদীরই নয়, বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিশেষভাবে সুপ্রযুক্ত।

মৃত্যুর অভিজ্ঞতা-পূর্ণ প্রাণের পরিচয়ে স্বচ্ছ 'শেষলেখা' কবিতা সংকলন' প্রাণশক্তিতে মৃত্যুকে পরাভূত করে আত্মঅন্বেষণ ও আত্মস্বরূপের পরিচয় পেয়ে, কঠিন সত্যকে ভালোবেসে কবি জানিয়েছেন—

"অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।" (১৫ সংখ্যক 'শেষলেখা')

রবীন্দ্রনাথের পূর্বেকার কাব্যগ্রন্থগুলিতে পল্লিপ্রকৃতির ও মানব প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের যে অপরূপ প্রকাশ দেখা গিয়েছিলে, শেষলেখায় তা দুর্লক্ষ্য খুব স্বাভাবিকভাবেই, কারণ—

"সম্মুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণ ধার।"

কিন্তু 'মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়' হয়ে যাওয়া কবির মনকে তখনও ব্যাকুল করে তোলে পাখির কলকাকলি 'অরুণ-আলোর প্রথম পরশ' লেগে গাছের কাঁপন অথবা—'রৌদ্রতাপ ঝাঁঝাঁ করে জনহীন বেলা দুপহরে।"

তার 'শূন্য চৌকির পানে চাহি" কবির বুক অকারণ শূন্যতার হতাশায় যেন" হাহাকার' করে ওঠে—

"সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।' (১১ সংখ্যক 'শেষলেখা')

প্রত্যয়োলব্ধি এই চরম বাণীরূপে দৃষ্টিধৌত শ্রাবণের/নির্মল আকাশে'-র মতোই স্বচ্ছ। শুভ্র, সরল অথচ কঠিন স্পষ্ট, সংহত।

তথ্যসূত্র ঃ

১। রবীন্দ্রনাথের বলাকা ঃ বারীন্দ্র বসু
২। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা ঃ শ্রীভূদেব চৌধুরী
৩। রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা ঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৪। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা ঃ নীহাররঞ্জন রায়
৫। রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শম্পা বসু, অধ্যাপিকা, মহিষাদল রাজ কলেজ, পূর্বমেদিনীপুর

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ ও তিরিশের কবিদের বাংলা কবিতায় প্রেম

স্বরাজ কুমার দাশ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪) মানব-সভ্যতার কাছে কলঙ্ক। বাঙালি মনন এই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে পালটে যেতে শুরু করেছিল। কবিতাও সেই মননের পালটে যাওয়ার দলিল হয়ে উঠল। প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ পর্বে বাংলা কবিতার মজ্জায় ছিল সনাতন ভারতীয় আদর্শ ও মূল্যবোধ — 'বাংলার গ্রাম-প্রকৃতির সৌন্দর্য, শাক্ত ও বৈষ্ণব গীতিকবিতার গুঞ্জন, স্নিগ্ধ ধরনের দেশ-প্রেমের ব্যঞ্জনা, পারিবারিক গার্হস্থ্য ধর্মের শান্ত নিবিড়তা''[১]। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শ কেন্দ্রিক কবিতার দশক। বিদেহী প্রেম, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, সত্য, বিশ্বাস, ন্যায়, মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুসারী কবিদের কবিতা। দু'এর দশকে মূলত তিন কবির (মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম) হাত ধরে বাংলা কবিতা রবীন্দ্রাদর্শের খাত পরিহার করে নতুন খাতে প্রবাহিত হল। তাছাড়া ১৯২৩-১৯৩০ পর্যন্ত কালপর্বে প্রকাশিত হয়েছিল 'কল্লোল', 'কালিকলম'-এর মতো পত্রিকা, যাদের মঞ্চে সনাতন মূল্যবোধ ও রবীন্দ্রাদর্শ পরিহার করে বাংলা কবিতা আধুনিক হয়ে উঠল। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছিলেন, ''এমনভাবে লিখে যাবে যেন তোমার সামনে আর কেউ দ্বিতীয় লেখক নেই। কেউ তোমার পথ বন্ধ ক'রে ব'সে থাকেনি।'' এই 'কেউ' বলতে রবীন্দ্রনাথকেই বোঝানো হয়েছে। এই সনাতন মূল্যবোধ ও রবীন্দ্রাদর্শ চলতে চলতে ''হঠাৎ ... যখন বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন্।''[২] অনেক সমালোচক 'আধুনিক' বলতে বুঝিয়েছেন ''কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী''[৩] কাব্যকে।

রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হওয়ার প্রয়াস নানা দিক থেকে ঘটেছিল। গ্রামের জায়গায় এল নগর, ভগবান ও নীতিধর্মের জায়গায় এল অবিশ্বাস, বিশ্বাসের জায়গায় এল ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ। প্রেম-ভাবনার ক্ষেত্রেও দেখা দিল সেই রবীন্দ্র-মুক্তিপ্রয়াসী চেতনা। প্রেমের মাধুর্য ও নিষ্ঠায় আস্থাবোধ জারি রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আজীবন। বিদেহী 'অনন্ত প্রেম'-এর প্রয়াসী ও পিয়াসী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর শেষ প্রেমের কাব্য 'সানাই'-এও বেজেছে সেই সুর। তাই রূপসীর চলে যাওয়ার মধ্যেও খুঁজে পান তিনি প্রেমের সেই অনির্বচনীয় অমূল্যরতন

> চলে গেলে হে রূপসী, মুখখানি ঢেকে,
> বঞ্চিত করনি মোরে, পিছনে গিয়েছে কিছু রেখে।
>
> (অসম্ভব ছবি/সানাই)

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দু'য়ের দশকের আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথের এই প্রথাগত প্রেম-ভাবনার পথ পরিহার করলেন। **যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত** ঘোষণা করলেন

> প্রেম ব'লে কিছু নাই
> চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।
>
> (ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক মরীচিকা)

শুধু তাই-ই নয়, যতীন্দ্রনাথের কাছে 'প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশি রাতি' (ঘুমের ঘোরে প্রথম ঝোঁক/মরীচিকা)। রবীন্দ্রনাথের অসীম প্রেমের ধর্মকে সীমায়িত করে দিলেন যতীন্দ্রনাথ রাত বারোটার কথা উল্লেখ করে। দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথের কাছে প্রেম 'মামুলি', কারণ অভাবের দ্বারা প্রতিনিয়ত জর্জরিত

> অভাবের নাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
> মামুলি প্রেমের নেট-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
>
> (মন-কবি/মরীচিকা)

আধুনিক কাব্যে প্রেম দেহ-নির্ভর। হয়তো এই চেতনার মূলে আছে ফ্রয়েডের দর্শন ও ডারউইনের জীব-বিবর্তনের মতাদর্শ। **মোহিতলাল** রবীন্দ্রনাথের দেহাতীত ভাবনাকে বাদ দিয়ে দেহবাদে আশ্রয় নিলেন। তিনি হয়ে উঠলেন 'রূপতান্ত্রিক' বা দেহবাদী। তিনি দেহকে বন্দনা করলেন এইভাবে

> হায় দেহ! — নাই তুমি ছাড়া কেহ —
> জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
> ... ...
> তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,
> তুমি আছ তাই আছে কাল-দেশ,
> দুঃখ-সুখের মহাপরিবেশ! —
>
> (মৃত্যুশোক/বিস্মরণী)

মোহিতলালের এই দেহবাদী চেতনা অবশ্যই মনে করিয়ে দেবে স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের পঙ্‌ক্তির কথা — 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ' (আমার ভালবাসা গোবিন্দ-চয়নিকা)। গোবিন্দ দাসের মনোভঙ্গির সাথে মোহিতলালের মনোভঙ্গির সাদৃশ্য থাকলেও ''মোহিতলালের সঙ্গে গোবিন্দদাসের তুলনা চলে না, কারণ মোহিতলালের কবিতার মধ্যে যে সচেতন ধারাবাহিকতা ও বিশ্লেষণ আছে গোবিন্দদাসে তা অনুপস্থিত। তাছাড়া দেহাত্মবোধের জন্য গোবিন্দদাসের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন ঘটে না। বহুযুগ পূর্বেই সংস্কৃতকাব্য ও বৈষ্ণব কবিতায় নারী বাসনার রক্তকমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।''[৪] মোহিতলালের দেহবাদী প্রেমের আরও কিছু দৃষ্টান্ত

- আমি মদনের রচিনু দেউল — দেহের দেউল প'রে
  পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ-ফুল সাজাইনু থরে থরে।

  (স্মরগরল/স্মরগরল)

- পরশ-হরষে মজি নাই — তাই গেয়েছি দেহের গান

(গঙ্গাতীরে/হেমন্ত গোধূলি)

- দেহই অমৃত ঘট, আত্মা তার ফেন-অভিমান

(নারীস্তোত্র/স্মরগরল)

রবীন্দ্র-বলয় অতিত্র(মে দু'য়ের দশকের আরেক কবি **নজ(ল ইসলাম**। তিনি মেজাজে মননে বিদ্রোহী। উদ্ধত যৌবনের লেলিহান শিখা নিয়ে মানবস্তুতি করার সাথে সাথে প্রেমস্তুতিও করলেন

আমি বন্ধনহারা কুমারীর বেণী, তন্বী নয়নে বহ্নি(,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম, উদ্দাম, আমি ধন্য।

(বিদ্রোহী/অগ্নিবীণা)

দেহাতীত ভাবনা থেকে সরে এসে মোহিতলালের মতো নজ(লও নির্ভীক দেহবাদের কথা ব্যক্ত(করলেন কবিতায়

আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধনী স্মরিছে পতি।
তার নিধুবন-উন্মন
ঠোঁটে কাঁপে চুম্বন
বুকে পীন যৌবন
উঠিছে ফুঁড়ি,
মুখে কামকণ্টকব্রণ মহুয়া কুঁড়ি।	(মাধবী প্রলাপ/সিন্ধু-হিল্লোল)

তবে নজ(লের প্রেম বিষয়ক কবিতা সম্পর্কে একটা কথা বলতেই হয় যে তাঁর 'খ্যাতি প্রধানত নির্ভর করে তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায়-অবিচার শোষণ উৎপীড়নের বি(দ্ধে বিদ্রোহমূলক কবিতাগুলির উপর।'[৫] প্রেমের কবিতায় নজ(ল একজন মনোহারী শিল্পী। তাই তিনি প্রেম বিষয়ক কবিতায় শুধু দেহের কথাই উল্লেখ করলেন না, সেই সাথে বিশ্ববোধও উন্মোচিত হল। ব্যক্তি(কামনার মধ্যে বিশ্বকামনাকে অনুভব করলেন

ছুঁয়েছি অধর
তিলোত্তমা, তিলে তিলে! তোমারে যে করেছি চুম্বন
প্রতি ত(ণীর ঠোঁটে। প্রকাশ গোপন।
ত(-লতা, পশু-পাখী, সকলের কামনার সাথে
আমার কামনা জাগে, আমি রমি বিশ্বকামনাতে।

(অনামিকা/সিন্ধু-হিল্লোল)

রবীন্দ্র-বিরোধিতা, মননশীলতা ও দেহবাদের যে প্রতিষ্ঠা ঘটল দু'য়ের দশকে যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজ(লের প্রেমের কবিতায়, তারই ধারাকে আরও প্রসারিত ও

তরঙ্গায়িত করলেন তিরিশের কবিরা। **প্রেমেন্দ্র মিত্রের** কাছে প্রেম 'বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্ন'(কিন্তু তার জন্য কর্ম ও ঘর্মের এই কবি সময় দিতে চান না। প্রেমেন্দ্র মিত্র বললেন

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের(
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের-তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই	('প্রথমা')

হুইটম্যানের মতো তিনিও sex-less love-এ বিশ্বাসী। এই sexless love রবীন্দ্রনাথের মতো sexless love নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রেমকে অনন্ত ও অসীমের প্রে(াপটে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস নেই তাঁর। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রেমের কবিতায় দেহ প্রাধান্য পায়(কিন্তু দেহ ও তার যৌবনের মধ্যে থেমে থাকে না তাঁর কবিতা। কারণ দেহের যৌবন সাময়িক

রূপের মেয়াদ দু'দিন মোটে
দু'দিন মেয়াদ যৌবনের(
প্রিয়ার ঠোঁটের গুলবাগে ভাই
ইজারা যে দুই দিনের!	('প্রথমা')

তাই শেষ পর্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রেমকে সীমায়িত যৌবনের ক(থেকে নিয়ে গেলেন বৃহত্তর জীবনের প্রে(াপটে — সুদূর বন্দরের জাহাজের ডাকে, সাগর পাখির শাখ-মাজা ডানার মতো আকাশে, তুষারপৃষ্ঠ পাখির ডিঙিয়ে পৃথিবী-পরিত্র(মায়, সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধে, বাঁধা নোঙরের কূলহীন সমুদ্রে ছিঁড়ে যাওয়ার মধ্যে — অর্থাৎ সবখানে। কবি তাই বললেন

ছিঁড়ে যাক জীবনের ঘাটে বাঁধা নোঙর!
কূলহীন সমুদ্র,
দিগন্তহীন আকাশ,
তুমিত আমার সে-ই!	(সৌরভ/সম্রাট)

তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি **বুদ্ধদেব বসুর** কবিতায় প্রেম প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো sexless love হয়ে উঠল না। বরং তিনি যৌবনের বন্দনা করলেন। রোমান্টিক কবির মতো প্রেমকে তিনি অতীন্দ্রিয় ও অমূর্ত-সত্তায় দেখলেন না। বরং তিনি বললেন

বাসনার ব(মাঝে কেঁদে মরে (ুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তে(র আরক্ত(লাজে ল(বর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভি(া মাগে নিতি(—

(বন্দীর বন্দনা/বন্দীর বন্দনা)

অবশ্য তিনি এই কামনার কারাগার থেকে মুক্ত(হতে চেয়েছেন — 'বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার/অমৃতের তরে।' (বন্দীর বন্দনা/বন্দীর বন্দনা)। এই 'অমৃতের

তরে' পিপাসাই কবিকে শিখিয়েছে শৃঙ্গার কামনা মানে 'নির্বোধ নারীর পাল, স্থূল মাংস স্তূপ,/শরীর সর্বস্ব মূঢ়! চর্ম-সাথে চর্মের ঘর্ষণ' (কোনো বন্ধুর প্রতি/বন্দীর বন্দনা)। তাই এখানে কোনো সুখ নেই। সুখ শৃঙ্গারের ফলশ্রুতিতে, সন্তানদের স্তন্যদানের মধ্যে। সেই সুখকেই কবি বলেছেন 'উচ্চতম স্বর্গলাভ'। এইভাবে কবি বাসনার মধ্যেই অমৃতলাভ করলেন। এই অমৃতলাভের প্রয়াস দেখা যায় 'কঙ্কাবতী', 'দময়ন্তী' ও 'নতুন পাতা' কাব্যগ্রন্থেও। এখানে কবি যৌবনের অভিশাপ অর্থাৎ যৌন-চেতনাকে উপযু(মর্যাদা দিয়েছেন। প্রৌঢ় বয়সে লেখা কাব্যগ্রন্থগুলিতে কবি গভীরতম অন্তর্জগতের শিল্পকর্মে ডুব দিলেন। সেখানে যৌন চেতনাও শিল্পধর্মে পুষ্পময় হয়ে ওঠে

১. দীর্ঘ সন্ধ্যা, সন্ধ্যার সঙ্গম(পে
থরে থরো রাত্রি কাঁপে, প্রথম রাত্রিতে ব্রীড় মতো।
(ছন্দ/দময়ন্তী)

২. দূতের মতো হাওয়া
সিক্(করে স্মৃতির স্তনের বৃন্ত — দুধের ফোঁটায়।
(স্বপ্ন/যে আঁধার আলোর অধিক)

৩. হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ
একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখায়
শতাব্দীর পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়
(ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা/দময়ন্তী)

তিরিশের প্রধান কবি **জীবনানন্দের** কবিতায় প্রেম সম্পর্কে সমালোচক জানিয়েছেন যে-প্রেম তিনি পাননি, যে-প্রেম শেষ হ'য়ে গিয়েছে, যা আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি। ... জীবনানন্দ ... অনুভব করেছেন বিচ্ছেদ পূর্ণতা দেয় না, বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যায় দেহ-মন-আত্মা।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক কবিতার একটি প্রধান ল(ণ ক্লান্তি, নৈরাশ্যবোধ ও অনিকেত (root less) মনোভাব। জীবনানন্দের কবিতাতে এই বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে চৈতন্যে তৈরি হওয়া এই নতুন আত্মজর্জর বোধ — জীবনানন্দ যাকে বলেছেন 'বিপন্নবিস্ময়', যা প্রেমের প্রশান্তিকেও বিধ্বস্ত করে দেয়

জানি — তবু জানি
নারীর হৃদয় — প্রেম — শিশু — গৃহ — নয় সবখানি(
অর্থ নয়, কীর্তি নয়(স্বচ্ছলতা নয় —
আরো — এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত র(ের ভিতরে

খেলা করে(
আমাদের ক্লান্ত করে(
ক্লান্ত — ক্লান্ত করে (আটবছর আগের একদিন/মহাপৃথিবী)

সময় জর্জরিত আহত চৈতন্যের জীবনানন্দ নারীর ভিতরেই প্রশান্তি খুঁজতে চেয়েছিলেন। এই প্রশান্তি অন্বেষণের জন্য তিনি হাজার বছর ধরে পথ হেঁটেছেন। তবু পাননি। হয়তো তিনি একদিন পাবেন, কিন্তু 'সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ'। কিন্তু বর্তমানে রি(ক্লান্ত কবি নারীর মধ্যে সেই প্রশান্তিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য ছটফট করেছেন। নারীকে ভালোবেসে দেখেছেন, অবহেলা করে দেখেছেন, ঘৃণা করেও দেখেছেন। কিন্তু তবুও পাননি। অবশেষে কবি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এই না-পাওয়া আসলে 'ন(ত্রের দোষ'। কবি বলেছেন, এই 'ন(ত্রের দোষ/আমার প্রেমের পথে বারবার দিয়ে গেছে বাধা' (বোধ/ধূসর পাণ্ডুলিপি)। জীবনানন্দের কবিতায় ইন্দ্রিয়ঘনতা আর ইন্দ্রিয়ময়তা একাকার হয়ে গিয়েছে। ইমপ্রেসনিস্টদের মতো রঙে কলম ডুবিয়ে কবিতা এঁকেছেন। তাঁর 'হাওয়ার রাত' বা 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতায় তার দৃষ্টান্ত মিলবে। আধুনিক কবিদের মতো জীবনানন্দের প্রেম দেহাতীত নয়। নারীর নাম ও দেহকে কবিতায় বারবার এনেছেন, যদিও সেগুলিতে কোনো যৌনগন্ধ নেই। ইন্দ্রিয়ময়তাকে ইন্দ্রিয়ঘনতা দিয়ে শোধন করে নিয়েছেন। যেমন

১. স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো — দুধে আর্দ্র ...
(শঙ্খমালা/বনলতা সেন)

২. ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, — হিম স্তন, — হিম রোমকূপ।
(ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল/ঝরাপালক)

৩. চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফ'লেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
(অবসরের গান/ধূসর পাণ্ডুলিপি)

৪. তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতর
কবেকার সমুদ্রের নুন (সবিতা/বনলতা সেন)

তিরিশের আরেক কবি **সুধীন্দ্রনাথের** কবিতায় প্রেম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নেতির স্বীকার। প্রেমের স্থায়িত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই। এ-প্রসঙ্গে সমালোচক জানিয়েছেন "ভালেরির ধারণা ছিল মানুষ পরস্পরকে ভালোবাসতে পারে না, সুধীন্দ্রনাথের ধারণা অনুরূপ। ...রবীন্দ্রনাথ যেখানে লাভ করেছিলেন পূর্ণতার প্রসাদ — সুধীন্দ্রনাথ সেখানে নেতি ছাড়া কিছুই পেলেন না। ... মিলনের মুহূর্তে কোনো পূর্ণতাবোধ সুধীন্দ্রনাথের মনে জাগ্রত হয়নি, কারণ নায়ক মধ্যবয়সী ও বিজ্ঞ, নায়িকা মধুরি(া ও ছলনাময়ী। অতএব শাশ্বত প্রেমের

সন্ধান যে নিষ্ফল, মুগ্ধ মুহূর্তের অবশেষে যে নিষ্ঠুর নৈরাশ্য, প্রেম যে (পরিণামমাত্র এই 'মহাসত্য' তিনি উপলব্ধি করলেন।"[৭] বিজ্ঞ বা ইনটেলেকচুয়ালিটি প্রেমের আপাতমাধুরী ভাবকে রূঢ় বাস্তবে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছে প্রেমের প্রকৃত মাধুর্য কী? ভালোবাসতে পারা আর না-পারার মূলেই রয়েছে হৃদয় বিজ্ঞ হয়ে ওঠার কারণ। কবি তাই বললেন

ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি?
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে? (সংশয়/উত্তরফাল্গুনী)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নায়কেরা মধ্যবয়সী বা বিগত যৌবনের অধিকারী। অথচ তারা যৌবনরসতৃষ্ণার্ত। তাই এমত অবস্থায় স্মৃতিই তাদের সম্বল। 'অর্কেস্ট্রা'র নায়ককে তাই দেখি স্মৃতির মধ্য দিয়ে কোনো নীলনয়না বিদেশিনীর সাথে গভীর প্রেমে মগ্ন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার 'শাশ্বতী' তাই স্মৃতির মধ্যেই

স্মৃতি পিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না। (শাশ্বতী/অর্কেস্ট্রা)

'অর্কেস্ট্রা'-র কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ। সুধীন্দ্রনাথের 'জীবনপঞ্জি' থেকে জানতে পারি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম বিদেশযাত্রা ফেব্রুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯২৯-এ। সেখানে রাইনের তীরবর্তী কোনো শহরে কবি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন তাঁকে সেবা দিয়ে আরোগ্যলাভে সাহায্য করেছিলেন এক বিদেশিনী। কবি তাকে হৃদয় দিয়ে ফেলেছিলেন। এই বিদেশিনী অন্য আধুনিক কবিদের মতো শরীরীমূর্তি নিয়ে ধরা দিয়েছে

১. স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখি-সম (শাশ্বতী/অর্কেস্ট্রা)

২. পাকা দ্রাক্ষার অরাল লতায়
তোমারই তনুর মদিরা ভরা;
পরপার্শ্বের অপরাজিতা, সে
তোমারই দৃষ্টি চন্দ্রহারা (চপলা/অর্কেস্ট্রা)

৩. আতুর নয়ন তাই করে অন্বেষণ
কুটিল আমার মধ্যে তব বক্র কেশের মাতন,
অবাধ্য, ঊর্ধ্বমুখ বহ্নি-সম (উদ্‌ভ্রান্তি/অর্কেস্ট্রা)

তিরিশের আরেক কবি **বিষ্ণু দে'র** কবিতায় প্রেম অন্যমাত্রায় ধরা দিল। প্রেম, প্রকৃতি, বিপ্লব, সমাজ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। তাঁর কাব্যের নায়িকারা যেন বলিষ্ঠ রাশিয়ান নায়িকা। 'ঘোড়সওয়ার' বিষ্ণু দে'র একটি অন্যতম প্রিয় কবিতা।

কবিতাটিতে বহু স্তরীয় ব্যঞ্জনা আছে। অনেক সমালোচক এটিকে প্রেমের কবিতা বলেছেন, অনেকে আবার বলেছেন শ্রেণি সংগ্রামের কবিতা। কবিতাটি সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য

ব্যক্তির অধীর আবেগ ও সমষ্টির প্রবল শক্তি, প্রেম ও সমাজতন্ত্র কবিতাটির মধ্যে একাকার হ'য়ে গেছে। উৎসাহ ও শৃঙ্গারের উদ্দীপনা ও গতির এমন সমন্বয় বাংলা কাব্যসাহিত্যে দুর্লভ।[৮] কবিতাটির কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হল

কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো
কামনার টানে সংহত স্টেসিয়ার
হালকা হাওয়ায় হৃদয় আমার ধরো
হে দূর দেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার।
(ঘোড়সওয়ার/চোরাবালি)

শুধু 'ঘোড়সওয়ার'-ই নয়, বিষ্ণু দে'র বহু কবিতাই বহুস্তরীয় অর্থ বহন করে। বিষ্ণু দে এককভাবে কোনো প্রেম বিষয়ক কবিতা লেখেননি। কবি জানেন স্থূল-সম্ভোগ লালসায় যদি নিজেকে লিপ্ত করেন তাহলে দেশের ও দশের থেকে চ্যুত হবেন। তাই ব্যক্তিগত প্রেমের মধ্যে সময় ও সমাজের সমস্যাকে খুঁজলেন। তাঁর নায়িকা কেবল তার কাছে গৃহিণী অথবা প্রেয়সী নয়, তার নায়িকা পাশাপাশি চলা সহকর্মী, মিছিলের যাত্রীও বটে। কবি তাই বলেছেন

এখন তোমরা শুনি অঙ্গি, কেবল গৃহিণী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী সহকর্মী ...
(আমাদের মেয়েরা/তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ)

সমালোচক ঠিকই বলেছেন, "কর্মী নারীর চিত্র আমরা কবিতায় এই প্রথম পেলাম। নারী শুধু প্রেরণা নয়, শুভ চেতনা-স্বরূপও নয় — নারী বিদ্রোহিনীও বটে।"[৯] স্বাধীনতা উত্তরকালে লেখা 'স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাতেও দেখি রাস্তার মেয়েও অফিসে কাজ করে, অর্থাৎ একজন কর্মী। বলিষ্ঠ রাশিয়ান কর্মী নায়িকা করে তোলার এই প্রবণতা চারের দশকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাতেও মেলে।

তিরিশের আরেক প্রধান কবি **অমিয় চক্রবর্তীর** কবিতায় প্রেম ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। অমিয় চক্রবর্তীর কাছে প্রেমের পরিধি অনেক বড়ো। তাঁর কাছে প্রেম কেবল নর-নারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মনুষ্য থেকে মনুষ্যেতর, জীব থেকে নির্জীব — সকল সত্তার মধ্যেই তিনি প্রেমানুভবকে পেয়েছেন। তিনি সমকালের নির্মমতা, যান্ত্রিকতার কারণ খুঁজে দেখেছেন যে সেখানে বড়ো প্রেমের অভাব — যে প্রেম ত্যাগ ও কিছুটা পরাভবে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করে। কবি তাই বলেছেন

যেখানে যা কিছু সত্য, শুধুমাত্র নয় যা সংস্কার
তাকে মেনে নিয়ে প্রেম পূর্ণ করে আপন স্বরূপ
কিছু ত্যাগে, কিছু পরাভব মহিমায়। (সম্বন্ধ/দূরযানী)

বিশ্বযুদ্ধোত্তর আধুনিক কবিদের মতো অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় প্রেমও বিচ্ছেদ, বেদনা, হাহাকারের দ্বারা গ্রথিত। দুপুরে কবির একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ব্যক্ত হয়েছে একটি কবিতায়

ধক ক'রে লাগে বুকে —
— তুমি —
খুঁজি চারিদিকে।
আমি
রোদ্দুরে দরজা-খোলা ঘরে। (দুপুর/একমুঠো)

কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী দার্শনিক কবি। তাঁর কাছে বিচ্ছেদ-বেদনা-হাহাকারও পূর্ণতার মাত্রা বহন করে নিয়ে আসে। কিছু না হওয়াও তাঁর কাছে হওয়া। অসংখ্য অসংগতির মধ্যেও তিনি সঙ্গতি খুঁজে পান। নিঃসঙ্গতার বিনিময়ে যা পেলেন, সে পাওয়াটা কম পাওয়া নয়

তার বদলে পেলে —
সমস্ত ঐ স্তব্ধ পুকুর
নীল বাঁধানো স্বচ্ছ মুকুর
আলোয় ভরা জল —
ফুলে নোওয়ানো ছায়া ডালটা
বেগনি মেঘের ওড়া পালটা
তরল হৃদয়তল —
একলা বুকে সবই মেলে।। (বিনিময়/পারাপার)

'বিনিময়' কবিতার এই বিচ্ছেদ-বেদনা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, 'বিচ্ছেদের বেদনা প্রেমের অনুসঙ্গী, একথা সত্য হলেও বিচ্ছেদের বদলে যন্ত্রণার বিনিময়ে জীবনে যা পাওয়া যায়, তার পরিমাপ কে করবে! প্রেমের বিচ্ছেদের ক্ষতিপূরণ প্রেমের স্মৃতির বেদনার মধ্যেই ধরা আছে। এ-বেদনা শিল্পকর্মের বেদনা।''[১০] এই শিল্পকর্মের বেদনা'ই তিরিশের অন্য কবিদের মধ্যে অমিয় চক্রবর্তীকে ব্যতিক্রমী পরিচিতি দান করেছে।

এইভাবে দু'য়ের দশকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে বাংলা কবিতায় (প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর প্রভৃতি ভাবনায়) যে ব্যতিক্রমী হওয়া বইতে শুরু করেছিল, তা তিরিশে আরও গতিময়তা লাভ করল। বিশ ও তিরিশের কবিতায় প্রাক্-বিশ্বযুদ্ধ পর্বের প্রেমের মাধুর্য ও নিষ্ঠা অতিক্রমকারী প্রয়াসকে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বয়ে নিয়ে গেল চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের কবিতা। তিরিশে প্রেমেন্দ্র মিত্র যেখানে প্রেমের মাধুর্যের সাথে কর্মী-জীবনকে মেলাতে

পারেননি, সেখানে চল্লিশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রেমের মধ্যেই সাম্যবাদকে খুঁজে নিলেন। 'সুন্দর' পেল তাঁর হাতে নতুন ব্যাখ্যা। পঞ্চাশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রেমের ক্ষেত্রে যৌনতাকে শিল্পের তুলিতে এমনভাবে উপস্থাপন করলেন, যা অভিনব। ষাটে মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' — এই অশ্লীল কবিতা লেখার জন্য কারাবাস হলেও তার মধ্যে সমকালের ক্ষুধার্ত মানসিকতা প্রতিফলিত হল। শুধু পঞ্চাশ, ষাট নয়, সত্তর-আশি-নব্বই — এমনকি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের বাংলা কবিতায় প্রেম-ভাবনার যে বহুমুখী চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, তার উৎসমূলেও রয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বিশ ও তিরিশের কবিতার প্রেম ভাবনা।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১. সুমিতা চক্রবর্তী, 'বিশ শতকের প্রথম অর্ধে বাংলা কবিতা', ''পরিকথা'' (ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩০৫
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আধুনিক কাব্য', ''সাহিত্যের পথে'' (১ম সংস্করণ), পৃ. ১৩১
৩. আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ভূমিকা', ''আধুনিক বাংলা কবিতা''
৪. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ''আধুনিক কবিতার রূপরেখা'' (৫ম সংস্করণ মে ২০০৩), প্রকাশভবন, পৃ. ৭৪
৫. তদেব, পৃ. ৯৪
৬. দীপ্তি ত্রিপাঠী, ''আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়'' (ষষ্ঠ সংস্করণ জুলাই ২০০৩), দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১২৪
৭. তদেব, পৃ. ২০১-২০২
৮. তদেব, পৃ. ২৫৯
৯. ড. শিবানী ঘোষ, ''রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কাব্যতত্ত্ব'' (১ম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০০), তুলসী প্রকাশনী, পৃ. ১৪৮
১০. ড. বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, ''আধুনিক কবিতার রূপরেখা'' (৫ম সংস্করণ মে ২০০৩), প্রকাশভবন, পৃ. ৩৫৩

জয়রাজ কুমার দাশ, গবেষক ও আংশিক সময়ের অধ্যাপক, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ডহারবার

কালান্তরে কবি অরুণ মিত্র

সাত্ত্বিক মিত্র

তুমি প্রসন্ন হও

"তখন থেকেই শুরু হয়েছে লড়াই
কচি গলায় যখন দুধের ফোঁটা নেমেছে,
শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।"

('শূন্যতার বিরুদ্ধে' ঃ 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর')

সমস্ত কবিজীবন জুড়ে শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে অরুণ মিত্র বলতে চেয়েছেন "পৃথিবী আর মানুষ আর তাদের সংস্পর্শে আমার সত্তা, এই তো আমার কবিতার মূল।" (পরমা সংকলন ঃ শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪, 'কবিতা আমি এবং আমরা')। কিন্তু এই পরিপার্শ্বিক সংলগ্নতা কবিকে কোন যান্ত্রিক ভাবনা উচ্চারণের দিকে চালিত করে না, বরং এক ইতিবাচক অভিজ্ঞানে যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের দিশা দেখায়। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ফরাসী সাহিত্যের বিখ্যাত কমিউনিষ্ট কবি লুই আরাগঁ-এর কথা। গাঢ় থেকে গাঢ়তর সংকটেও আরাগঁ ছাপিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। আরাগঁ-র জীবনবোধ ও তাৎপর্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এক সমালোচক বলেছিলেন ঃ

–"Commitment for the sake of love commitment in order to ensure that love will one day be a happy love, such is the significance of Aragons whole life." ('Commitment in modern french literature'– M. Addereth, 1967)"

একই কথা অরুণ মিত্র সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তিনি মানুষকে যে গভীর অনুভূতিতে স্পর্শ করতে চান তা তো তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকেই উঠে আসা টান। যাঁর সঙ্গে মানুষের এই ভালোবাসার সম্পর্ক তাঁর সামনে যতই হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি আসুক না কেন—তাঁকে থমকে দিতে পারে কিন্তু থামিয়ে দিতে পারে না। কেননা কবি জানেন হতাশাই জীবনের শেষ নয়। কবির এই প্রত্যয়ী আস্থার সঙ্গে আর একজন দায়বদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ঝাঁ-পল-সার্ত্রে [Jean-Paul-Sartre]-এর জীবনবোধের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সার্ত্রে জীবন সম্পর্কে বলেছিলেন—"human life begins the other side of despair"—এই বোধ অরুণ মিত্র সঞ্চয় করেছিলেন জীবনে চলার পথে, আর আরাগঁর মতো তিনি ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামী হয়েছেন। তাই আঁরাগঁর "Fighting for the future is the antithesis of despair"-এর প্রতিধ্বনি শুনি যখন প্রত্যক্ষ জীবন-বাস্তবতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অরুণ মিত্র বলেন—

"বাসনগুলো এক সময়ে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে। তার ঢেউ দেয়াল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। তখন হয়তো এই ঘরের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। তবু আশ্চর্যকে জেনো। জেনো এইখানেই আমার হাহাকারের বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।" ('অমর কথা' : 'উৎসবের দিকে')

এ যেন মানুষের কোলাহলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার প্রস্তুতিপর্ব। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা না থাকলে প্রস্তুতির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর সমকালের পটভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। এ যেন তাঁর সহজাত, পূর্ব লালিত। কেননা, মানুষের নিকট সান্নিধ্যে আমার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে যে ইতিবাচক বিশ্বাসে স্থিত করে তা তাঁর নিজের কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

"আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি
আমি কোলাহলের গরজে আমাকে বেঁধে নিয়েছি
এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি; মানুষ
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও"।('আর এক আরম্ভের জন্য' : 'উৎসের দিকে')

সর্ব সাধারণের অস্তিত্ববোধে যিনি এত সচেতন, এত আগ্রহী তাঁর পক্ষেই 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে নেমে' আসা স্বাভাবিক। বলা যায় 'উৎসের দিকে' তাঁর যে আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা সঞ্চারিত, 'ঘনিষ্ঠ তাপ'—এ তা যেন উপলব্ধির বলয়ে উপস্থিত এবং 'মঞ্চের বাইরে মাটি'তে বাঁধা-বাঁধন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে একেবারে মাটির পৃথিবীতে নেমে পড়া। তাই, এই বইয়ের নানা কবিতায় অরুণ মিত্রের কবিসত্তা চলমান হয়ে উঠেছে এক স্থির প্রত্যয়ে। কারণ কবির বিশ্বাস মঞ্চের বাইরে মাটিতেই রয়েছে হৃদয়ের শান্তি। তাই মানুষ, মাটি-জল-বাতাস- পাথরকে নিয়েই তিনি খুঁজতে চেয়েছেন অস্তিত্বের সংকট থেকে মুক্তির উপায় :

"আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা-উপশিরা বিন্যস্ত করি। তাহলে আমরা উৎসারণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।"

(প্রাজ্ঞের মতো নয়' : 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

এ এক কঠিন বিশ্বাস। এ বিশ্বাস আছে বলেই 'অবোধ্য ফাটলে' ক্লান্ত বিপর্যস্ত শিরা-উপশিরাকে বিন্যস্ত করতে চান কবি আর দৃঢ় প্রত্যয়ে বলে ওঠেন—'সব কথাকে শস্য ভরা পুষ্পিত সফলতায় রূপান্তরিত হতে দেখব।' কেননা তিনি অনুভব করেছেন 'মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর রয়েছে'। এখানে পুষ্প ও শস্য যেন তাই আকাঙ্ক্ষিত সফলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এইভাবে বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্ব-নির্ভর আত্মবিশ্বাস ও উত্তরণের কথা সমকালীন কবিদের মধ্যে বিরল হলেও অরুণ মিত্র সত্তর দশকের রক্তাক্ত দিনগুলিতে অনেক বেশি সংশয়ান্বিত, বিপন্ন ও অসহায় হয়ে উঠেছিলেন এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাই এই দশকের দু'টি কাব্যগ্রন্থ—'শুধু রাতের শব্দ নয়' এবং 'প্রথম পলি শেষ পাথর'-এর মধ্যে এই নৈরাশ্য, অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু গাঢ়তার সংকটেও নিজেকে জাগিয়ে রাখার যে প্রবণতা তাঁর মধ্যে রয়েছে সেই বিশ্বাস থেকেই তিনি পৌঁছে যান আর এক দৃঢ়তর প্রত্যয়ে—

"শেষ সমুদ্র সূর্যডোবার।
আদিগন্ত ঢেউ কি সমস্ত দুঃখকে নাচায়?
সন্তানসন্ততির মুখ
তুমুল জলের উপর ঝুঁকে থাকে,
আমি কি তাদের যন্ত্রণার ছাঁচে দেখি?
... ...
সেখানে কোনো আশা কখনো মরে না।
শুধু কি রাতের শব্দ?
আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন
আমার শেষ সমুদ্রে।" ('শুধু রাতের শব্দ নয়' : ঐ)

তাই রাতের শব্দ-তরঙ্গে উদ্বেলিত কবি যতই বিষণ্ণতার মুখোমুখি হোন না কেন, শেষ পর্যন্ত 'স্বস্তির কথা'ই শোনাতে চান তিনি—

"আমি হাঁটছি
... ...
প্রলয় এড়িয়ে এই একটা রাত্তির
আমি কুহকী আলোয় হাঁটছি।"
('এই একটা রাত্তির' : 'শুধু রাতের শব্দ নয়')

কবি যেন প্রলয় অতিক্রম করে আকাঙ্ক্ষিত পথে এসেছেন। এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সময়ের যন্ত্রণা, সংশয়, ব্যর্থতা, হতাশা অনেক বেশি প্রকট হয়েছে একথা ঠিক, কিন্তু অরুণ মিত্র শুধু রাতের শব্দ উচ্চারণ করেননি; দিনের আলোর বৈভবকে দেখিয়েছেন। কেননা, যাঁরা সারাজীবনের চলার পথে অনমনীয় আশার সুরে বাঁধার চরম প্রতিশ্রুতি ছিল, কোন ব্যবস্থা-সংকট নিশ্চয়ই তাঁর কাছে অনতিক্রমনীয় বাধা হয়ে উঠতে পারে না। প্রকৃত কমিউনিষ্ট কবির জীবন তো এমনিভাবেই চড়াই-উতরাই-এর মাঝখান দিয়ে চলে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে।

কবিজীবনের শেষপর্বে এসেও অরুণ মিত্র যেমন সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি সহ সমগ্র জীবনকে ধরতে চান তেমনি পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পন করতেও তিনি চান না। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার নানা সংকট, দ্বন্দ্ব সংঘাত অতিক্রম করে মানুষের বোধের সঙ্গে, মানুষের পরিমণ্ডলের সঙ্গে মানুষের অভিঘাতের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সত্তা-স্বরূপেই অরুণ মিত্র খুঁজে পেয়েছেন তাঁর ইতিবাচক মানসবৃত্তকে। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও অনুভব কোন অতীত স্মৃতি হয়ে তাঁর কাছে ধরা দেয় না, বর্তমানের ঘনিষ্ঠ সংলগ্নে জড়িয়ে যায়—

"বয়সের অনেকগুলো বছর বরাবর আমি হাঁটতে থাকি আরম্ভের দিকে। কত চেনা মুহূর্ত পার হয়ে চলা। হাঁটতে হাঁটতে আমি গিয়ে পড়ি গুঞ্জনের মধ্যে। যেন মৌমাছির, আরো হাঁটি। না, মৌমাছির নয়, আমি কথা শুনতে পাই, এত নিকট যেন বুকের ভেতরে। আমি ঘনিষ্ঠতার সাত তারে বেজে উঠি।"

("আরম্ভের দিকে' : 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে')

—আর তাই যথার্থ শিল্পীর লক্ষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রোম্যাঁ রলাঁ যে কথা বলেছিলেন—

'To live, to live too much! A man who does not feel within himself this intoxication of strength, this jubilation in living - even in the depths of misery-is not an artist. This is the touch stone."–John Christopher

—সেই কষ্টি পাথরেই অরুণ মিত্রের 'প্রান্তরেখা' থেকে খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' ও তৎপরবর্তী সৃষ্টিকে আমরা ইতিবাচক মানসিকতাসম্পন্ন এক কবির জীবনভাষ্য হিসেবে যাচাই করে নিতে পারি।

ফরাসী প্রসঙ্গ

যে কবি নিজের বাক্যাদর্শ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন—"পৃথিবী আর মানুষ আর তাদের সংস্পর্শে আমার সত্তা। এই তো আমার কবিতার মূল" (অরুণ মিত্র : কবিতা, আমি ও আমরা', 'পরমা', শরৎ-হেমন্ত ১৩৮৪ [১৯৭৭])—সেই পারিপার্শ্ব সম্পর্কে সদা-সচেতন কবি-প্রাণ নিজের মতো করে কথা বলার কবিভাষা যেমন খুঁজেছেন স্বদেশে তেমনি ১৯৪৭-৪৮ এ কমিউনিষ্ট শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে গরোদির মতামতকে সমর্থন করে আরাগঁ-গরোদি বিতর্কে তাঁর নিজস্ব কবিস্বভাবের সমর্থনেই শুরু করেছেন ফরাসী ভাষাচর্চা। ফরাসী কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে গভীর আগ্রহে দেশে থাকতেই তিনি যখন আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের সংস্পর্শে এসেছিলেন তখন নিছক ভাষাবিদ্ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে চাননি বরং কবি-প্রাণতার তাগিদেই খুঁজতে চেয়েছেন তাঁর দৃঢ়মূল অস্তিত্বকে,

পেয়েওছেন শেষ পর্যন্ত। কার্যকারণসূত্রে ১৯৪৮য়েই ফরাসী সরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি ফ্রান্সে যান উচ্চতর গবেষণার জন্য। প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৪৮-'৫১তে 'ল্য-গ্রুপ দ্যা লা রভ্যু ব্লাঁশ' অর্থাৎ 'শ্বেত গোষ্ঠী' নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট উপাধি পান। শিল্পী তুলুজ, লোত্রেক, সংগীতকার দুর্বাস, লেয়ঁ ব্লুম, সাহিত্যিক আঁদ্রে ঝিদ্ (বা কিছুটা মার্সেল প্রুস্ত) প্রমুখ যে লেখক শিল্পী উনিশ শতকের শেষে 'শ্বেত পত্রিকা গোষ্ঠী'তে যুক্ত থেকে ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পে প্রতীকবাদের চূড়ান্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চেয়েছিলেন তাঁদের ভূমিকা সাফল্য, ব্যর্থতা নিয়েই অরুণ মিত্রের গবেষণা। ফ্রান্সে থাকাকালীন কোন কবি-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না ঘটলেও সাধারণ ফরাসী জনগণের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল গভীরভাবেই। বস্তুত, যে চেতনা তাঁকে 'প্রান্তরেখা' (১৯৪৩) পরবর্তী পর্বে বহির্মুখী সংশয়াচ্ছন্ন আপাত উত্তরণের অনিশ্চয়তা থেকে আত্মমগ্ন চৈতন্যে স্থির প্রজ্ঞায় স্থিত করেছে ফরাসী সাহিত্যপাঠ ও ফ্রান্স প্রবাসের অভিজ্ঞতাই তার মূলে। এই পর্যায়ে মাটি ও মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। স্বদেশে ফিরে এসে ১৯৫২-তে আবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী বিভাগীয় প্রধান ডঃ বনোয়ারের আমন্ত্রণে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন এবং সেখানেও ১৯৭২ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছর ফরাসী ভাষা-সাহিত্যর যে রূপ-রস-স্পর্শ তিনি আহরণ করেছিলেন তাও তাঁর বাংলা কাব্যভাবনার সম্পদ। 'উৎসের দিকে' (১৯৫৫) থেকেই তাই অরুণ মিত্রের কাব্যে একদিকে যেমন ফরাসী প্রভাব এসেছে ভাবে-ব্যঞ্জনায়, ভাষা প্রয়োগে, কবিতার বাক্‌রীতি নির্মাণে, তেমনি অন্যদিকে তিনি অনুবাদ করেছেন সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরের ফরাসী কবিতা। তাঁর অনুবাদের তালিকায় আছে শার্ল বোদলেয়ার, পল ভের্লেন, আরত্যুর রাঁবো, পল ক্লোদেল, ঝুল স্যুপেরভিয়েল, সাঁ্য-ঝন-পের্স, পল এলয়ারস র‍্যনে শার—প্রমুখ ফরাসী কবিদের সুনির্বাচিত কবিতা আর তার মৌলিক কবিতায় অনিবার্যভাবেই এসেছে তাঁর প্রভাব।

অরুণ মিত্র তাঁর 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে' বইয়ের 'কাব্যের মুক্তি : ফরাসী প্রয়াস' প্রবন্ধে বোদলেয়ারকে 'অন্তর্মুখিনতার কবি' বলে অভিহিত করলেও প্রধানত 'স্ব-বিরোধিতায় ভরা আধুনিক মানুষের জটিল মন'কেই 'তাঁর একমাত্র ধ্যান' বলে উল্লেখ করেছেন। (পৃ ৯) রোমান্টিকদের চেয়ে বোদলেয়ার অনেক স্পষ্টভাবে বাস্তবকে বুঝেছিলেন কিন্তু নিজের মনোজগতেই সেই অবক্ষয়িত মানবসভ্যতাকে রূপ দিয়েছেন। অরুণ মিত্রের কবিতাতেও যেন অনেকটা সেভাবেই সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংশয় কবির ব্যক্তিক মূল্যবোধকে অতিক্রম করে যেতে পারেনি। সে কারণেই ঘটেছে সংশয়ের আত্তীকরণ—

"প্রতিভার খেলা মহত্ত্বের খেলা
কত দেখালাম :
শুকনো মাটিতে ফুঁ দিয়ে
আমি আতসবাজি ফোটালাম,
গহ্বরের উপর এক পা বাড়িয়ে দাঁড়ালাম
আত্মোৎসর্গের যে চেহারাটা সবাই যেন
তাকে শূন্যের পটে এঁকে দিলাম।"
('মুখোশ খুলে রেখেছি' 'মঞ্চের')

আর বোদলেয়ারের **'Les Fleurs due Mal'** এর মুখবন্ধরূপে সন্নিবিষ্ট অনুদিত কবিতায় জানালেন—

"মূর্খতা, বিভ্রম, পাপ, কৃপণতা ক্ষুদ্র অসরল
আমাদের মন জোড়ে, শরীর জর্জর করে খালি
আমাদের অনুতাপ আমরা অতি সযতনে পালি
যেমন ভিখিরি পালে তার ওই উকুনের দল।" ('পাঠকের প্রতি')

সুতরাং এই অনুতাপ স্বাভাবিক হলেও অরুণ মিত্রের কাছে তা আত্মপ্রবঞ্চনার বেশি কিছু নয়। সম্ভবত সেকারণেই বোদলেয়ারের থেকে পল এল্যুয়ার তাঁর অনেক নিকটবর্তী। একসময় স্যুররিয়া-জমে নেতা এল্যুয়ার যেমন নির্জন নারী প্রেম থেকে মানুষের সংগ্রামী আবেগের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন, আপাতভাবে সঙ্গতিহীন মনে হলেও অরুণ মিত্র অনেকটা সেভাবেই 'উৎসের দিকে' বা 'ঘনিষ্ঠ তাপে'র ব্যক্তিময়তাকে 'প্রথম পলি শেষ পাথর' বা 'খুঁজতে খুঁজতে এত দূর'-এ এসে অনেকটাই অতিক্রম করে যান। তাই 'সে এসেছে' কবিতার সংশয়—"সে কি তবে মাটি না ছুঁয়ে এসেছে?/ সে কি তবে মানুষের দিকে তাকিয়ে দেখেনি?' কাটিয়ে উঠে অরুণ মিত্র বলেন—

"আমার চারদিকে আওয়াজ শুরু হয়েছে
আমি টের পাচ্ছি হাড় ভাঙছে কলজে ছিঁড়ছে
আর মেশিনের জোড়া দাঁত খুলছে বন্ধ হচ্ছে
ঠিক আমার সামনে।
এ হল কামিলার সময়
আমাকে উপহার দেওয়া আমার নেওয়া"
("কামিলার সময়ের ভিতরে" : 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর')

এই কামিলা'ই কি অরুণ মিত্রের সেই ব্যক্তিচেতনা যা তাঁকে সমষ্টিচেতনায়

ধাবিত করে? কেননা, এল্যুয়ারের পরিচয় দিতে গিয়ে 'পাঁচশো বছরের ফরাসী কবিতা' বইতে অরুণ মিত্র বলেছেন, "... ব্যক্তিগত প্রেম ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয় তা কোনো কিছুকে অস্বীকার ক'রে নয়, তাকে তিনি ধরতে চান তার মুক্তির নির্যাসে সমগ্রভাবে, খণ্ডিত করে নয়, বরং তার মতো ভালোবাসার কবি যদি মানুষের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতায় তার পাশে না দাঁড়াতেন তাহলে সেটাই আশ্চর্যের হত।" কামিলাও কি সেই সমগ্রতারই নামান্তর? হতে পারে। এবং সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। না হলে অরুণ মিত্র হয়তো এল্যুয়ারের এই আত্মশ্লাঘাপূর্ণ কাব্যপংক্তির অনুবাদ করতে প্রাণিত হতেন না যে—

> " অল্প বয়সেই আমি বিশ্বস্ততার দিকে বাহু প্রসারিত করেছি।...
> আমার পতন আর সম্ভব ছিল না।"
> –La Dame Carreau (১৯২৬)

কবি নানা প্রতিকূল পরিবেশে থেকেও নিজের অদৃষ্টকে মিলিয়েছেন সব মানুষের সঙ্গে, তাঁর ব্যক্তিচেতনা বিস্তৃত হয়ে নতুন প্রত্যাশায় উৎসারিত হয়েছে নানাভাবে, নানা কবিতায়। একইভাবে উচ্চারিত হতে দেখি পল এল্যুয়ারের ব্যক্তিসত্তায়, যখন তিনি বলেন—"সমস্ত শাখা-প্রশাখা জুড়ে/আমার পাতারা আবার জন্মায়/আমার পথ শোভিত হল/সূর্যস্নাত জঙ্গলে।" ('আমার প্রহর'—পল এল্যুয়ার, অরুণ মিত্র (অণু)

আবার সুপেরভিয়েল সম্পর্কে অরুণ মিত্রের অভিমত, "পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান, তার সঙ্গে এক অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা তাঁর—মানুষ, পশু, গাছপালা, পাথর সব কিছুর সঙ্গে। এর মূলে জীবনের প্রতি এক নিবিড় প্রেম।—" ('আধুনিক ফরাসী কবিদের কথা' : 'ফরাসী সাহিত্য প্রসঙ্গে') বলা বাহুল্য, অরুণ মিত্রের কবিতাতেও সঞ্চারিত হয়েছে এই অভিজ্ঞান—

> "প্রথম সমুদ্র আমার ভোরবেলার।
> অন্ধকার তাঁবুটা ভেঙে দিয়ে
> আমি তাকিয়েছিলাম যেখানে সূর্য ওঠে,
> একমুঠো ঝিনুকে শুধু বদ্ধ নয়
> মাস্তুলের হেলানো ছায়া,
> ভিজে বালির উপর পায়ের দাগ অস্থির,
> জলের উচ্ছ্বাসে কোটি গলার ডাক
> আমাকে তোলপাড় করেছিল,
> আমি পৃথিবীর আলোয় ঘুরে
> অদৃশ্য তট আর আমার দোসরদের কথা ভেবেছিলাম।"
> ('শুধু রাতের শব্দ নয়' : ঐ)

র‍্যানে শার-এর কবিতাও জীবনের প্রতি এরকম ভালোবাসায় ধ্বনিত। এই ভালোবাসার মূলে আছে জীবনের যন্ত্রণা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা। ছায়া আলো শূন্যতা উজ্জ্বলতার এরকম জটিল রেখাতেই মূর্ত তাঁর এই গভীর ভালোবাসার অনুভূতি।

আর কবিতার আঙ্গিক রচনায় অরুণ মিত্র নিয়েছেন পল ক্লোদেলের আদর্শ, এমনকি জিদের **Les Nouritures Terrestres**- এর গদ্যের আদর্শ স্যাঁ-জন পের্স ও এল্যুয়ারের গদ্যে লেখা কবিতার আদল। আবার পের্স যেমন তাঁর গদ্যে লেখা কবিতার মধ্যে ছন্দের সঞ্চার আনেন এবং সাধারণ গদ্যে বিন্যাস ভেঙে দেন, তেমনটি আমরা অরুণ মিত্রের কবিতাতেও পেয়ে যাই। আঁরি মিশো-র কাব্যিকতাহীন গদ্যেও অরুণ মিত্র স্বচ্ছন্দ। র‍্যাঁবোর কবিতার গদ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই গদ্য তীব্র আবেগময়, কখনো রুদ্ধশ্বাস চিৎকারের মতো, আবার কখনো সমুদ্রের কল্লোলের মতো। সেই আবেগ, নিরুদ্ধ চিৎকারের আর্ততা বা সমুদ্রনিঃস্বন অরুণ মিত্রের কবিতায় ততটা না থাকলেও ঝাক্ প্রভের মতো কথ্যভাষার অধিকার তাঁর কবিতাকে প্রবহমানতা এনে দিয়েছে। সমুদ্দুর, মাটির পিদিম, পরনের ন্যাতা, ছাই ভাঙা উনুন, ছুমন্তর, আথান্তর, জানকবুলের মতো শব্দ তাঁর কবিতায় অনায়াসে ব্যবহৃত হয়। র‍্যানে শার কবিতার মতো শব্দগত বিস্ফোরণ না থাকলেও তাঁর কবিতার অসাধারণ কিছু চিত্রকল্পে অরুণ মিত্রের কবিতাও উজ্জ্বল। সুতরাং স্বতন্ত্র কবিস্বভাবে অবিচলিত থেকে অরুণ মিত্র তাঁর জীবনবোধের প্রকাশে ফরাসী কবিদের দ্বারা ভাবে-ভাষায় যে নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সময়ের অন্তঃস্বর

সোরেন কিয়ের্কেগার্দ তাঁর 'EITHER/OR' এর বয়ানে জানিয়েছিলেন যে নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতীতি স্বভাবে দ্বান্দ্বিক ও ইতিহাস-নিষ্পন্ন। এই প্রতীতির বিকাশে পরিসরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সময়। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে, "The perfection of art depends on art's being able continually to free itself more and more from space and to define itself in temporal terms"। কিন্তু নিরবিচ্ছিন্নভাবে পরিসর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সময়ের পরিভাষায় সংজ্ঞায়িত করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটুখানি প্রতিপ্রশ্ন কি উঠে আসে না? কিন্তু কবি হিসেবে সেই আপাত অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন অরুণ মিত্র। যদিও যে মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে কবিতা, সেই মুহূর্তের নির্যাস তার ভাষা-অন্তর্বস্তু-প্রাকরণিক কৃৎকৌশলের আবশ্যিক দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারে না তবু যে কবি বলেন " পৃথিবী আর মানুষ আর তাদের সংস্পর্শে আমার সত্তা, এই তো আমার কবিতার মূল।" (পরমা সংকলন : শরৎ হেমন্ত ১৩৮৪, 'কবিতা আমি এবং আমরা') তাঁর কাছে সেই দায় অনেকটাই নিয়ম

রক্ষায় পর্যবসিত হয়। একান্ত ব্যক্তিগত, একক মনের হতাশা, বিষাদ, ক্লান্তি বা মুগ্ধতা, মগ্নতা, আত্মনিবেদন, এই মানস-প্রচ্ছায়া সমূহ অরুণ মিত্রের কবিতায় খুব সুলভ নয়। তার কারণ তিনি জনজীবনের কবি, একক জীবনের নন। তাই তিনি যেন কিছুটা আপোসের সুরেই বলেন—

"কবিতায় কথা বলি, তা না তক্ষুণি হয়ে যায়
অলঙ্কার। তবে এই অলঙ্কারই পরো।"
('অলঙ্কার' : 'খুজতে খুঁজতে এতদূর')

এইভাবেই কখনো গদ্যে, কখনো বা ছন্দের খেলায় সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায়, 'বোধিকে স্পর্শ করে যে বোধ' সেই রকম গভীরতায়, তাদের জীবন থেকে তুলে আনা 'প্রাজ্ঞের মতো, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মতো ক'রেই' অরুণ মিত্র পাণ্ডিত্যহীন অথচ জ্ঞানদৃপ্ত ভাষায়, উপমা-রূপক চয়নে, বাস্তব জীবনেরই সৃজনী চিত্রকল্পে সাজিয়েছেন তাঁর কবিতা। এই কবিতা রচনা করতে গিয়ে তিনি ফর্মের জন্য কোন রকম চিন্তা করেননি, বরং সোচ্চারেই ঘোষণা করেছেন—

"আমি মনে করি না লিরিকের কোন বাঁধা ধরা ফর্ম আছে।
আমার যেভাবে লিখতে ইচ্ছে হবে আমি সেইভাবেই লিখব।"

(কবি অরুণ মিত্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ, শুভব্রত চক্রবর্তী ও রামকিশোর ভট্টাচার্য, শিল্পী, অরুণ মিত্র সং, ২০০১, পৃঃ -১০১)

তবে শুরুর দিনগুলোতে একটু উঁচুতে তোলা ছিল তাঁর গলা। 'ছত্রভঙ্গ ছন্নছাড়া দল'-এর মানুষদের কথা বলতে গিয়ে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'য় তিনি কোনো পথ খুঁজে পাননি, যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। ফ্যাসিবাদ যখন গোটা দুনিয়াকে গ্রাস করতে চাইল তখন কল্লোলীয় রোমান্টিকতার বদলে অন্য এক রোমান্টিকতায় ভর দিতে চাইলেন তিনি। কেনা ভণিতা ছাড়াই পাঠকের সামনে পৌঁছে দিতে চাইলেন তাঁর বক্তব্য, ব্যঞ্জনায় নয়, বাচ্যার্থে। যেমন—

"প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?
লাল অক্ষর আগুনের হলকায়
ঝল্সাবে কাল জানো!" ('লাল ইস্তাহার')
অথবা,
"সাথী, কাঁধে কাঁধ মেলাও—।
...সারা দুনিয়ায় ভাই হো
এক সাথে দাঁড়াই
দুসমন রুশিয়ার

দুশমন দুনিয়ার
হাতিয়ার দাও ভাই হো।
হাতিয়ার" ('কসাকের ডাক : ১৯৪২')

এই জাতীয় কবিতাগুলিকে তিনি একত্রে নামকরণ করেছিলেন 'ভাষণ' কিন্তু কবি নিজের ভিতর থেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন আত্মপ্রকাশের সংহততম ফর্মটি। শূন্যতার বিরুদ্ধে ভালোবাসার কথা বলার জন্য। ফরাসি সাহিত্যের ঝ্যুল্ সুপেরভিয়েল, পল এল্যুয়ার, র‍্যানে শার মতো সমধর্মী জীবনপ্রেমিক কবিদের কাব্যপাঠে তিনি অচিরেই সেই পথ পেলেন। বাইরের 'আমি' এবং ভেতরের 'তুমি'র আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের সূত্র ধরে যেভাবে গণমানুষের কাছে পৌঁছে একটা স্থায়ী বিশ্বাসের পটভূমি গড়ে নিলেন তাতে শুধু কবিতার বাচন নয় পাল্টে গেল বচনও; 'উৎসের দিকে' কাব্যের 'আর এক আরম্ভের জন্য' কবিতায় লিখলেন—

"আমি জনতার মধ্যে শিশুর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি
আমি কোলাহলের খরচে আমাকে বেঁধে নিয়েছি
এই তো নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো উচ্চারণ করেছি : মানুষ
আমি তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে পেরেছি
তুমি প্রসন্ন হও।"

কিন্তু 'স্ব-বিরোধিতায় ভরা আধুনিক মানুষের জটিল মন' কবির ভেতরের এই 'তুমি'কে সত্যিই কি কোন প্রসন্নতা এনে দিল? রোমান্টিকদের চেয়ে যে কবি অনেক স্পষ্টভাবে বাস্তবকে বুঝেছিলেন এবং নিজের মনোজগতেই সেই অবক্ষয়িত মানব সত্যাকে রূপ দিয়েছিলেন তিনি কোনভাবেই সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংশয়জাত ব্যক্তিক মূল্যবোধকে অতিক্রম করে যেতে পারেন না। কিন্তু অরুণ মিত্র আশ্চর্যজনকভাবে সেখানেও অবক্ষয়িত সমাজে আত্তীকরণ করলেন—

"প্রতিভার খেলা মহত্ত্বের খেলা
কত দেখলাম;
শুকনো মাটিতে ফুঁ দিয়ে
আমি আতসবাজি ফোটালাম
গম্বুজের উপর এক পা বাড়িয়ে দাঁড়ালাম
আত্মোৎসর্গের যে চেহারাটা সবাই চেন
তাকে শূন্যের পটে এঁকে দিলাম।"
('মুখোশ খুলে রেখেছি' : 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে')

এই সংশয়িত ভাবনাকে তিনি সাজিয়ে নেন একটি প্রতিমায়—কামিলা। কামিলা

তাঁকে দেখিয়েছিলেন সবুজ পাতা, তাঁকে দেয় হাড়-ভেঙে-দেওয়া কলজে-ছিঁড়ে দেওয়া সময়। এই বিপরীতের সহাবস্থানে কামিলা হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের এত কাছের যে তার জন্যই কবি 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' চলে আসেন আর বলেন—

"আমাকে এখন অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে,
কিন্তু কোথায়, কবে পর্যন্ত?"
("কামিলার সময়ের ভিতরে' : 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর')

আর অন্তরের বিশ্বাস বা আদর্শের সমীকরণ যখন টলমল করে তখন কবির একমাত্র ভরসা বুলা—

"কে ছুঁয়েছে কে ছুঁয়েছে পাথরগুলোকে?
বুলা ছুঁয়েছে;
বুলার মুঠোর ফুসমন্তর বুলিয়ে দিয়েছে।
পাথরগুলো হয়ে গেল পালক
ঘুরঘুটি, অন্ধকারটা আলোক।"
('ভানুমতী' : 'টুনি কথার ঘেরাও থেকে বলছি')

কিন্তু কে কবির ভালোবাসাময় এই জীবনবোধের ভার নেবে? গদ্য নিতে পারে সে দায়, 'কিন্তু আরো যে বলার থাকে।' সেই ব্যাপ্ত জীবনবোধের কথাটি কে বলবে? তবে কি গদ্য?

"তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক-এক সময়, কী যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্‌কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রক্ষালিত হতে থাকে।...তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।"

('পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য' : 'প্রথম পলি শেষ পাথর')

প্রচলিত মাত্রা-মিলে সাজানো গদ্যের ফ্রেম ভেঙে দেয় এই গদ্য, প্রকাণ্ড দরজা খুলে দেয়, সমস্ত ভুবনের ব্যাপ্তি এই গদ্যকবিতায় সমর্পিত হয়। 'লিপিকা' বা সমর সেনের গদ্যছন্দ থেকে এ একেবারে আলাদা। গদ্য ব্যবহৃত হচ্ছে গদ্যের মতোই, তাকে কবিতার সাজ পরানোর কোন চেষ্টা নেই। এই গদ্যভাষা উঠে আসছে আটপৌরে জীবনের দৈনন্দিন কথা বলার চাল থেকে। সেই দৈনন্দিন আলাপে অগোচরেই ছুঁয়ে থাকে কবিতা। এই অযান্ত্রিক, অকৃত্রিম সারল্যই অরুণ মিত্রের কবিতায় স্বতন্ত্র আঙ্গিকের প্রধানতম অভিজ্ঞান। আর এইভাবেই তিনি ছুঁয়ে থাকেন কিয়ের্কেগার্দ কথিত সেই 'temporal terms'। এ কথার সমর্থন পাই কবি শঙ্খ ঘোষের 'সময়ের জলছবি'

বইয়ের 'ঘুমের দরজা ঠেলে' প্রবন্ধে অরুণ মিত্রের এই 'অযান্ত্রিক সরলতা'র প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—

"অরুণ মিত্র পৌঁছতে চান সেখানে, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বিশেষ কোনো ঘটনাকে প্রত্যক্ষ না রেখেও তার তপ্ত শ্বাসটুকু অনুভব করা যায়।...'তাপ ছেঁকে ছেঁকে আলোর ছোপ', আপাদমস্তক মেখে তিনি দাঁড়ান অন্ধকারের সামনে, তিনি জানেন যে অফুরন্ত জীবনের বাঁকে-বাঁকে নতুন উদ্যম নিয়ে বারেবারেই চলতে হবে তাঁকে, তাঁর সময়ে ইতিহাসকে...."

কিয়ের্কেগার্দের কাছে : "Still, the fact that justice is done, time detracts in no way from the aesthetic/ on the contrary, the more justice in done to it, the richer, and fuller the aesthetic ideal becomes." (তদেব)

অরুণ মিত্রের আঙ্গিক সম্পর্কে এই কথাই চূড়ান্ত। 'তাপ ছেঁকে ছেঁকে আলোর ছোপ' যেমন এই বহিরাঙ্গিক প্রসাধনহীন ঋদ্ধতর ও পূর্ণতর নান্দনিক ভাবাদর্শও তেমনি। আর সেই কারণেই অরুণ মিত্র কোন কালের নয়, কোন দশকের নয়। কালান্তরের কবি তিনি।

সাত্বিক মিত্র, অধ্যাপক, বিক্রমজিৎ গোস্বামী মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া

চিরপদাতিক কবিসুভাষ

রিজওয়ানা নাসিরা

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য কবিতার জগতে এক জটিল ও কনিষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্বের অধিকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩)। যুগ চেতনার প্রতিটি অনুভবের স্পন্দন তাঁর কবিতার অণুতে রেণুতে প্রতিধ্বনিত। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের শেষ দিকে, চল্লিশের শুরুতে যখন রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির প্রশংসাধন্য রাশিয়াজয়ী কমিউনিজম এদেশে নবীন আগন্তুক, তখন শিক্ষিত উদারপ্রাণ যুবক সুভাষ মুখোপাধ্যায় মানবপ্রেমের সঞ্জীবনমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে কমিউনিজমে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সুকান্ত, দীনেশ দাস, অরুণ মিত্র, সুভাষ একই পথের পথিক হলেও জনমনের অনেক কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছিলেন কবি সুকান্ত আর সুভাষ।

১৯১৯ খ্রীঃ নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম। তিরিশের-চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলনের উত্তাল পরিবেশ, কমিউনিষ্ট আন্দোলন, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ১৯৭৭ এ পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিষ্ট রাজের প্রতিষ্ঠা, অথচ সুভাষের স্বপ্নস্বর্গ রচিত না হওয়া প্রভৃতি তাঁর কাব্য কবিতার পটভূমি। তাঁর অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিখা তাঁর কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের বৃত্ত থেকে অন্য এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। তাঁর বোধগত আন্তরিকতা ও প্রকাশগত কৌশল তাঁকে বাংলা কবিতার জগতে চিরস্থায়ী আসন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তিনি এক বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী হলেও গভীর আন্তরিকতার ঐশ্বর্যেই তাঁর রাজনৈতিক কবিতাগুলি শ্লোগান সর্বস্বতায় পর্যবসিত না হয়ে কবিতার সার্থক ও রসোত্তীর্ণ মূর্তিতে পাঠকের কাছে ধরা পড়েছে। তিনিই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রথম কবি যিনি পুরোপুরি রাজনৈতিক কবিতা নিয়ে বাংলা কবিতার আসরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর কবিসত্তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় প্রসঙ্গে কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু বলেছেন ঃ—

"তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী, তাঁর মুক্তি কামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতা নির্বাচিত মনীষী সম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্য সমাজেরই জন্য, সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই।" (কালের পুতুল)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা হাজার জনের দিকে মেলে দেওয়া ভালবাসারই তীব্র সংগ্রামময় কাব্য, তিনি তাঁর হৃদয়কে মেলে ধরেছিলেন বৃহত্তর মানব সমাজের দিকে, যেখানে নিয়ত দুঃখ সংঘর্ষের বেদনায় জন্ম নিচ্ছে আগামীকালের ইতিহাস। তাঁর কবিতার সমস্ত মাধুর্য যেন নিহিত আছে তাঁর অভিজ্ঞতার আহরণ ও প্রকাশ-বেদনার আন্তরিকতায়। তিনি মনে করতেন—মানবতা ও দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি পৃথক

নয়। তাই আকাশের চাঁদ তাঁকে হাতছানি দিতে পারে নি; কারণ, "ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া"। তিনি সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন, ভেবেছেন কৃষক-শ্রমিকের কথা। তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহসী মতাদর্শ পথ চলার প্রেরণা দিয়েছে তাঁকে।

সমকালীন নৈরাশ্য-হতাশা তাঁর কবিতায় আছে, আছে স্বপ্নভঙ্গের বিষাদগাথা। তবে তাঁর কবিতার মূল সুর আশাবাদ। গভীর দুঃখ, অসহ লাঞ্ছনা, অপরিসীম নৈরাশ্যের ভাঙন ধরা উপকূলে দাঁড়িয়েও তিনি আশা করেছেন এ নদীতে আসবে প্রশান্তির জোয়ার, আনন্দের জ্যোৎস্না চুম্বন করে যাবে এর স্থির জলরাশি, প্রাণশক্তির অফুরাণ প্রাচুর্য তাঁর পারিপার্শ্বে জ্বালিয়ে দেবে নির্বাণহীন যৌবনশিখা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বহু কাব্য রচনা করেছেন—'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮), 'চিরকুট' (১৯৫০), 'যত দূরে যাই' (১৯৬২), 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬), 'এই ভাই' (১৯৭১), 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২), 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'জল সইতে', 'যা রে কাগজের নৌকা', 'হাফিজের কবিতা', 'দিন আসবে', 'নাজিম হিকমতের কবিতা', 'রোদ উঠেছে চলো যাই' (১৯৮১), চইচই চইচই (১৯৮৩) ইত্যাদি। 'যত দূরেই যাই' কাব্য গ্রন্থের জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান। 'কবিতা' পত্রিকায় ১৯৩৯-এ সুভাষের প্রথম কবিতা 'আলাপ' প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিই তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা। এখানে তিনি আত্মপরিহাসে শ্রমিকদের পাড়ায় কাব্য খোঁজাকে কটাক্ষ করেছেন।

সুভাষের প্রথম কাব্য 'পদাতিক' (ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৪০) তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। এই কাব্যেই তিনি পেয়েছেন খ্যাতি ও কবির স্বীকৃতি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বে এই কাব্যে তিনি এনেছেন নতুনত্বের চমক। শ্লোগানকে যে শ্লোক করা যায় তা তিনি দেখিয়েছেন এই কাব্যে। কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন—

"....এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁচেছি যখন বাঙালী কবির হাতেও কবিতা তার শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।"

("কবিতা" পত্রিকা, পৌষ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)।

"কালের পুতুল" গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু 'পদাতিক' ও 'পদাতিক—কবি' সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখেছেন— "....তাঁর অভিনবত্ব পদে পদেই চমক লাগায়। তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখে তিনি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে তিনি শক্তিমান; যে কোনো আদর্শই না বিচার করি, মন দিয়ে পড়লে তাঁর কাব্যের সার্থকতা স্বীকার করতেই হয়।

".... তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও লিখলেন না; কোনো অস্পষ্ট

মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিল। দ্বিতীয়, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই আসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষনীয় বস্তু আছে ব'লে মনে করি।..." ("কালের পুতুল")

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃত জীবনপ্রেমিক মানবাত্মার প্রতিভু বলেই 'পদাতিক' কাব্যে 'কলের গান' কবিতায় নির্দ্বিধায় উচ্চকণ্ঠে বলেছেন—

"কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"

—কবি এখানে 'নবযুগ' কথাটির মাধ্যমে আশাবাদী জীবনের ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি জীবনপ্রেমিক ও মানবপ্রেমী ছিলেন বলেই যেখানে অন্যায় অত্যাচার, মানবাত্মার শৃঙ্খলিত রূপ ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি হু-হুংকারে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। 'পদাতিক', অগ্নিকোণ' ও 'চিরকুট' কাব্যে তাঁর জোরালো প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন মূলতঃ মানব জাতির কল্যাণের জন্যই। এই কাব্যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চেতনার যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়েও তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপ ও বক্রোক্তিতে অবক্ষয়িত সমাজকে তুলে ধরেছেন।

'পদাতিক' কাব্যে প্রথম কবিতাতেই রয়েছে উদ্ধত বন্ধনহীন যৌবনের প্রতি উদাত্ত আহ্বান। 'মে দিনের কবিতা'য় মানুষকে তিনি সচেতন করার জন্য বলেছেন—"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।" বলেছেন—ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ তার বৃথা ক্রন্দনে কালক্ষেপ করা উচিত নয়—

"শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
মৃত্যুর ভয়ে ভীরু বসে থাকা, আর না—
পরো পরো যুদ্ধের সজ্জা।"

'চাঁদ' সম্পর্কে সমস্ত রোমান্টিক চেতনাকে ভেঙে দিতেই যেন তিনি উচ্চারণ করেছেন—"বিকৃত মস্তিষ্ক চাঁদ উন্মাতুল স্বপ্নে অশরীরী"

কিংবা—"চাঁদের চোখেতে পড়ুক অন্ধ ছানি,"

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি প্রার্থনাই কবির একমাত্র লক্ষ্য।

কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুট'-এ ১৯৪১-'৪৬-এর সমকালীন পৃথিবী আর নিজের দেশের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা, আগস্ট আন্দোলন, পঞ্চাশের মন্বন্তর পদ্ধতি পটভূমি এই কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে কবির অভিজ্ঞতা অনেক সুস্থির, বিশ্বাসের দীপ্তিতে কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনো বিদ্রূপে-ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ, কখনো বা আবেগে-ব্যথায় বিধুর। তাই তাঁর এগিয়ে চলার গান বিপ্লবের সম্ভাবনায়

সংহত। শ্লেষে, বিক্ষেপে ও উদ্দীপনায় তাঁর কবিতার দীপ্তি উজ্জ্বল-শানিত। এই কাব্যের নাম কবিতা 'চিরকুট'-এ মন্বন্তরের উত্তপ্ত চিত্র বলিষ্ঠ ভাষায় ফুটে উঠেছে—

"পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে
হুজুর, জেনে রাখুন
খাজনা এবার মাপ না হলে
জ্বলে উঠবে আগুন।"

'চিরকুট' কাব্যেই কবি সংগ্রামী মূর্তি ধারণ করেছেন। এই কাব্যে তিনি 'একটি পৃথিবী গড়ার' স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই কাব্যে তাঁর দ্বন্দ্ববিরোধের রূপটি আরও স্পষ্ট হয়েছে। এই কাব্যের সব কবিতাই কাব্যোত্তীর্ণ না হলেও কবির প্রকরণ-কলা অনেক ক্ষেত্রেই সার্থকতায় পৌঁছেছে।

'অগ্নিকোণ'-এ কবি সুভাষের রাজনৈতিক চেতনার চূড়ান্ত উত্তরণ ঘটেছে। এই কাব্যটি মাত্র ছয়টি কবিতার সংকলন। এই কাব্যের প্রথম কবিতা নাম-কবিতা 'অগ্নিকোণ'-এ কবি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গণ অভ্যুত্থানকে কাব্যরূপ প্রদানে সচেষ্ট হয়েছেন। এই কাব্যের 'মিছিলের মুখ' কবিতায় কবির প্রেমভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। তবে এই দৈহিক আকর্ষণ-সঞ্জাত নয়, এ প্রেম মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেম। এই প্রেম উদ্দীপনা সঞ্চারী, নবনব কর্মে প্রেরণাদাত্রী। এই কাব্যের 'জবাব চাই' কবিতায় শোষকের কাছে কবির প্রশ্ন—

" দুশো বছরে রক্ত শুষেও মেটেনি পিপাসা!"

'ময়দানে চলো' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।"—এখানে 'দুশোবছর' বলতে কবি ব্রিটিশ শাসনকালকে এবং 'পশুরাজ' বলতে ব্রিটিশ সিংহরাজের আসনকেই বুঝিয়েছেন।

'ফুল ফুটুক' কাব্যে এসে সমাজবাদী কবি ব্যক্তিগত প্রেমের দাবীকে সর্বজনীনতা দিয়েছেন। অশান্তি—অত্যাচারের দুঃস্বপ্নকে সরিয়ে কবি আনতে চেয়েছেন 'দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।' এই কাব্যে তিনি হয়েই উঠেছেন এক গভীর প্রেমিক ও মানবতাবাদী কবি। 'ফুল ফুটুক' নামকরণের মধ্যেই কবির দিক পরিবর্তনের আভাস স্পষ্ট। এই কাব্যের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতা 'কালো কুচ্ছিত' মেয়েটি বিখ্যাত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যে।

'ফুল ফুটুক'-এর কবিতাগুলি ১৯৫১-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা। কবিতাগুলি জীবনানুরাগের উচ্চারণে প্রদীপ্ত। জীবনকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন কবি এখানে। রাজনৈতিক প্রচার তথা শ্লোগানধর্মিতা থেকে সুভাষ বিবর্তিত হয়েছিলেন এক উদার মানবিকতা এবং কবিতার শিল্প-প্রকরণের প্রতি সযত্ন আসক্তিতে।

'যত দূরে যাই' কাব্যে কবি সুভাষ যথার্থ কাব্য শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। এই

কাব্যের কবিতাগুলি গদ্যকবিতার ঢঙে রচিত হলেও কাব্যগুণের কোনো অভাব ঘটেনি। কবিতাগুলি অনেকটা কাহিনীধর্মী—রূপকথা বা ছোটগল্পের আঙ্গিকে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তা একাব্য সুস্পষ্টভাবেই কবির বাঁক বদলের বাক্য। উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণে কবি এখানে সার্থকতার পরিচয় রেখেছেন। এই সংকলনটি সমাজবোধের সচেতনতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই কাব্যে নৈরাশ্যবোধের কোনো প্রশ্রয় নেই। এই কাব্যে তাঁর শিল্প-প্রকরণে বিবর্তনের পরিচয় পাওয়া যায়।

'কাল মধুমাস', 'এই ভাই', 'ছেলে গেছে বনে' ইত্যাদি কাব্যে কবি মনোজগতের ক্রমিক উন্মোচন ঘটেছে। এখানে জাতকে তিনি দেখেছেন সম্পূর্ণ নির্মোহ দৃষ্টির মননশীল আলোকে। 'কাল মধুমাস'-এ কবি অনলংকৃত ভাষায় তাঁর কাব্যশক্তি প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো কবিতায় ব্যঙ্গাত্মক ভাষাও প্রয়োগ করেছেন। এর নাম-কবিতায় কবি মুক্তবন্ধ মিশ্রবৃত্ত ছন্দকে তাঁর আত্মজীবনীর বাহন করেছেন। দীর্ঘদিন পরে তাঁর এই পদ্যছন্দে প্রত্যাবর্তন তাঁর কাব্যালোকে নতুন রীতি সূচনা করেছে। নাম-কবিতা 'কাল মধুমাস' জীবনানুগ ও ঋজুভাষণে অনবদ্য।

'এস ভাই' গ্রন্থে দেখা যায় কবির অসাধারণ আত্মসমালোচনা

"আমার ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
ভাল লাগছে না
যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি।" ('ভাল লাগছে না')।

'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যে কবি নিজের দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রীদের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেছেন।

কুলী, মজুর, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক সবার কথাই সুভাষের কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে অনিবার্য পার্টি লাইন রক্ষার তাগিদে। কিন্তু শহুরে মানুষ সুভাষ কৃষক এবং শ্রমিকের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন নিজ হৃদয়ের তাগিদে। তাই শ্রমিকের সঙ্গে ময়দানে গিয়ে ধর্মঘটের সামিল হতে পারেন; উদাত্তকণ্ঠে অনায়াসে শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বলতে পারেন—

'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে ভাই, একটু পা চালিয়ে।"

—সুভাষের কবিতার এখানেই সিদ্ধি, এখানেই সমৃদ্ধি।

আধুনিকতার চোরাবালি থেকে প্রগতিশীলতার দিকে বাংলা কবিতার যাত্রা পথে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম সার্থক ও পূর্ণাঙ্গ কবিব্যক্তিত্ব। কেননা, তাঁর কাছে, রাজনীতি এসেছে জীবনের তাগিদে, কবিতায় মার্কসীয় দর্শনের উপস্থিতিও জীবনকে মেনে নিয়ে। তাই অন্য কবিরা যখন অবক্ষয় আর ভাঙনের ছবি আঁকতে ব্যস্ত, তখন তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে যুদ্ধের সজ্জা পরবার আবেদন জানালেন, আধুনিক বাংলা কবিতার শক্তিশালী ধারার যে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ এ বিষয়ে সংশয় নেই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ভাষা নবীন শক্তিতে রূপায়িত, তাঁর সাংকেতিক ব্যবহার অনেক প্রদীপ্ত, নাটকীয় প্রয়োগকথা অব্যর্থভাবে লক্ষ্যভেদী। তাঁর কবিতা তাঁর ফসল, তা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না, যেতে যেতে তাঁর দেখা হয় পায়ে ঘুঙুর বাঁধা নদীর সঙ্গে যার উদ্দু উদ্দু ঢেউয়ে কবি আর এক দিগন্ত প্রত্যাশী। কবি ভেবেছেন সাধারণ মানুষের কথা, কৃষক শ্রমিক মজুরের কথা তাঁর বলিষ্ঠ ও সাহসী মতাদর্শ পথ চলার প্রেরণা দান করেছিল তাঁকে। তাঁর সাহিত্যিক মতাদর্শ সম্বন্ধে তিনি নিজেই যে কথা বলেছেন তা উল্লেখ করে সমাপ্তিরেখা টানা গেল।

"সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে—যা কিছু সংঘাত সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালবাসা—খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব কটি দিক।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কৃষ্ণনগরে ১৯১৯ খ্রীঃ। তাঁর শৈশবকাল কেটেছে উত্তর কলকাতায়। পরে তিন-চার বছর বয়সে বাবার কর্মস্থল রাজশাহি জেলায় নওগাঁতে দশ-এগারো বছর পর্যন্ত কাটে। তাঁর কবিতার ভূমি ও ভাষা নির্মাণে এই নওগাঁর একটা বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কলকাতার ভাষাও তাঁর যথার্থ আয়ত্ত ছিল। তাঁর মা যামিনী দেবী ছিলেন কৃষ্ণনগরের সুমিষ্ট ভাষাভঙ্গির অধিকারিণী। তাই তাঁর লেখার মধ্যে কখনো আবার কৃষ্ণনগরীয় ভাষা বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতার প্রাণরস এসেছে নওগাঁর বিচিত্র বিমিশ্র জীবনযাত্রায় উপলব্ধ ভাষা থেকে।

কবি সুভাষ প্রথমাবধি মুখ্যত সমকালীন জীবনের কবি, সমাজবোধের কবি, মানবতাবাদী কবি। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাকে তিনি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার আলোক ভাষায় ধরে রেখেছেন। তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী, মানুষের সহযাত্রী। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, জয়ে-পরাজয়ের নিত্যসঙ্গী ও সহমর্মী। সমকালীন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর কাব্যভাষা। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে একসময় সরে এলেও তাঁর প্রগতিশীল মনের গতি একটুও মন্থর হয়নি। সার্বভৌম হিতৈষণা ও মানবিকতাবোধের চরমে উত্তরিত হয়েছিলেন তিনি। তিনি শুধু 'পদাতিক' কবি নন, চির পদাতিক কবি—শুধু এগিয়ে চলেছিলেন তিনি।

ড. রিজওয়ানা নাসিরা, অধ্যাপিকা, প্রবচাঁদ হালদার কলেজ, বারাশত, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কাব্যচিন্তার বর্ণমালা ঃ শঙ্খ-শক্তি-সুনীল

জয়গোপাল মণ্ডল

কবিগুরুর 'পুনশ্চ'কে (১৩৩৯) বাদ দিলে 'বাংলা আধুনিক কবিতা'—এই ধারাটি জীবনানন্দের সময় থেকেই সূচিত হয়েছে। ১৯২৭-এ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়ে শুরু হল কবিতার বাঁক ফেরা। বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে 'আধুনিকতা' শব্দটির প্রাসঙ্গিকতা যুক্ত হয়। সত্য, সুন্দরের উপাসনা বন্ধ করে, কবি-শিল্পীরা মাটির সোঁদা গন্ধে ব্যাকুল হলেন। একদিকে মানুষের মনে প্রেম, ভালোবাসা, বিশ্বাস অন্তর্হিত; অন্যদিকে ফ্যাসীবাদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করার অঙ্গীকার—এই স্থির প্রত্যয় নিয়ে আধুনিক কবিদের ব্রত পালন। রবীন্দ্রনাথ এই বিপন্নতা, বিচ্ছিন্নতা, ঔপনিবেশিকতা অনুভব করলেও সত্য-সুন্দরের মরমী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসেননি। বরং সাহিত্যের এই বাঁক নেওয়াকে মেনে নিয়ে বললেন, "কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা।' অর্থাৎ কবিগুরুর স্বীকৃতিতে বাংলা কবিতার পর্বান্তর প্রতিষ্ঠা পেল, শুরু হল আধুনিক কবি গোষ্ঠীর দৃপ্ত পথ চলা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা কবিতার গতিপথ পরিবর্তিত হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্ন। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।" আসলে সময়ের স্রোতে কখনো কখনো তীব্র গতিবেগে জীবন ও সমাজের গতিপথ বদলে যায়, বদলে যায় সাহিত্যের গতি-প্রকৃতিও। অর্থাৎ সময়ের গতিগর্ভেই মর্জির জন্ম হয়। এমনভাবে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রকৃত বার্তা নিয়ে এসেছেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কবি। কিন্তু লক্ষণীয় বিশ শতকের জীবনযাত্রা এতটাই জটিল ও গতিশীল যে, প্রতিটি দশকেই ভাবনার রঙ সময়ের পরতে পরতে বদলাতে থাকে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকে সেই গতি রাজনীতির আবহে বেশি আবর্তিত হয়েছে। কিন্তু পাঁচের দশকে আবার তার পটপরিবর্তন ঘটতে লাগল—আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি, ভাবের আদান-প্রদান, সমাজনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম-মৃত্যু জনিত চেতনা কবিদের কাব্যচিন্তার বর্ণমালাকে আবিষ্ট করেছে। শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত রায়, আলোক সরকার, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, আশিস সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নরেশ গুহ, মণিভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি এই দশক থেকে শুরু করেন কাব্যচর্চা। এঁদের মধ্যে সেযুগে যাঁরা পাঠক মনে হিল্লোল জাগিয়েছিলেন তাঁরা হলেন শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

পাঁচের দশক এক ক্রান্তিকাল। উল্লেখ্য বিদগ্ধ সমালোচকেরা যে সময়কে পঞ্চাশের দশক বলেছেন, সেই সময়ই হল পাঁচের দশক। ব্রিটিশ শাসন-অত্যাচার অবসিত। স্বাধীন ভারতবর্ষ, তবে এ স্বাধীনতা বাঙালীর কাছে খণ্ডিত, দেশভাগের যন্ত্রণা অধিকাংশ বাঙালীকে আর্ত করেছিলো। আজও সেই যন্ত্রণার গোঁঙানি শুনতে পাই। আবার এসবকে উপেক্ষা করেও নতুন সমাজ-শাসন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, সংবিধান রচনার প্রস্তুতি শেষ। এই পরিবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় এই দশকের কবিদের কলমে পরিবর্তিত ভাবধারায় পল্লব বিকশিত হতে শুরু করে। এই পর্বের কবিদের মধ্যে কারো কারো কবিতায় বিশেষত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় প্রেম মূর্ত হয়ে ওঠে। এ তো স্বাধীন সময়ে মুক্ত চিন্তার প্রতিফলন। একই সঙ্গে সামাজিক, আন্তর্জাতিক চেতনাও জীবনবোধের মহান গভীরতা থেকে উৎসারিত হতে থাকে। কবিতার বর্ণমালায় উজ্জ্বল দীপ্তিতে মুখরিত হয় মানবতার গায়ত্রীমন্ত্র। পূর্বতন কবিদের রাজনৈতিক লড়াই, বিবেক বোধ কারো কারো কবিতায় অবশ্য সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ঝংকৃত হয়েছে। এঁরা বিচিত্র ভাবের ও বিষয়ের কবিতা লিখেছেন। নতুন আঙ্গিকের চর্চাও করেছেন। কিন্তু সবাই যে পূর্বসূরীদের তথা কল্লোল যুগের ছায়ামুক্ত হয়েছেন তা নয়। তবুও এই দশক যে বাংলা কাব্য চিন্তার বর্ণমালায় নতুন রক্ত সঞ্চারিত করেছিল—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই যুগের যে ত্রয়ী কবির নাম এক সাথে উচ্চারিত হয়— সেই শঙ্খ, শক্তি ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যভাবনার আলোকে এই পাঁচের দশকের কাব্যচিন্তার বর্ণমালা রচনা করাই আমার অভিষ্ঠ।

পাঁচের দশকের অন্যতম বিশিষ্ট কবি এবং সমালোচক শঙ্খ ঘোষ। তিনি একাধারে অধ্যাপক, অন্যদিকে বিশিষ্ট সমাজ সচেতন, রাজনীতি সচেতন কবি। কবিতার রূপনির্মাণে তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি গভীর জীবনবোধের প্রকাশে সমুজ্জ্বল। সমকালের অন্য কবিদের মতো তিনি রোমান্টিক প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষার জগতে নিজেকে আবিষ্ট রাখতে চাননি, বরং অত্যন্ত বিস্তৃত মানববোধের সীমায় মিলিয়েছেন জাতীয়-আন্তর্জাতিক চেতনাকে। শব্দগত চমৎকারিত্ব বা চটুলতা নেই, সহজ অথচ গভীর চেতনার আলোতে পাঠক-মনকে অবগাহন করার মোক্ষম আবেশ রচনা করেছেন তিনি। একদিকে সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা ঝলসে উঠেছে। অন্যদিকে সংক্রান্তির বেদনায় সহনীয় চেতনা উজ্জ্বল তারার মতো দীপ্ত হয়েছে। আজও তাঁর লড়াই অব্যাহত। লিখে চলেছেন অনড় ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি নিয়ে। সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বর্তমান শাসকের উদ্দেশ্যে ১৮ই মার্চ ২০০৭, রবিবার 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় কলমের পাশে বজ্রবাণে যখন লিখলেন—

"আমি তো আমার শপথ রেখেছি/ অক্ষরে অক্ষরে/ যারা প্রতিবাদী তাদের জীবন/ দিয়েছি নরক করে। / দাপিয়ে বেড়াবে আমাদের দল/ অন্যে কবে না কথা/ বজ্রকঠিন রাজ্য শাসনে/ সেটাই স্বাভাবিকতা।"

বামপন্থী মনোভাবে তখন দীক্ষিত সচেতন কবি শঙ্খ ঘোষের স্বভাবধর্মকে সহজে আমরা চিনতে পারি। অত্যন্ত সাবলীল ভাষায়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বামফ্রন্ট পরিচালিত শাসকের স্বাভাবিকতাকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন তা আমাদের যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি মনের গহনে সুপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠকে সচকিত করে তোলে। এই মানবতাবাদী কবি আজও বেঁচে আছেন লড়াই নিয়ে —এ আমাদের সৌভাগ্য। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি' (১৯৫৬) অতঃপর ক্রমপর্যায়ে প্রকাশিত হয় 'এখন সময় নয়' (১৯৬৭), 'নিহিত পাতালছায়া (১৯৬৭) 'আদি লতাগুল্মময়' (১৯৭২), 'মূর্খ বড় সামাজিক নয়' (১৯৭৭) , 'বাবরের প্রার্থনা' (১৯৭৭) 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' (রচনাকাল ১৯৬৭-৬৯/ প্রকাশকাল ১৯৭৮), 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' (১৯৮০), 'প্রহর জোড়া ত্রিতাল' (১৯৮২) , 'মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' (১৯৮৪), 'বন্ধুরা মাতি তরজায়' (১৯৮৪), 'ধুম লেগেছে হৃৎকমলে' (১৯৮৭), 'লাইনেই ছিলাম বাবা' (১৯৯৩), 'গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ' (১৯৯৮) , 'শবের উপরে শামিয়ানা' (১৯৯৬), 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' (১৯৯৯), 'জলই পাষাণ হয়ে আছে ' (২০০৪), 'সমস্ত ক্ষতের মুখে পলি' (২০০৭), 'মাটি খোঁড়া পুরোনো করোটি (২০০৯) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ। নামকরণেই আমরা দেখি সহজ-সরল সাদাসিধে কবির কাব্যপঙক্তির উদ্ভাস। এর নেপথ্যে আছে দ্বন্দ্ব ও আঘাতময় জীবনবোধের উত্তাপ এবং ইতিহাস চেতনা।

সময়ের জটিল ঘূর্ণাবর্তে তিনি শান্তির দূত। কবির কণ্ঠে এমন সুমিত ভাবনার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় প্রথম কাব্যে— 'এবং আমাকে বলো, মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন / আমি হব তাই/তৃণময় শান্তি হব আমি।'— কী ব্যাকুল আর্তি! প্রথম থেকে বোঝা যায় কবি-জীবনে তিনি আজীবন প্রতিবাদ প্রতিরোধে উজ্জ্বল থেকেছেন, এক প্রোজ্জ্বল মানবিক মুখ তাঁর জীবনধর্ম, চিরকালীন আবেদনে প্রহর জাগে—'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা/একটু আগুন দে/ আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি/বাঁচার আনন্দে' (দিনগুলি রাতগুলি), 'হাওড়া ব্রিজের চূড়োয় উঠুন/ নীচে তাকান, উর্দ্ধে চান / দুটোই মাত্র সম্প্রদায়/ নির্বোধ আর বুদ্ধিমান।' (নিহিত পাতালছায়া'), 'রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন/মশাই দেখছি ভীষণ শৌখিন—' (ঐ), 'একটু মশাই নতুন/ভিতর থেকে নতুন'/ চাপ সৃষ্টি করুন/ চাপ সৃষ্টি করুণ।' (বাবরের প্রার্থনা)। চল্লিশ দশকের কবিদের সঙ্গে এখানেই তাঁর মিল। পার্থক্য কেবল তিনি সরাসরি রাজনীতির নামাবলী পরে

রাজপথে পথ হাঁটেননি, উত্থিত করেননি মুষ্টিবদ্ধ হাত, কিন্তু তাঁর কলম সেই অত্যাচারিত, পীড়িত মানুষদের জন্য কতটা উচ্চকিত তা তাঁর কবিতার পংক্তিমালাই স্পষ্ট করে। 'শান্তি' কবিতায় তিনি এক আশ্চর্য নির্মাণ কৌশলে উপস্থাপন করলেন পীড়িত মানুষের কথা—'নীচু গলায় কথা বলার অপরাধে তার/ যাবজ্জীবন/কারাদণ্ড হলো/ হামলে পড়ল তার উপর তিনটে ভালুক/ ঠিক ভালুক নয়, প্রহরী/ঠিক প্রহরীও নয়, সত্যি বলতে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা/ মেরুদণ্ড থেকে শাঁস তুলে নিতে নিতে/ বলল তারা, খবরদার/এদিক-ওদিক তাকাবে না, কেবল গলা খুলে চেঁচাও।' কবি শঙ্খ ঘোষ এইভাবে মানবিক মুখ নিয়ে মানুষের জন্যে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন, খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন শাসকের মুখোস। কখনো কখনো দ্বিধা তাঁকে বিভ্রান্ত করলেও তিনি কখনোও নিজস্ব নীতি আদর্শ থেকে চ্যুত হননি। এখানেই তাঁর জয় ও বরাভয়।

পাঁচের দশকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পাঠকের হৃদয়ে চমক লাগিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু অপূর্ব শব্দ চয়ন, ছন্দের ভাঙা গড়া, উচ্ছৃঙ্খল বোহেমিয়ান জীবন যাপন, মিলে-মিলহীনতার কবিতা রচনা এবং উপমা সরলতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় এই দশকের কবিদলের কিংবদন্তী নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কবিতায় শুরু থেকেই মৃত্যুচেতনা ও প্রেমানুভূতি পরস্পর পটভূমিতে পল্লবিত হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে মানুষের প্রতি গভীর অনুরাগ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'যম' ('কবিতা পত্রিকা' /১৯৫৫) এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ'। এরপর তাঁর অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বলা চলে 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (১৯৬৫) 'সোনার মাছি খুন করেছি' (১৯৬৭), 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' (১৯৮২) প্রভৃতি।

ব্যতিক্রমী জীবনযাপনের বিশৃঙ্খলতায় তাঁর কবিতা রচনা। ফলে তাঁর কাব্যপ্রবন্ধ সহজ-সরল সতেজতায় সরল ও স্বেচ্ছাচারী। কবি স্বয়ং স্বীকার করেছেন তাঁর কবিতায় —'তীরে কি প্রচণ্ড কলরব / 'জলে ভেসে যায় কার শব'/ কোথা ছিলো বাড়ি?/ রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়—'আমি স্বেচ্ছাচারী''। তাঁর কবিতা গড়ে উঠেছে প্রকৃতির বুকে আশ্রয় আসক্তিতে, নির্মোহ আত্মানুসন্ধানে, নির্মম আত্মবিশ্লেষণে, ব্যক্তিগত ভাবনায় স্বতোৎসারিত স্বগতোক্তিতে, বিষাদে ও অসংলগ্ন জীবন যাত্রার চালচিত্রে, স্বতঃস্ফূর্ত মৃত্যুচেতনায় এবং সর্বোপরি আপন ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনিঃশেষ বোধে ও অনুভবে। প্রকৃতি তাঁর কবিতায় যেন সন্ধানী খনি মাত্র। আসলে আধুনিক কবিরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মুগ্ধ দর্শক নন; নৈসর্গিক মুগ্ধতার প্রতিটি ইমেজ তাঁদের হাতিয়ার। জীবনানন্দ এই ভাবনার সূত্রকার। সুকান্তও যেমন 'চাঁদকে' অন্যরূপে দেখেছিলেন—'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো

রুটি', কবি দীনেশ দাশ যেমন বলেছেন, 'এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে', কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'আকাশের চাঁদ দেয় বুঝি হাতছানি/ওসব কেবল বুর্জোয়াদের মায়া'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও এক্ষেত্রে অনন্য। তিনি লিখেছেন—'চাঁদের ভিতরে কতকাল/পড়ে আছে তোমার কঙ্কাল।' চাঁদের 'কলঙ্ক' কবির কলমের রসায়নে হয়ে গেল 'কঙ্কাল'—কী সুনিপুণ ব্যঞ্জনা। 'অবনী বাড়ি আছো?' কবিতায় কবি প্রকৃতিকে এক অপরূপ চিত্রকল্পে এঁকেছেন—'বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস/এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে/ পরান্মুখ সবুজ নালি ঘাস/ দুয়ার চেপে ধরে—/ 'অবনী বাড়ি আছো?'—প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতা এখানে চিত্রিত—বৃষ্টি পড়ে বারোমাস, মেঘেরা ঘুরে বেড়ায় গাভীর মতো, নালিঘাস বেড়ে ওঠে, কিন্তু সে মানুষের প্রতি উদাসীন হয়ে 'দুয়ার চেপে ধরে'। এমনই চালচিত্রে কবির চৈতন্যের অন্তঃস্থল থেকে আহ্বান ধ্বনিত হয়— সে ডাক আর্ত, আশঙ্কার—দেরি হলে হয়তো বা কোনো সর্বনাশা হয়ে যেতে পারে। প্রকৃতি ও মানবচেতনার মধ্যে কবি লক্ষ্য করেছেন সহবাসিতা, রহস্যময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

'প্রেম' এমন একটি বিষয়, যা নিয়ে কালে কালে দেশে দেশে কবিরা কবিতার ঘর বানিয়েছেন। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও প্রেম ভাবনার কবিতাতে চিরস্মরণীয়তার আস্বাদ দিয়েছেন। তবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো এই ধরনের কবিতায় তিনি যৌবনাকো, শরীরী রিরংসাকে স্থান দেননি। অথচ কী রোমান্টিকতা, প্রচ্ছন্ন মৃদু উচ্চারণে প্রেমের ব্যাকুলতায় মনকে ভরিয়ে দেয়, তা তাঁর কবিতা পড়লে বোঝা যায়—

'বৃষ্টি নামলো যখন আমি উঠোন-পানে একা/ দৌড়ে গিয়ে ভেবেছিলাম তোমায় পাবো দেখা/ হয়তো মেঘে-বৃষ্টিতে বা শিউলিগাছের তলে/ আজানুকেশ ভিজিয়ে নিচ্ছো আকাশ-ছেঁচা জলে/ কিন্তু তুমি নেই বাহিরে—অন্তরে মেঘ করে/ ভারি ব্যাপক বৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে ঝরে।' (যখন বৃষ্টি নামল)

অনায়াস কথ্য শব্দ প্রয়োগে অনন্য দক্ষতায় কবি গভীর প্রেমানুরাগের অপূর্ব চিত্র অঙ্কন করেছেন। এমন মধুর অথচ চিত্তাকর্ষক অনুভব তাঁর বহু কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে ছড়িয়ে আছে—'এমন সময় বৃষ্টি দিলে ভারি/ বসেছিলাম চাঁদের আড়াআড়ি/বললে এই যে—রাখো তোমার কাছে/ তোমার ছবি আমার বাক্সে আছে।' (মনে পড়লো)। অমলিন মানবপ্রেমও তাঁর কবিতার পরতে পরতে পুষ্পিত হয়েছে। কবি সকাতর আবেদনে লিখেছেন—'মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও'। মৃত্যুভাবনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিজীবনের সূচনা থেকেই শেষ পর্যন্ত লগ্ন ছিলো। সাধারণত জীবনের উপান্তে পৌঁছে মৃত্যুভাবনা মানুষকে তাড়িত করে। প্রত্যেক কবির কবিতায় এই ভাবনার স্ফুরণ ঘটে। কবি মধুসূদন লিখেছেন—'জন্মিলে মরিতে হবে

অমর কে কোথা কবে/ চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে'। আধুনিক কবি জীবনানন্দ লিখলেন—'তোমার বুকের থেকে একদিন চলে যাবেতোমার সন্তান,/বাংলার বুক ছেড়ে চলে যাবে'। কিন্তু, জীবনের যে প্রেক্ষাপটে এই মৃত্যুভাবনা প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেই একই পটভূমি হয়তো কাজ করেনি। হয়তোযে দুঃখ থেকে আবহমান কাল গভীরতর নান্দনিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তা হয়তো আলোচ্য কবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শৈশব থেকেই কবি ছিলেন পিতৃহীন, দাদুর গলগ্রহে তিনি বড় হতে থাকেন। জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা—হয়তো এই অনুভবের উৎস এখান থেকে। তাই কবি বলেছেন— 'জরাসন্ধ' কবিতায় —'আমাকে তুই' আনলি কেন, ফিরিয়ে নে', 'চতুরঙ্গে' বলেছেন, 'খুব বেশি দিন বাঁচবো না/ আমি বাঁচতে চাইনা'। কিন্তু এই স্বদেশকে ভালোবেসে জীবনের শেষ লগ্নে পৌঁছে 'কিছু মায়া রয়ে গেল' (১৯৯৬) কাব্যগ্রন্থের 'ফিরে এসো মালবিকা' কবিতায় জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসায় মরমী কথা রচনা করেছেন—

'ফিরে এসো মালবিকা কী সুস্বাদ এখানে, জীবনে—/ফিরে এসো মালবিকা যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর,/ শান্তিনিকেতনে আমি দেখেছি পলাশ—/ ফিরে এসো মালবিকা,/ ও পলাশে তোমাকে সাজাবো;/ রাঙা ধুলো দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো; / ভালোবাসা দিয়ে আমি তোমাকে সাজাবো।'

আসলে জীবন ও মৃত্যু এই কবির কবিতায় রক্তিম বন্ধনে সংরক্ত। এখানে জীবনানন্দের 'সুচেতনা' কবিতার কাব্য ভাবনার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—'সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়োনাকো তুমি, / বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে/ফিরে এসো সুরঞ্জনা;/নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;'। আসলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনায় বিষাদ ও আনন্দের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাই 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো' কবিতায় নির্দ্বিধায় দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—'যাবো কিন্তু এখনি যাবো না/ তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবো। একাকী যাবো না—অসময়ে।'—এখানেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জিত, সমকালের কবিদের থেকে এখানেই তিনি স্বতন্ত্র ও অনন্য।

এই দশকে কাব্যপ্রযত্নের রঙিনভাবের রোমান্টিক প্রেমের আবেশ নিয়ে পাঠকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক, কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতিও কম নয়। তাঁর কবিতার প্রধান অবলম্বন নারী ও প্রেম। কৈশোর জীবনের কোমল অভিমান এবং যৌবনের উষ্ণ আলো-ছায়া তাঁর কবিতায় যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে, তা পাঠকের মনকে দোলা দিয়েছে। তাঁর কাব্যের নায়িকা 'নারী'—তার সমস্ত রকম আকর্ষণীয় উন্মাদনা, কামুক মত্ততা; সবই রহস্যময়ী ও কৌতূহল প্রিয়তায় সকলের কাছে আকাঙ্ক্ষিত। তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ

'একা এবং কয়েকজন' (১৯৬০/১৩৬৭) এবং এরূপর ক্রমিক পর্যায়ে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, প্রকাশিত হয়েছে কাব্যগ্রন্থ। তবে সাম্প্রতিক অতীতে যাবার বেলায় তাঁর কলমের মুখে সমাজবোধ অনেকটাই জাগ্রত। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করা যায়—'আমি কিরকমভাবে বেঁচে আছি' (১৩৭২/১৯৬৫), 'বন্দী জেগে আছো' (১৩৭৫/১৯৬৮) 'আমার স্বপ্ন' (১৩৭৯) 'দেখা হলো ভালোবাসা বেদনায়' (১৩৮৬), 'ভোরবেলার উপহার' (১৯৯৯) প্রভৃতি।

মূলত পাঁচের দশকের রোমান্টিক প্রেমের কবি হিসেবেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষত যৌনতার উত্তাপ যে পাঠকের মনকে সহজেই বিমোহিত করে, তাদের কাছে এই কবি খুবই জনপ্রিয়। এদিক থেকে তিনি সমকালের বন্ধু কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর প্রথমদিকের কবিতায় দেখি প্রেমের রাজ্যে নারীর শরীরের উদ্দাম উষ্ণতা কিভাবে পুরুষের সঙ্গলাভে 'সর্বনাশের ফুল' ফোটায়, তার অপূর্ব চিত্র। তবে এখানে কবিতার আবেদন তাতে একটুও ক্ষুন্ন হয়নি। সহজ-সরল কাব্যভাষ্যে তাঁর চয়ন সহজেই পাঠকের মন ছুঁয়ে ফেলে—

'সে তার শরীর থেকে ঝরিয়েছে কান্নার সাগর/ আমার নির্মম হাতে সঁপেছে বুকের উপকূল,/ তারপর শান্ত হলে সুখে দুঃখে কামনার ঝড়/ গর্ভের প্রাণের বৃন্তে ফুটে উঠলো সর্বনাশ-ফুল।' (বিবৃতি)

অথবা 'হিমযুগ' কবিতায় সরাসরি শরীরের কায়িক রূপ থেকে গড়ে ওঠা ভালোবাসার প্রত্যাশার ছবি—

'শরীরের যুদ্ধ থেকে বহুদূর চলে গিয়ে ফিরে আসি শরীরের কাছে
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে
শিশিরে ধুয়েছো বুক, কোমল জ্যোৎস্নার মতো যোনি
মধুকূপী ঘাসের মতন রোম, কিছুটা খয়েরী
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে
আমার নিশ্বাস পড়ে দ্রুত, বড়ো ঘাম হয়, মুখে আসে স্তুতি
কথা দিয়েছিলে তুমি উদাসীন সঙ্গম শেখাবে—'

তাঁর যৌবন অতিক্রান্ত কালে লেখা 'কেউ কথা রাখেনি' কবিতাটি পাঠকের সবচেয়ে প্রিয়। এই কবিতায় তিনটি স্তরে—বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের করুণ অথচ রঙিন অনুভূতি পল্লবিত। গদ্য কবিতায় লিরিকের মূর্চ্ছনায় রোমান্টিক অনুভূতি নস্টালজিয়ার আশ্রয়ে প্রকাশিত। এখানে কবি অভিমানে প্রেমের ব্যর্থতায় ক্ষোভ প্রকাশও করেছেন—

'বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিল,
সেদিন আমায় সত্যিকারের ভালোবাসবে
সেদিন আমার বুকের মধ্যেও এ রকম আতরের গন্ধ হবে।
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ
এখনো সে যে-কোনো নারী
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না।'

নারীর সামান্য ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শ নিতে সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ করেছিলেন গালিব, ওমর খৈয়াম, শরৎচন্দ্রের মাতাল দেবদাস ছন্নছাড়া বোহেমিয়ান হয়েছিলো। এখানে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সত্যিকারের ভালোবাসার প্রমাণ দিতে রাগী ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড় বাঁধতেও ভয় পাননি, বরুণাকে খুশী করতে দেবী দুর্গার অকাল বোধনের মতো মূল্যবান মুহূর্তে ১০৮টি নীলপদ্ম এনে প্রেমের মূর্তরূপ রচনা করেছেন। তবু কবির প্রেমের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু 'নীরা'র প্রেমে তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল, যৌনতার অভিঘাতে তাঁকে আঘাত করতে গেলে কবির কষ্ট হয়।

পরবর্তীকালে কবির সমাজচেতনা বিবেকের তাড়নায় স্পষ্ট হয়েছে। একটা রাজনৈতিক প্রত্যয় তাঁর কবিতার অঙ্গনে অস্পষ্ট রূপরেখার স্পন্দিত। 'তোমার সঙ্গে দেখা হলে' কবিতায় কবি প্রচ্ছন্ন রহস্যময়তায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে না, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারী হত্যারকদের স্বদেশ চেতনা, সমাজ-প্রেমকে কটাক্ষ করেছেন—

'তোমার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম
গুলি বিনিময়ে তুমি প্রাণ দিলে দেশ কোথায় থাকবে?
দেশ কি জন্মস্থানের মাটি, না কাঁটা তারের সীমানা?
বাস থেকে নামিয়ে যাদের তুমি হত্যা করলে
তাদের বুঝি দেশ নেই?'

বিশ শতকের শেষে এসে যে কবি দুঃসাহসিকতায় এই চিরন্তন সমাজচেতনা কাব্যচিন্তার রঙে কবিতার বর্ণমালাকে দায়বদ্ধ করে তোলেন, সেই কবি যে সত্যিই পাঠকের মানে চিরজয়ী আসন পাবেন তা সংশয়াতীত।

বাংলা কবিতার পাঁচের দশকে আরো অনেক কবি আছেন যাঁদের হৃদয়ের রঙে রঙিন কাব্যমালা আমাদের অবোধ মনকে কখনো প্রেমের মূর্তিতে, অভিমানে-বিরহে আবিষ্ট করে। কখনো রাজনৈতিক আবেদনে জীবনের লড়াই-এর পথ বাতলে দেয়। যেমন একই সঙ্গে রাজনীতি ও রোমান্টিক প্রেমের কবিতার উৎসারণে বিস্ময় স্রষ্টা, মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু, বিপুল অধ্যয়নে ঋদ্ধ , সরল ও উদার মনের মানুষ কবি তরুণ সান্যাল, বামপন্থী কবি ও প্রেমের কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত, আস্তিক্যবোধ ও বিশ্বচেতনার কবি আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখ। কিন্তু এখানে পরিসর স্বল্প। তাই তিন প্রখ্যাত কবির কাব্যচিন্তার বর্ণমালা, কথা, বৈচিত্র্যময় রঙিন বিষয় নিয়ে এখানে পাঁচের দশকের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে সহজভাবে দেখার চেষ্টা করেছি। সাহিত্য সমালোচনার প্রয়োজনে যেমন প্রয়োজন হয় যুগ-বিভাগের, তেমনি সেই পথে কবিতার কাল বুঝতে দশক বিভাগে কাব্যসমালোচকগণ সচেষ্ট থাকেন। যদিও কোনো কবির কবিজীবন কোনো দশকে সীমাবদ্ধ থাকে না, কিন্তু সূচনা তো দশকের প্রকাশতা দিয়েই হয়। চল্লিশ দশকে এসেছে স্বাধীনতা, ঘটেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অতঃপর বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি—এইসব দেখার পর পাঁচের দশক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কবির ভাবনায়—মননে। তাই পাঁচের দশক কবিতার ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। বৈচিত্র্যে ও নতুনত্বে এই দশকের ত্রয়ী কবি শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যপ্রযত্ন বাঙালীর হৃদয় অঙ্গনে আজ অম্লান আলোকে দীপ্যমান।

ড. জয়গোপাল মন্ডল, অধ্যাপক, রাজা শিব প্রসাদ কলেজ, ঝরিয়া, ধানবাদ

A CRITICAL STUDY OF POST-INDEPENDENCE INDIAN ENGLISH POETRY

GAGAN KUMAR PATHAK

ABSTRACT :

It is poetry that the post-Independence period witnessed the most crucial developments. In the fifties arose a school of poets who tried to turn their backs on the romantic tradition and write a verse more in tune with the age, its general temper and its literary ethos. They tried, with varying degrees of success, to naturalize in the Indian soil the modernistic elements derived from the poetic revolution affected by T.S. Eliot and others in the twentieth century British and American poetry.

Key Words : Spiritual poetry, concrete experience, private voice, Alienation theme, Metaphysical theme.

INTRODUCTION :

The Indian English romantic tradition is not however yet completely extinct and in fact; paradoxically enough, its finest produce was to appear immediately after Independence: Sri Aurobindo's Savitri was published in its final from in 1950-51, apart from his Last Poems (1952), More Piens (1953) and the epic Ilion (1957), all of which appeared posthumously during this period. The school of Aurobindo is also seen to be active as in the earlier period, rather pantingly trying to follow in the giant footsteps of the master. The chief poets of the school include Dilip Kumar Roy (Eyes of Light, 1948), Themis (Poems, 1952), Romen (The Golden Apocalypse, 1953), Prithvi Singh Nahar (The Winds of Silence, 1954), Prithvindra N. Mukherjee (A Rose-Bud's Sng, 1959) and V. Madhusudan Reddy (Sapphires of Solitude, 1960) The verse of K.R. Srinivasa Iyengar in Tryst With the Divine (1974). Mycrocosmographia Poetica (1976) and Leaves from a Log (1979) and that of V.K. Gokak in Song of Life and Other Poems (1947), in Life's Temple (1965) and Kashmir and the Blind Man (1977) also revels the strong influence of Sri Aurobindo. Their most characteristic note is one of quiet and sometimes insightful rumination. Among other writers of romantic verse may be mentioned Adi K. Sett (The Light Above the Clouds, 1948; Rain in My Heart, 1954), B.D. Sastri (Tears of Faith, 1950), K.R.R. Sastri (Gathered Flowers, 1956), Barjor Paymaster (The Last Farewell and other Poems, 1960); Trilok Chandra (A Hundred and One Flowers, 1961); Rai Vyas (Jai Hind, 1961); and P.V.B. Sharma (Morning Buds, 1964).

By the fifties, the 'new poetry' had already, made its appearance. In 1958, P. Lal and his associates founded the Writers Workshop in Calcutta which soon became and effective forum for modernist poetry. The Workshop

manifesto described the school as consisting of 'a group of writers who agree in principle that English has proved its ability, as a language, to play a creative role in Indian Literature, through original writings and transcription.' The Workshop 'Miscellany' was to be 'devoted to creative writing' giving preference to experimental work by young and unpublished writers. The first modernist anthology was Modern Indo-Anglian Poetry (1958) edited by P. Lal and K. Raghvendra Rao. In a somewhat brash Introduction the editors condemned 'greasy, weak-spined and pur-ple-adjectived "spiritual poetry" and the blurred and rubbery sentiments of .... Sri Aurobindo' and declared that 'the phase of Indo-Anglian romanticism ended with Sarojini Naidu.' They affirmed their faith in 'a vital language' which 'must not be a total travesty of the current pattern of speech,' commended 'the effort to experiment,' advocated a poetry that dealt 'in concrete terms with concrete experience,' and emphasized 'the need for the private voice,' especially because 'we live in an age that tends so easily to demonstrations of mass-approval and hysteria.'

DISCUSSION :

The first of the 'new' poets to publish a collection was Nissim Ezekiel (1924 -), easily one of the most notable post-Independence Indian English writers of verse. His A Time to Change appeared in 1952, to be followed by Sixty Poems (1953), The Third (1959), The Unfinished Man (1960), The Exact Name (1965) and Hymns in Darkness (1976). A major shaping factor in Ezekiel's poetry is that he belongs to a Bene-Israel family which migrated to India generations ago. Thus substantially alienated from the core of the Indian ethos, Ezekiel is acutely aware of this alienation being accentuated by the fact that be has spent most of his life in highly westernized circles in cosmopolitan Bombay. With Marathi (on his own admission) as his 'lost mother tongue' and English as his 'second mother tongue', Ezekiel's quest for integration made for a restless career of quick changes and experiments including 'philosophy/ poverty and poetry' in a London baseent room, and attempts at journalism, publishing and advertising - and even a spell of working as a factory manager- before he settled down as a university teacher in his 'bitter native city'.

The alienation theme is thus central to Ezekiel's work and colours his entire poetic universe. This explains his early fascination for Rilke, though he learnt his poetic craft from Eliot and Auden, whom he frequently echoes in his early verse. 'A refugee of the spirit' in search of his 'dim identity', which in different odds appears to him to be either a 'one man lunatic asylum' or 'a small deserted holy place', Ezekiel experiments with three different solutions to his problem. The easiest way out is a protective assumption of easy superiority expressing itself in surface irony as in his 'Very Indian' poems 'in

Indian English', in which the obvious linguistic howlers of Indian students are pilloried with metropolitan snobbishness. In a more generous mood, he gives himself the testimonial of being 'a good native' and tells himself (perhaps more loudly than is necessary) 'I cannot leave this island / I was born here and belong.' Then despair takes over and he ruefully accepts his failure (in Rilke's words) 'to weave himself more closely into things' and confesses, 'My backward place is where I am.'

But at his best Ezekiel does succeed in creating something more than minor verse out of his alienation as in 'Night of the Scorpion', which is one of the finest poems in recent Indian English Literature. Here, the tale, which lies in the sting, is told by a observer, who is neither flippantly ironical nor antiseptically detached; on the contrary, he invests the poem with deep significance by trying to understand the Indian ethos ad its view of evil and suffering, though he makes no claim to sharing it.

Another persistent motif is an obsessive sense of failure, leading to agonized bouts of self-doubt and self-laceration, revealing the poet 'in exile from himself.' This has strongly coloured Ezekiel's poetry of love and marriage also. Art and the artist is yet another thee to which the poet, who goes with 'a Cezanne slung round his neck', returns time and again. In Jamini Roy, the painter, he finds an ideal which he himself has failed to attain - an artist who 'travelled, so he found his roots,' an urban artist who rediscovered the 'law' of folk art, with impressive results. The metaphysical theme touched upon occasionally in the earlier verse (Ezekiel was once a student of philosophy, one remembers) is specially stressed in the recent Hymns in Darkness, though the poet makes no serious attempt to fine ' final formula of light' and concludes rather tamely that 'Belief will not save you / Not unbelief.' There are also a number of bird and animal poems which remind one of Ted Hughes, though the British poet's hairy-chested toughness gives place here to quiet musing on problems of poetry and existence.

Ezekiel's poetry reveals technical skill of a high order. Except in his later work where his choice of an open for sometimes makes for looseness, he has always written verse which is extremely tightly constructed. His mastery of the colloquial idiom is matched by a sure command of rhythm and rhyme. A happy use of cool understatement (e.g., 'A certain happiness would be to die') and a lapidary quality have made him one of the most quotable poets of his generation (e.g. 'Home is where we have to gather grace'). Though hardly a poet with the shatteringly original image, he employs the extended metaphor effectively in poems like 'Enterprise.'

When he is writing below his best, Ezekiel occasionally lapses into faded romanticism (e.g., 'tumult of despair') of indulges in cleverness (e.g.,

'Pretence, to pretend, I pretend'), but except when he deliberately adopts the ironic mode, his verse generally maintains a studied neutrality of tone, which suits his natural stance of the alienated observer. It is, however, in the overtones as in 'Night of the Scorpion' that Ezekiel gives intimations of a talent which is certainly capable of major poetic utterance.

Towards the end of the 'fifties, Dom Moraes (1938 -) the first of the 'new' poets to win recognition in England, appeared on the scene (His first book won the Hawthornden Prize in 1958). Son of Frank Moraes, the well-known Indian journalist, Dom Moraes lived in England for many years, having adopted British citizenship in 1961. He has studiedly disowned his Indian heritage repeatedly. 'I was a boy and I hold a British passport. The historical accident of British rule in India worked on my family so that I lived an English life there and spoke no Indian language .... So English was my outlook, I found I could not fit in India. When eventually I came to England, I fitted in at once. Again, 'In Europe I had positive emotions; in India I sank into the dream in which my whole country was sunk. He has also produced the certificate of Verrier Elwin who reportedly told him, 'You are a very English person. Your reactions aren't Indian. Nevertheless, it is impossible to think of Dom Moraes as anything but a Indian English poet and The Penguin Companion to Literature rightly describes him as an 'Indian Poet'. Born in a Goan Christian family, Moraes, an only son, had an excruciatingly troubled and insecure childhood and adolescence during which his mother's frequent bouts of insanity were a persistent nightmare, as his autobiography, My son's Father, reveals. The varied repercussions of this traumatic experience and his attempts to come to terms with them in adult life form the driving force behind his verse in A Beginning (1957), Poems (1960) and John Nobody (1968). His Poems 1955-1965 appeared in 1966 and his Collected Poems in 1969. Deeply influenced by Dylan Thomas and the surrealisti school, Moraes's is a highly personal poetry with a persistent confessional tone and its recurring themes are loneliness and insecurity from which esape is sought either in the erotic fantasies of a febrile imagination or the self-probing of a tortured soul. His verse often creates a haunted world in which classical, Chrisian, medieval and fairy tale myths are mixed and dragons and dwarfs, Cain and the univorn, the tombs of Mycenae and Christ come together. He finds himself 'unloved and forlorn' and his fate is to 'seem/unreal to y self.' When his quest is imbued with an urgent intensity, Moraes writes memorable poems like 'The Visitor' in which there is a fruitful exploration of the poet' own psyche (e.g., 'I shall be he whom you will never find/ Except in me'). His love poems can be incandescent but sometimes also lapse either into metaphysical conceit (e.g., 'the high /Mountain of her body that I was to climb') or romantic clichés (e.g.,

'I have furnished my heart to be her nest'). His imagery has a strong sensuous quality (e.g., 'the curds /of sea' - an image, by the way, which, in spite of all his protestations to the contrary, so obviously stamps him as an Indian English poet) and of all his contemporaries he has perhaps the finest ear for the rhythms of modern English. What never fails in Moraes's verse is the easy, refined and controlled flow of language. Moraes has not published a new collection of verse for almost a decade now and appears to have turned to prose. Though he would have us believe that 'I have dropped my root and struck,' his verse has shown little evidence of any startling development consequent upon the reportedly successful transplantation, since he became a British citizen almost a generation ago.

During the nineteen sixties, several prominent 'new' poets appeared, the earliest of whom was P. Lal (1929 -). Born in the Punjab, Purushotta Lal migrated to Calcutta with his parents at the age of one. Educated in this city, Lal now teaches English there. His verse collections include The Parrot's Death and Other Poems (1960), "Change!" They Said (1966), Draupadi and Jayadratha and Other Poems (1967), Yakshi from Didarganj and Other Poems (1969), The Man of Dharma and the Rasa of Silence (1974) and Calcutta: A Long Poe (1977). His Collected Poems appeared in 1977. He has also published creative translations of The Bhagawad Gita (1965), The Dhammapada (1967) and Ghalib's Love Poems (1971). His verse 'transcreation' of The Mahabharata of which more than 110 slender volumes have so far appeared is an ambitious project begun in 1968.

Poets whose work has mostly appeared independently of the Writers Workshop are fewer in number. Among these are Keshav Malik (Rippled Shadow; Storm Warning); Satya Dev Jaggi (Homewards; The Moon Voyagers and Other Poems); Syed Ameeruddin (What the Himalaya Said; Bells of Reminiscences); R. Rabindranath Menon (Straws in the wind; Shadows in the Sun) T.V. Dattatreyan (Silver Box, Mail Box and Other Poems), Karan Singh (Welcome, the Moonrise) O.P. Bhagat (Another Planet), Dilip Chitre (Travelling in a age), O.P. Bhatnagar (Feeling Fossils, Angles of Retreat) and I.K. Sharma (The Shifting Sand Dunes). G.S. Sharat Chandra's April in Nanjangud and Once or Twice have both appeared abroad; his first collection, Bharata Natyam Dancer and Other Poems (1966) was published in India.

CONCLUSION :

The fecundity of post-Independence Indian English poetry is thus amazing, but the quality of its minor verse does not match its abundance of output. A large part of the verse written during recent years is merely clever and frequently offers only slick verbal concoctions in the putative modernist style which is no more authentic than the imitative romanticism of the earlier

periods. Surprisingly enough, in spite of their professed modernity, some of these versifiers are seen unashamedly 'bleeding barren tears'. There are others who are banal only in a contemporary way. Freed from the restraints of metre, rhyme and form (which their predecessors were compelled to obey) they seem to disregard the inevitable compulsions of rhythm, intelligibility and sometimes even grammar. Fortunately from this versified chaos the work of more than a dozen poets stands out by virtue of its unmistakable authenticity, significance and power.

REFERENCES :

1. BELLIAPPA M. and TARANATH R. The Poetry of Nissim Ezekiel, Calcutta: Writers Workshop, 1966.
2. KARNANI, CHETAN, Nissim Ezekiel, New Delhi: Arnold- Heinemann, 1974.
3. MOKASHI-PUNEKAR, S.P. Lal: An Appreciation, Calcutta: Writers Work-shop, 1968.
4. AMEERUDDIN, SYED (ed.). Indian Verse in English, Madras: Poet Press Indian, 1977.
5. BHATNAGAR, O.P. and URS, VIKRAMARAJ, (eds.) New Dimensions in Indo-English Poetry, Mysore: Commonwealth Quarterly, 1980.
6. BHUSHAN, V.N. (ed.), The Peocock Lute, Bombay: Padma Publicaions, 1945.
7. CHIDA, A.R. (ed.), Anthology of Indo-Anglian Verse, Hyderabad: The Author, 1935.
8. DESHPANDE, GAURI (ed.), An Anthology of Indo-English Poetry, Delhi: Hindi Pocket Books, n.d.
9. DUNN, T.O.D. (ed.), A Bengali Book of English Verse, London: Longmans, Green & Co., 1918.
10. Lal P. and RAO, K. RAGHAVENDRA (ed.), Modern Indo-Anglian Poetry, New Delhi: A. Chaya Devi, 1959.

Dr. GAGAN KUMAR PATHAK, Asst. Prof., R.S.P. College, Jharia

শক্তির পদ্যের অঙ্গসজ্জা

সোমা মুখার্জি

যে মর্জিতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা কবিতা রবীন্দ্র ঘরানাকে থেকে বেরিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর প'ড়ো জমিতে মাটির গন্ধে নতুন রূপ নিয়ে পাঠকের হৃদয়ে বিষয়ের আত্মতায় ধরা দিল, দীর্ণ বিপন্ন মূল্যবোধ বিসর্জিত এই যুগে নতুন চেতনা নিয়ে এলেন নতুন কবির দল; বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গ-সজ্জায়ও এঁরা সমন্বয় ঘটালেন। উত্তর কালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও বৈচিত্রে, প্রাচুর্যে এবং মৌলিকতায় বিশিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। কবিতা নির্মাণ যে সুচিন্তিত ও সচেতন একটি প্রক্রিয়া সে বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা ছিল নিখুঁত মিল, ছন্দ ও মাত্রা বজায় রেখে তৈরি। কবিতাটি একটি চতুর্দশপদী কবিতা। নাম 'যম'।

শক্তি গদ্য কবিতা এমন একটা সময় লিখতে শুরু করেন, যখন এই রীতি তেমন সহজলভ্য ছিল না। যেমন, সুবর্ণরেখার জন্ম, জরাসন্ধ প্রভৃতি। কিন্তু প্রকাশভঙ্গি, ভাষা, শব্দ, পরিমিতিবোধ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সচেতনতা আমাদের মুগ্ধ করে। কবিতা অনুবাদের মতো সুকঠিন কাজেও তিনি সফল। অর্থের যথার্থতা মেনে সুশ্রাব্য শব্দ নির্বাচনের দ্বারা তিনি কবিতা অনুবাদ করেছেন। শক্তি কবিতায় ম্যাজিক সৃষ্টি করেছেন। কখনো রহস্যের আবহ ঘনিয়ে তুলেছেন, কখনোবা অর্থ অতিক্রান্ত আবেশ জাগিয়ে তুলেছেন প্রতীকী শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে।

শক্তির কবিতায় তৎসমপ্রীতি লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি গ্রাম্য ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। তৎসম শব্দের ব্যবহারে কবিতার পেলব শরীরে গাম্ভীর্য ছেয়ে গেছে। যেমন,—

'যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল, চোখদুটি রিক্ত হ্রদের মতো কৃপণ করুণ' (জরাসন্ধ)

রেখাঙ্কিত তৎসম শব্দগুলি কীভাবে কবিতার শরীরকে সংহত করেছে তা কাব্য প্রেমিক মাত্রই অনুধাবন করতে পারেন।

শক্তি একশব্দ বিশিষ্ট বিশেষণ ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন। সেইসব শব্দ বেশিরভাগই তৎসম। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা চলে,—

'অনঙ্গার অন্ধকার' (সুবর্ণরেখার জন্ম)

'অবগুন্ঠিত সড়ক' (কারনেশন)

'অরব পুকুরে' (ওই)

'কেলাসিত আনন্দের গান' (চিত্রকল্প অনন্তকাল)

'অচিতা অনল' (চতুরঙ্গ)

—এই সাবলীল উপমার ব্যবহার চমক জাগায়।

বিশেষ্য তৎসম শব্দের প্রয়োগও আমাদের মুগ্ধ করে তোলে। 'কনীনিকা দৃষ্টিপাতমালা' (শৈশবস্মৃতি) এখানে 'কনীনিকা' শব্দটিতে দৃষ্টির গাঢ়তা পরিব্যাপ্ত।

'ভস্মভার মরীচি ভার শূন্য নদীতটে।' (ভ্রান্তি)—শূন্যতার বাতাবরণ যেন ছেয়ে গেছে, মরীচিকা বিভ্রম যেন পরিকীর্ণ 'মরীচি' শব্দে। তৎসম শব্দের ব্যবহারে শক্তি তার কবিতার ধ্রুপদী মেজাজ সৃষ্টি করতে পেরেছেন বেশ কিছুটা।

দেশজ শব্দের প্রয়োগ, কথ্যচাল, বাগ্‌রীতি, মুখের ভাষার ব্যবহার প্রথমদিকে কিছু কম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর ব্যবহারে শক্তি বাধাহীন, দ্বিধামুক্ত। যেমন ব্যবহার করেছেন,—ধানের নাড়া, ডুবো জলে তেচোখো মাছে আঁশগন্ধ(জরাসন্ধ), সারারাত ম্লান মেছো বক ছিলো পুকুরের পাশে (কারনেশন), ফেঁপে, ফাঁসা, বিড়ে, মাড়, বোঁচা, দুমড়ে (জন্মও পুরুষ), যৌবনের হল্‌কা (বাহির থেকে), হাওয়ার মধ্যে কাঁট দিতে চাই বিশ্বভুবন জাঙাল (বদলে যায় বদলে যায়), দেহের পিদ্দিমে (আলো জ্বালতে পারলে) প্রভৃতি দরিদ্র পল্লীবাসীদের অকৃত্রিম গ্রাম্য ভাষার মেজাজ ফুটে উঠেছে কবিতাগুলিতে। শহুরে কথ্য ভাষায় বেশ কিছু ককনি শব্দও ব্যবহার করেছেন কবি।

অশালীন, জুগুপ্সা ও ঘৃণা উদ্রেককারী শব্দও তিনি ব্যবহার করেছেন। যেমন, —যোনির মাড়ির খিল হাট করা (জল ও পুরুষ), শুয়ে বলে হিসি করে' (সুখে থেকো), মাগ-ভাতারে বদু বুড়ো (এবার আমি), ভরপোয়াতির উবদো পেটে নড়ছে নড়ুক (ভুল থেকে গেছে), সিঁড়িতে ছাগলনাদি (বাড়ি ছেড়ে), মামড়ি, পিচুটি (তখনো রিয়াং খোলা থেকে) ইত্যাদি।

বড়ো কবি বহু ব্যবহৃত ক্লান্ত শব্দকে যেমন জাগিয়ে তোলেন, তেমনি শব্দ নিয়ে খেলতে খেলতে সৃষ্টি করেন নতুন নতুন শব্দ বা শব্দকে ওলট পালট করে ফেলেন। আর এই অপ্রচলিত ব্যবহারে কবিতার ব্যঞ্জনা বৃদ্ধি পায়। যেমন—আপাদমাথা উন্মাদনা লিখেছেন 'এক দেশে সে মানুষ' কবিতায়। 'আপাদমস্তক' শব্দটিকে করলেন 'আপাদ মাথা'। এছাড়া, —আনখ সমুদ্দুর (আনন্দ ভৈরবী) আনখ হলুদ (১২ সংখক, চতুর্দশপদী কবিতাবলী), আজানকেশ (যখন বৃষ্টি নামলো), অচিতা অনল (চতুরঙ্গে),পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস (আবনী বাড়ি আছো) অব্যর্থভাবে আধুনিক। কখনো আপাত অর্থহীন শব্দ 'ফ্যানজোলেঙ্গা' ব্যবহার করতে দেখি কবিতায়। 'হৃদয়পুর' শব্দটিও অসাধারণ। আসলে সীমা লঙ্ঘন শক্তির একটি প্রধান চারিত্রিক ও শৈল্পীক বৈশিষ্ট্য। তাই কবি শব্দ সন্ধানী। প্রভু নষ্ট হয়ে যাই, জ্বলন্ত রুমাল, অস্ত্রের গৌরবহীন একা কবিতাগুলিতে তাই কবি খোঁজেন শব্দ।

দেশি ও বিদেশি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা যায় তাঁর কবিতায়।

যাবো সে কমলাপুলি'

—এখানে 'কমলাপুলি' শব্দের দেশজ সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে।

'কখনো বুকের মাঝে ওঠে গ্রীস'

—এখানে গ্রীস বিদেশি এব্দ। এছাড়া আরবি, ফারসি শব্দের (যেমন—লস্কর, মেওয়া, কর্নিক) ব্যবহারও লক্ষ করা যায়।

বাংলা কাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবি তাঁর একটি কবিতায় চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম ভাষার পুনরায় ব্যবহার করে লিখেছেন,—

কা এ অকানা ন তুটই মানা বি অহারেই

(অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে, নং ৪৬)

ব্রজবুলির ছাপও লক্ষ্যণীয়—

মৃদঙ্গ বাজত দেখি নাচত চন্দন

(হে প্রেম হে নৈঃশব্দ, মুকুর)

বাংলা বাগ্‌ধারার প্রয়োগও দেখা যায় শক্তির কবিতায়।

গাছের খই তলার কুড়োই মানসিকতা

(বাগান কি তার প্রতিটি গাছ চেনে?)

চাবি (ধর্মে আছো জিরাফেও আছে) কবিতায় চলিত ও সাধুর মিশ্রণ লক্ষ করা যায়। শক্তি আসলে শব্দকে অর্থের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘর্ষে পাতায় পাতায় দাবানল সৃষ্টি করতে। তাই আমাদের সযত্ন লালিত ভাষা সংস্কার খসে পড়ছে কবিতার অন্তরমহলে প্রবেশ করে।

কবিতার আঙ্গিক ও ছন্দ সম্পর্কে শক্তি বিশেষ ভাবে সচেতন ছিলেন। প্রথাগত ছন্দকে মাঝেই মাঝেই ইচ্ছাকৃত ভাবে শিথিল করেছেন তিনি। কাব্য জগতে ছন্দ সচেতন কবি হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেন। ছন্দের ত্রিধারাকে তিনি সুদক্ষতার সাথে প্রয়োগও করেন। এর সাথে শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পের যথাযথ ব্যবহার তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এক অনন্য মাত্রা। কলাবৃত্তে শক্তি অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। পাঁচমাত্রা পর্বে রচিত তাঁর মুক্তক ধর্মী কবিতা,—

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া ৫/৫/২

(অবনী বাড়ি আছে?/ ধর্মে আছো জিরাফেরও আছো)

ছয়কলা পর্বের কলাবৃত্ত,—

আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি ৬/৬/২

(আনন্দ ভৈরবী/ধর্মে আছো জিরাফেও আছো)

সাতমাত্রা পর্বের কলাবৃত্তও অপেক্ষাকৃত কম,—

কোথায় রাখি তাকে ৭
দুহাতে ঢাকি থাকে ৭
(অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকার/৯০ সংখ্যক পূর্ণ কবিতা)

যুক্ত বর্ণাশ্রিত সপ্তকল পার্বিক কবিতা—

মরি না লজ্জায়, ৭
বেঁচে থাকি, আর ৬
স্নিগ্ধ পারাবার। ৭

চতুর্দল পর্বের কলা-পর্বের একটি কবিতা,—

মেয়েটির মতো কিছু ছোটো ছেলে ৪ + ৪ + ৪
আমলকি বনে এলো খেলা ফেলে ৪ + ৪ + ৪

কলাবৃত্তের তুলনায় শক্তি মিশ্রবৃত্তে ও দলবৃত্তের ব্যবহার অনেক বেশি করেছেন। মিশ্রবৃত্তে তিনি কম বেশি দেড় শতাধিক সনেট লিখেছেন, বেশ কিছু দশমাত্রক পংক্তির কবিতা লিখেছেন। মুক্তকের নিদর্শনও বেশ কিছু আছে। এছাড়া মিত্রাক্ষর পয়ার ত্রিপদীও রয়েছে। শক্তি এই তিন রীতির ছন্দের প্রধানত চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে মাঝে মাঝে সচেতন ভাবে সাধুভাষাও প্রয়োগ করেছেন,—

আমার বক্ষের মাঝে ভাসি যাও, ধরিতে দিব না
(চতুর্দশপদী কবিতাবলী/৭ নং কবিতা)

মিশ্রবৃত্তে কবি দশমাত্রা ব্যবহার করেছেন কখনো,—

বাতাসে চন্দন গন্ধ, ঢেউ
(উড়ন্ত সিংহাসন/ আমাকে সৌভাগ্য দাও পিতা)

৬, ৮, ১২, ১৪ মাত্রার মিশ্রবৃত্তও কবি লিখেছেন। তবে দশ বা আঠারো মাত্রা বেশি পছন্দ ছিল তাঁর।

দলবৃত্তে শক্তি যেমন গভীর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, তেমনি আবার কৌতুকের মেজাজে, হাল্‌কা ছড়ার আঙ্গিকের বেশ কিছু পদ্যও রচনা করেছেন। পয়ারাঙ্গেও দলবৃত্ত রচনা করেছেন,—

মেঘলা দিনে দুপুর বেলা যেই পড়েছে মনে (বাঘ/প্রভু-নষ্ট হয়ে যাই)

শক্তি চতুর্দল পার্বিক দলবৃত্ত এবং পঞ্চ বা ষট্‌কল পার্বিক কলাবৃত্তের মিশ্রণ ঘটাতে দ্বিধা করেননি। একটি দলমাত্রক ত্রিপদীর উদাহরণ—

ফুরালো দিন ফুরালো বেলা ৮ + ৮ + ৮
সকল অর্থে ভাঙলো মেলা

সমাচ্ছন্ন ত্রাসে
(সখা/হে প্রেম হে নৈঃশব্দ)

অলঙ্করণের অন্যতম প্রধান উপকরণ ধ্বনিমিল। পদ-পংক্তির শেষে, লাইনের সূচনায় বা কয়েকটি লাইনে সমগ্রভাবে এই ধ্বনিমিল লক্ষ করা যায়।

'সোনার মাছি খুন করেছি'র ছন্দটা একটু অদ্ভুত ধরনের। ওই ধরনের কবিতা ছড়ার ছন্দে হয় না। ওটা ছড়া, কিন্তু কোনও কোনও জায়গায় ছ'মাত্রাও ঢুকিয়ে দিয়েছেন কবি। কোনও কোনও জায়গায় আবার পাঁচ মাত্রা। ঠিক স্বরবৃত্তে নয়। ওখানে অদ্ভুত ধরনের একটা ভাষার গতি লক্ষ করা যায়। কবির স্বভাষ্যে তার প্রমাণ মেলে।

ছন্দের সাথে অলংকার প্রয়োগেও দেখি দক্ষ সচেতন শিল্পীকে। অনুপ্রাস, উপমা প্রয়োগে তিনি সিদ্ধ হস্ত।

কাঁচার লতা, আমরুলের পুঞ্জ-পুঞ্জ নীল অম্লতা —এখানে অনুপ্রাসের অসামান্য প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

পুনরুক্তি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার প্রকরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে তার কবিতা যেমন আবেগ অনুভূতির তীব্রতা লাভ করেছে, তেমনই তা হয়ে উঠেছে শ্রুতিসুখকর ও আবৃত্তিযোগ্য।

শব্দ নির্বাচন ও তার বিন্যাসে তিনি চমক সৃষ্টি করেছিলেন। কবিতার শিল্পরূপ তথা নন্দন ছিল আপাত শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারী। কবিতা ছিল তাঁর কাছে 'নিজেকে নিজের মতো করে দেখার চমৎকার জলজ দর্পণ'। এই আত্ম-সন্ধানেই শক্তি বারবার তত্ত্ব বা দর্শনের সীমা ভেঙে উন্মোচন করেছেন নতুন নতুন প্রকোষ্ঠ, নির্মাণ করেছেন কবিতার নতুন অঙ্গসজ্জা—যেন এক অনন্য ভাস্কর ঃ গোলা গোদা গ্রাম্য কথায় কুঁদে কুঁদে নতুন গঠন দিয়েছেন কবিতার—যেখানে তাঁর মেধা ও মননের প্রাচুর্যতা আমাদের বিস্মিত করে।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থঋণ ঃ

১। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা
২। মৃত্যুর পরেও যেন হেঁটে যেতে পারি—কুন্তল চট্টোপাধ্যায়
৩। শক্তির পদ্য, পদ্যের শক্তি—অলকা বিশ্বাস
৪। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা—সম্পাদনা প্রদীপ ভট্টাচার্য
৫। এক অক্ষৌহিনী বৃষ্টি রেখা—গীতা চট্টোপাধ্যায়
৬। আমার ভিতর ঘর করেছে লক্ষ জনার—মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
৭। সাহিত্য সেতু (শক্তি চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা) ২৯ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ১ লা আষাঢ় ১৪০২
৮। যুবমানস (এপ্রিল-মে ১৯৯৫)—সম্পাদক সৌমিত্র লাহিড়ী

সোমা মুখার্জি, গবেষক, শিক্ষিকা

এরা বিছানায় – তুমি জেগে উঠবেনা, সকালবেলা তোমার পায়ের
কাছে মরা প্রজাপতির মতো এরা লুটোবে। এদের আত্মা মিশে
থাকবে তোমার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে, চিরজীবনের মতো
বহুদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে ঝর্ণার জলের মতো
হেসে উঠবে, কিছুই না জেনে। নীরা, আমি তোমার অমন
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করব মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।
তুমি জানতে পারবে না – তোমার সম্পূর্ণ শরীরে মিশে আছে
আমার একটি অতি ব্যক্তিগত কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা।

জ্যোৎস্নার মায়াজালের স্বপ্নে নীরা কবিকে করে লোভহীন। কিন্তু যৌবনের দীপ্তি, কামনার তীব্র আবেগ, ভোগস্পৃহার অনাবৃত বর্ণনা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'শরীর তাঁর কবিতায় যৌন আবেদন নিয়েও শিল্প হয়ে ওঠে। তবে তাঁর নীরা কেন্দ্রিক সব কবিতাগুলিতে শরীরী কামনা-বাসনার প্রকাশ নেই। সেক্ষেত্রে প্রেমের রোমান্টিক আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবনানন্দের বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, সুরঞ্জনা কিংবা বুদ্ধদেব বসুর দময়ন্তী, কঙ্কাবতীর মতো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও নীরার মধ্যে প্রেমের ব্যাকুলতা, জীবন পিপাসা খুঁজেছেন।' কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে শরীরী ভাষার বদল ঘটান। শরীরকে শিল্পে পরিণত করেন। নীরার শরীরের রহস্যময় ভালোবাসার বন্ধনে কবি পৃথিবীর কদর্যতাকে ঠেলে মুক্তির সন্ধান করেন। তাই নীরার ভালোবাসা যেন মানব সভ্যতার জন্য খুব প্রয়োজন ছিল। ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতাকে আবার অমরত্ব দিতে পারে নীরার প্রেম। তাই কবি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন ঃ

তুমি ধন্য, তুমি ইয়ার্কি, অজ্ঞান হবার আগে তুমিই সশব্দ
অভ্যুত্থান, তুমি নেশা, তুমি নীরা, তুমিই আমার ব্যক্তিগত
পাপমুক্তি। আমি আজ পৃথিবীর উদ্ধারের যোগ্য।
('নীরা ও জীরো আওয়ার' / আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি)

এখানে কবি নীরার প্রেম পান করে পাপমুক্ত হতে চান।

এই নীরা অসুস্থ হলে কবি বড় দুঃখে থাকেন। বিষণ্ণ কবি হৃদয়ে জগৎ সংসারের প্রতিটি মুহূর্ত তখন কবির কাছে অসহ্য। নীরার অসুখ আসলে সমাজের অসুখ। ঘুন ধরা সমাজ ব্যবস্থার অসুস্থতার সঙ্গে কবি প্রেয়সী নীরার অসুস্থতাকে একাকার করে দেন। তাই নীরার অসুখ হলে কলকাতায় সবাই বড় দুঃখে থাকে।

অফিস, সিনেমা, পার্কে লক্ষ লক্ষ মানুষের মুখে রটে যায় নীরার অসুস্থতার খবর। এ অসুস্থতা প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার অসুস্থতা –

আকাশে যখন মেঘ, ছায়াচছন্ন গুমোট নগরে খুব দুঃখ বোধ
হঠাৎ ট্রামের পেটে ট্যাক্সি ঢুকে নিরানন্দ জ্যাম চৌরাস্তায়
রেস্তোরায় পথে পথে মানুষের মুখ কালো, বিরক্ত মুখোশ
সমস্ত কলকাতা জুড়ে ক্রোধ আর ধর্মঘট, শুরু হবে লন্ডভন্ড
টেলিফোন পোস্টাফিসে আগুন জ্বালিয়ে
যে-যার নিজস্ব হৃৎস্পন্দনেও হরতাল জানাবে –
আমি ভয়ে কেঁপে উঠি, আমি জানি, আমি তৎক্ষণাৎ ছুটে যাই, গিয়ে বলি,
নীরা, তুমি মন খারাপ করে আছো?
('নীরার অসুখ' / বন্দী জেগে আছো)

নীরার প্রেম ভালোবাসা, হাসি, অশ্রু, ইচ্ছে, জীবন এবং জীবনের মর্ম সত্যকে উপলব্ধি করেন কবি। নীরার অভিমানের কলস্বর উত্তর সমুদ্র থেকে উড়ে আসে কবি হৃদয়ে। নীরার শরীর ভ্রমণ করে কবি স্বর্গ সুখ পেতে চান। অকপট বর্ণনায় কবি নীরাকে পেতে চান নিজের করে। যেখানে কখনও নীরাকে যমুনা বলে সম্বোধন করেছেন। প্রেমের স্বর্গরাজ্যে নিজেকে 'পাপী' সম্বোধন করেন কবি। নারী সৌন্দর্য এবং যৌবনের উচ্ছ্বাসের কামনাতে নীরাকে পেতে চান একান্ত করে ঃ

ভ্রমণে শয়নে তুমি সকল গ্রন্থের যুক্ত প্রণয় পিপাসা
চোখের বিশ্বাসে নারী, স্বেদে চুলে, লোভের ধুলোয়
প্রত্যেক অণুতে নারী, নারীর ভিতরে নারী, শূন্যতায় সহাস্য সুন্দরী,
তুমিই গায়ত্রী ভাঙা মনীষার উপহাস, তুমি যৌবনের
প্রত্যেক কবির নীরা, দুনিয়ার সব দাপাদাপি ক্রন্দলোভে
ভুল ও ঘুমের মধ্যে তোমার মাধুরী ছুঁয়ে নদীর তরঙ্গ
পাপীকে চুম্বন করো তুমি, তাই দ্বার খোলে স্বর্গের প্রহরী।
('প্রবাসের শেষে' / বন্দী জেগে আছো)

নীরাকে তাই কোনো ঘাতকের হাতে তুলে দিতে চান না। ঘাতকরূপী কোনো মানুষ নীরাকে আদর করতে পারেনা। নীরাকে ভালোবাসতে হলে তাকে প্রেমিক হতে হবে। নীরা ঘাতকের সভ্যতায় নয় বরং প্রেমের সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। 'আমার স্বপ্ন' কাব্যের 'ছায়া' কবিতায় কবি লিখেছেন –

হিরণ্ময়, তোমার দিব্য বিভা নেই, জামায় একটা
বোতাম নেই, ছুরিতে হাতল নেই,
শরীরে এত ঘাম, রক্তে এত হর্ষ,

প্রসঙ্গ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নীরা

পুতুল বৈদ্য

শুধু কবিতার জন্য যিনি অমরত্বকে তাচ্ছিল্য করে প্রেমের নিভৃত শিল্পে, পণ্যে, পিপাসায়, লোভে নিপুণ চেষ্টায় হৃদয়ের নির্বিকার পটে আঁকেন নীরার ছবি, তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বিষয় বৈচিত্র্যের মহিমায় তাঁর কবিতা মহিমান্বিত হলেও রোমান্টিকতা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার মূল বিষয় ভাবনা। যেখানে রোমান্টিকতা এবং নীরা তাঁর কবিতায় যেন দুই সখী। যদিও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট যমুনা, গায়ত্রী কিংবা অরুন্ধতি নাম্নী নারী চরিত্রগুলিও অভিনব এবং বৈচিত্র্যময়। তাসত্ত্বে নীরা চরিত্রকে কবি যেন আলাদা করে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন। কেননা, এই নীরাকে যেন সহজে খোঁজেনি কেউ। তাকে কেউ বোঝেনি সহজে। শুধুমাত্র সে যেন কবি সুনীলের হৃদয়ে ধরা দেবার জন্য সবারই অগোচরে ছিল।

বিস্ময়কর রূপকল্পে মনোহর কাব্যময়তায় 'নীরা'-সিরিজের কবিতাগুলি রোমান্টিক চিত্রময়তায় ভাস্বর। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' থেকে নীরার আবির্ভাব। কবিতা রচনার সূচনা লগ্ন থেকে আরম্ভ করে তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'সেই মুহূর্তে নীরা'-তেও সেই নীরার সঙ্গে চকিতে দেখা হয় পাঠকের। বলা যায় কবি সুনীলের সৃষ্ট নীরা আপাদ মস্তক অর্থাৎ কৈশোর-যৌবন এবং বার্ধক্যতে কবিকে রোমান্টিক ভাবনার জগতে শস্যের শিল্প কলায়। বিপুল কবিতা রচনার বিষয় সম্ভারের মধ্যেও কবির 'নীরা'-সিরিজের কবিতার সংখ্যা নেহাত কম নয়। প্রায় সাড়ে তিন ডজনের উপরে কবিতায় কবি নীরার চিত্র অঙ্কন করেছেন। তাঁর সবচেয়ে পরিচিত এবং জনপ্রিয় কবিতা 'হঠাৎ নীরার জন্য' থেকে নীরার সূচনা। এরপর একে একে 'নীরা তোমার কাছে', 'এক সন্ধ্যাবেলা আমি', 'নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা', 'মায়াজাল', 'নীরা ও জীরো আওয়ার', 'নীরার অসুখ', 'অরূপ রাজ্য', 'নীরার হাসিও অশ্রু', নীরার পাশে তিনটি ছায়া', 'কৃতঘ্ন শব্দের রাশি', 'যা ছিল', 'নীরার দুঃখকে ছোঁয়া', 'ছায়া', 'ভুল বোঝাবুঝি', 'সত্যবদ্ধ অভিমান', 'খন্ডকাব্য', 'বয়েস', 'নীরার কাছে', 'সারাটা জীবন', 'শিল্প', 'মিথ্যে নয়', 'নীরার কৌতুক', 'মুহূর্তের দেখা', 'নীরা তুমি কালের মন্দিরে', 'নীরা, গৌতম বুদ্ধ', 'নীরাকে দেখা', 'নীরা, হারিয়ে যেও না', 'যার জন্য সারা জীবন', 'শিল্প নয়, তোমাকে চাই', 'অনেক বসন্ত খেলা', 'সেই মুহূর্তে নীরা', 'প্রথম প্রশ্ন', 'বারবার প্রথম দেখা' প্রভৃতি কবিতায় নীরার উত্থান-পতন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নীরা' তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত নারী থেকে সমগ্র

প্রেমিককূলের স্বপ্নের কিংবা বাস্তবের নারীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই নীরা জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো রহস্যময়ী নয়। বরং নীরা হালফ্যাশানের আধুনিকা যুবতী। যাকে বাসের জানালার পাশে সহাস্য মুখে বসে থাকতে দেখা যায়। কিংবা লাইব্রেরীর মাঠে অথবা অফিসের লিফ্‌টের দরজার সামনে। সেই নীরা কবির ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে মিশে থাকে বহুক্ষণ ঃ

এক বছর ঘুমোবো না, স্বপ্ন দেখে কপালের ঘাম
ভোরে মুছে নিতে বড় মূর্খের মতন মনে হয়
বরং বিস্মৃতি ভালো, পোশাকের মধ্যে ঢেকে রাখা
নগ্ন শরীরের মতো লজ্জাহীন, আমি
একবছর ঘুমোবো না, এক বছর স্বপ্নহীন জেগে
বাহান্ন তীর্থের মতো তোমার ও-শরীর ভ্রমণে
পুণ্যবান হবো। (হঠাৎ নীরার জন্য' / আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি)

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এখানে হিন্দুধর্মের মিথকে পুনর্নির্মাণ করলেন। দেবী কালীর যে একান্ন পীঠ রয়েছে যেখানে ভক্তগণ ভ্রমণ ও পূজা দিয়ে নিজেদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে চায়। আর কবি তাঁর প্রেমিকা নীরার শরীর ও মন ভ্রমণে পুণ্যবান হতে চেয়েছেন। নীরার শরীরকে বাহান্ন তীর্থ বলেছেন কবি। দেবী কালীর একান্ন তীর্থের চেয়েও নীরার হৃদয়-প্রেম-শীররকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একধাপ এগিয়ে বাহান্নতীর্থের কথা বলেন। তিনি যেন শুধুমাত্র নীরার জন্য আরো দীর্ঘ স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে নীরাকে পেতে চান। আঁধার রাত্রির রাজপথে শূন্য হৃদয়ে কবি নীরার ভালোবাসার মুখাপেক্ষী।

কবির স্বপ্নের মধ্যে নীরা খেলা করে। হাসে, কাঁদে, আদর করে। না লেখা কবিতা গুলোর ভাষাকে সাজিয়ে দেয়। নদীর পাড়, শুকনো পাহাড়, ধুলোয় ভরা গ্রন্থ, মরা দামোদর সবকিছু কবি মনের আয়নায় ফুটিয়ে তোলে নীরা। কবি সুনীলের কবিতার প্রতিটি শব্দের আত্মা জুড়ে নীরা। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জীবন-মরণ সবই যেন নীরার জন্য। নীরা কবির উষ্ণতা, তীব্র আকাঙ্ক্ষা, চাপা আর্তরব, আবেগ। কবির মতো কবিতার ভাষারাও নীরাকে আদর করে। কিন্তু নীরার এমনই রূপ যে কবিতার ভাষারা মরা প্রজাপতির মতো লুটোয় তার পদতলে। কবি কল্পনার মোহমুগ্ধময় ভাষার আত্মারা নীরার শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে মিশে থাকে আমরণ। 'আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি' কাব্যগ্রন্থের 'নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা' কবিতায় কবি তাই লেখেন ঃ

তোমার শিয়রের কাছে যাবে – এরা তোমাকে চুম্বন করলে
তুমি টের পাবেনা, এরা তোমার সঙ্গে সারারাত শুয়ে থাকবে

চোখে অস্থিরতা

একোন্ ঘাতকের বেশে তুমি দাঁড়িয়েছো?
ঘাতক হওয়া তোমাকে মানায় না
তুমি বরং প্রেমিক হও

প্রেমহীন হিংস্র ঘাতকের সত্তাতে নীরা ভালোবাসার জোয়ার বইয়ে দিতে পারে। অথচ হিরন্ময় তার সামনে কেনোইবা ঘাতকের বেশে দাঁড়াবে। বরং তার প্রেমিক হওয়া মানায়।

'সত্যবদ্ধ অভিমান' কবিতায় কবি নীরাকে এক অন্যমাত্রায় রূপদান করেন। কবির হাত নীরার মুখ স্পর্শ করেছে সেই হাতে তিনি আর কোন পাপ করতে পারেন না। কবির ওষ্ঠ উচ্চারণ করেছে নীরাকে ভালোবাসার কথা। সুতরাং তিনি আর কোন মিথ্যে বলতে পারেন না। নীরব ভালোবাসার কাছে, নীরা-হৃদয়ের পবিত্রতার ছোঁয়ায় তিনিও পুণ্যবান-শুদ্ধতম পুরুষে পরিণত হন। তাই কবি-মন ভালোবাসার অঙ্গীকারে সত্যবদ্ধ উচ্চারণ করে –

এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ
আমি কি এ হাতে আর কোনোদিন
পাপ করতে পারি?
এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে, ভালোবাসি –
এই ওষ্ঠে আর কোনো মিথ্যে কি মানায়?

কবি নীরার জন্য কবিতা লিখতে চান। স্পর্শ করতে চান নীরার হৃদয় সত্যকে। পৃথিবীর সত্যের প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়ার মতো নীরা-র ভালোবাসার সত্যও বদলে যায়। নীরাকে কবি তাঁর জীবনের যোগ্যতম কবিতা রূপে অঙ্কন করতে চান। কবির জীবন সন্ধানে, আত্মত্যাগে নয়, সর্বগ্রাসে সর্বভুক কবিতার জন্য নীরাকে প্রস্তুত করেন। কবি দিকভ্রান্ত জীবনে নীরার হাত ধরে চিরযৌবন হয়ে থাকতে চান। তাই তিনি তাঁর 'জাগরণ হেমবর্ণ' কাব্যের 'বয়েস' কবিতায় লেখেন –

নীরা, শুধু তোমার কাছে এলেই বুঝি
সময় আজো থেমে আছে।

কিংবা 'ভালোবাসা খণ্ডকাব্য' -এর 'নীরার কৌতুক' কবিতায় –

এক এক সময় আমি অসহিষ্ণুভাবে বলি,
খুকী, জীবনটা শুধু ভালোবাসার ছেলে খেলা নয়!
নীরা লঘু কৌতুকে উত্তর দেয়, ভালোবাসার ছেলে খেলা ছাড়া
আর সব তুচ্ছ!

নিসর্গ প্রকৃতির আত্মা জুড়ে নীরার উপস্থিতি টের পান কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

'নীরা, তুমি কালের মন্দিরে', 'অনেক বসন্ত খেলা', 'সেই মুহূর্তে নীরা', 'বার বার প্রথম দেখা' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে সেই দৃশ্যপট অঙ্কিত। কবি অক্ষরবৃত্ত, মন্দাক্রান্তা, মুক্তকছন্দ কিংবা শ্বাসাঘাত ছন্দের আবর্তে নীরাকে কালের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। নীরা সহাস্য নদীর জলের সবুজে মিশে থাকে। বসন্তের শেষ বিকালের নদীর কিনারে সুগন্ধ শয্যায় নীরা যেন স্বর্ণসন্ধ্যা ঘুম ডেকে আনে। শিশির ভেজা ঘাসে নীরার চাঁপা রঙের পা যেন সদ্য ফোটা জুঁই। নীরাকে দেখে ভ্রমর ফুলকে ছেড়ে তাকে ছুঁতে চায়। নীরার হাসি ঝর্ণার মতো। মেঘ ভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়। নতুন বসন্তের বৃক্ষের পাতার মতন নীরার চোখের আলো। নিসর্গ প্রকৃতির প্রতিচ্ছায়ায় নীরা চরিত্রকে অভিনব করে তুলেছে –

১. কলমের যে-টুকু পরিধি তুমি তাও তুচ্ছ করে
বসি যাও, নীরা, তুমি কালের মন্দিরে
ঘন্টাধ্বনি হয়ে খেলা করো, তুমি সহাস্য নদীর
জলের সবুজে মিশে থাকো, সে যে দূরত্বের চেয়ে বহুদূর
তোমার নাভির কাছে জাদুদণ্ড, এ কেমন খেলা
জাদুকরী, জাদুকরী, এখন আমাকে নিয়ে কোন রঙ্গ
নিয়ে এলি চোখ-বাঁধা গোলক ধাঁধায়।
('নীরা কালের মন্দিরে' / বাতাসে কিসের ডাক, শোনো)

২. শিশির-ভেজা ঘাসে তোমার চাঁপা রঙের পা
তোমার চোখে চোখ রেখেছে
সদ্য ফোটা জুঁই
সেই মুহূর্তে নীরা, তুমি টেরও পেলেনা
ফুলকে ছেড়ে ভ্রমর বলল,
কিশোরীটিকে ছুঁই!
('সেই মুহূর্তে নীরা' / সেই মুহূর্তে নীরা)

৩. জুঁই ফুলটি চেয়ে আছে, সদ্য-জন্মানো ঝর্ণার মতন হাসছে
একটি ঝর্ণার পাশেই বারবার নীরাকে আমার প্রথম দেখা
মেঘভাঙা দ্যুতি এসে পড়েছে তার চিবুকের রেখায়
নতুন বসন্ত-বৃক্ষের পাতার মতন তার চোখের আলো
তার বুকে দুলে দুলে উঠছে কৈশোরের সমুদ্র-বান
নীরার ডাক এসেছে, মেঘ, নিরুদ্দেশ যাও
('বারবার প্রথম দেখা' / ভোরবেলার উপহার)

'নীরা'-সিরিজের কবিতাগুলিতে রোমান্টিকতা, নিসর্গচেতনার পাশাপাশি বেশ

কিছু কবিতাতে কবির সমাজভাবনার প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। 'নীরা, গৌতম বুদ্ধ', 'নীরা, হারিয়ে যেওনা', 'যার জন্য সারা জীবন' প্রভৃতি কবিতায় কবি নীরার ছবি অঙ্কন করতে গিয়ে নিষ্ঠুর সমাজের কদর্যতার ছবি আঁকেন। ভারত-পাকিস্তানের পাঞ্জাব সীমান্তের যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে তিনি গৌতমবুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। জীর্ণ সভ্যতার কম্পিত মুখচ্ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর প্রেয়সী নীরার মুখ চুম্বন করার অধিকার দেন গৌতম বুদ্ধকে। এখানে গৌতম বুদ্ধ শান্তি-সম্প্রীতির বার্তা বাহক যা নীরার হৃদয়ের মধ্যে খোঁজেন তিনি। তাই কবি 'নীরা, গৌতম বুদ্ধ' কবিতায় উপলব্ধি করেন –

ঠিক তখনই একটা নীল বিদ্যুতের শিখা আকাশের একপ্রান্ত
থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেলে
এক মুহূর্তের জন্য ঝলসে ওঠে গৌতম বুদ্ধের দুটি চোখ
তারপরই এক ঝাঁক বিমান সুগম্ভীর শব্দ করলে বুঝতে পারি
সশস্ত্র বিমান যাচ্ছে
প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে

আবার কলকাতার দাঙ্গার রক্তপাতের মধ্যে নীরাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে ভীত কবি। যেখানে রাস্তায় বসে লাশের আগুনে পুড়িয়ে খাচ্ছে ধর্ম। কিংবা রক্তবমির মতো ওগরাচ্ছে দেশপ্রেম সেখানে নীরাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। যে মানব সভ্যতায় কেউ আর ভালোবাসার কথা বলে না সেখানে কবি নীরাকে আহ্বান করেন–

এক একবার ডুবে যায়, এক একবার মুখোমুখি এসে বসে
কালিদাসের ভ্রমর ছুঁয়ে দিল তোমার স্ফুরিত ঠোঁট
ঘাসফুল হয়ে আমি তোমার নাভিমূলে জিভরাখি
মণিপি-রানির নারীর মতন তোমার রক্তস্রোতে ঝলমল করে জ্যোৎস্না
একবার আমি শিশু, তুমি চিরকালের জননী
('নীরা হারিয়ে যেওনা' / নীরা হারিয়ে যেওনা)

রুক্ষ জীবন যাপন, নির্মম আত্মবিস্মৃতির মায়াজাল ছিন্ন করে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনের পড়ন্ত বিকেলে শেষ পর্যন্ত নীরার কাছে ফিরে যেতে চেয়েছেন। আবারও নূতন জীবনে। পরপারে যাওয়ার জন্য নীরার চিঠি পান তিনি। শিল্পের জন্য নীরা নাকি নীরার জন্য শিল্প এই দ্বন্দ্ব থেকে যায় কবি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। ভাস্কর্যের জাদুঘরে কবি মনের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত নীরা কবির শান্তির আশ্রয়ভূমি। প্রেমের নীড়। কবি আত্মা নীরাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তাই তাঁর জীবনের দরজার পাশে নীরা এসে হাতছানি দেয়। আর কবিও কেমন চলে যান শুধু নীরার জন্য হঠাৎ করে দেশ-কালকে উত্তীর্ণ করে –

দারজায় আর কে এসে দাঁড়াল, আমি কোথাও নেই
শব্দ তুমি থামো, বাক্ তুমি নিশ্চুপ হও
সমস্ত সুতোর পাক লন্ড ভন্ড করে আমায় উঠে দাঁড়াতে হবে
আমাকে যেতে হবে, আমাকে যেতে হবে...।
('বার বার প্রথম দেখা' / যার যা হারিয়ে গেছে)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'কবিতা সমগ্র১'। প্রথম সংস্করণ, নবম মুদ্রণ, জুন ২০১৪। আনন্দ।

২. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'কবিতা সমগ্র২'। প্রথম সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩। আনন্দ।

৩. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'কবিতা সমগ্র৩'। প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩। আনন্দ।

৪. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'কবিতা সমগ্র৪'। প্রথম সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০১৩। আনন্দ।

৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'কবিতা সমগ্র৫'। প্রথম সংস্করণ, ২০১৫। আনন্দ।

৬. কবিতা প্রতিমাসে। ১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০০৬। প্রতিভাস।

৭. কবিতা প্রতিমাসে। বর্ষ ৩, সংখ্যা ৩, জুলাই ২০০৭, প্রতিভাস।

৮. জীবনানন্দ দাশ। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ। জানুয়ারি ১৯৮৪। ভারবি।

তথ্যসূত্র

১. (সম্পাদনা) বাবুল হোসেন। পালাবদলে আধুনিক বাংলা কবিতা। প্রথম প্রকাশ। জানুয়ারি ২০১২। দে'জ পাবলিশিং।

মোবাইল :৯৪৭৭৪৩৭৬৪১

পুতুল বৈদ্য, আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, বারাশত

उर्मिला की विरह –भावना

निलेश कुमार सिंह

द्विवेदी युग के प्रतिनिधि रचनाकारों में मैथिलीशरण गुप्त का नाम लिया जाता है। 'साकेत' इनकी प्रमुख काव्यकृति है। यह एक प्रबंधकाव्य है, जिसमें विचार और भाषा के साथ शैली का नवीन प्रयोग गुप्त जी करते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति के प्राचीन आदर्शों और वर्तमान युग की विचारधाराओं के बीच सुन्दर सामंजस्य भी दिखाई देता है। साकेतकार भारत के अतीत, गौरव और प्राचीन संस्कृति के परम उपासक हैं और साकेत की कथावस्तु का संबंध भी भारत की प्राचीन संस्कृति से है। इसलिए साकेत में प्राचीन आदर्शों का स्वाभाविक चित्रण भी है। हिन्दी में रामकथा पर कई महाकाव्य लिखे गये, बाल्मीकि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक ने राम के चरित्र को पाठकों के मन में उतारने का प्रयास करते रहे हैं। गुप्त जी ने भी 'साकेत' में रामकथा को आधार बनाते हुए उर्मिला के चरित्र को नायिका की तरह प्रस्तुत कर न्याय करने का सफल प्रयास किया है।

साकेत की रचना की प्रेरण गुप्त जी को उनके काव्यगुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी से मिला। उनकी छत्र–छाया में अपनी काव्य रचना को आरंभ कर 'साकेत' की रचना करने में सफल हुए। ''बहुत पहले श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 'काव्येउपेक्षिता' नाम से एक लेख लिखा था, जिसमें भारतीय कवियों द्वारा उपेक्षिताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई थी।''1 साकेत उसी की एक कड़ी थी। इसका नामकरण स्थान के आधार पर किया गया है। यह अयोध्या का ही दूसरा नाम है। ''आधुनिक काव्य में मैथिलीशरण गुप्त के महाकाव्य 'साकेत' का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कथानक प्राचीन कथा है, इसका ढाचा भी पुराना है। पात्र भी पुराने है पर समूची भाव–भंगिमा नयी है। दिनकर जी इसी अर्थ में साकेत को खड़ीबोली की श्रेष्ठ कविता का श्रेष्ठ उदाहरण कहा है।''2 इसको लिखने में गुप्त जी को 15 वर्ष लगे, क्योंकि इसका प्रारंभ 1916 ई0 में हो गया था, जबकि यह 1932 में प्रकाशित हो सका। साकेत में बारह सर्ग हैं, 'नवम' और 'दशम' सर्ग में उर्मिला के विरह वर्णन का जिक्र है, जो पाठकों के मर्म को छू लेता है।

साकेत के नवम् सर्ग को उसका प्राणतत्व कहा जाता है और उसमें उर्मिला के विरह–वेदना के माध्यम से उसके चरित्र को उजागर करने का प्रयास किया गया है। डॉ0 त्रिभुवन सिंह के अनुसार– ''गुप्त जी की महान कृति 'साकेत' के नवम सर्ग में कवि की आत्मा का निचोड़ दीख पड़ता है। इस सर्ग में वियोगिनी उर्मिला के अर्न्तमन की व्यथा, उसके हृदय का अनुराग और उसके करुणा – विगलित आँसू विविध रूपों में प्रवाहित हुए हैं। कुछ आलोचको का यह कहना है कि यदि साकेत से नवम् सर्ग निकाल दिया जाये तो उसमें कुछ भी शेष न बचेगा।''3 गुप्त जी ने इस सर्ग के महत्व को इन शब्दों में अंकित किया है– ''यों तो साकेत दो वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था, परन्तु नवम् सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया और मेरी भावना के अनुसार आज भी अधूरा है।''4

उर्मिला के विरह वर्णन में गुप्त जी ने करुणा का सागर उड़ेल दिया है। 'साकेत' के सारे प्रसंग बड़े ही स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है। इसमें नारी हृदय की यथार्थ वेदना और आँसू है, पर एक उच्च आदर्श के लिए समर्पित प्रियतम की पथ–बाधा भी वह नहीं बनना चाहती। वह विरह में रोती नहीं बल्कि समाज हित तथा मानव कल्याण के बारे में सोचती है। उसके त्यागमय जीवन में जो आदर्श निहित है उससे प्रियतम भी स्वीकार करते हैं और कहते हैं –

''वन में तनिक तपस्या करके,
बनने दो मुझको निज योग्य।''5

गुप्त जी पर गाँधीवादी विचारों का प्रभाव भी दिखता है। यही कारण है कि उर्मिला के विरह–प्रसंग में भी अपनी विचारधारा के प्रभाव से अछूते नहीं रह पाते। उर्मिला के हृदय में लोक–कल्याण की भावना है, उसे अपने आस–पास के समाज की चिन्ता है। वह सामाजिक चिंतक के रूप में दिखायी गयी है। उसकी सहानुभूति कृषकों के प्रति है। उसकी दृष्टि में कृषक ही राष्ट्र समृद्धि के आधार होते हैं। केवल राष्ट्र के लिए मरने वालों से देश नहीं बनता बल्कि उसके असली निर्माता कृषक होते हैं। अतः वह कहती है –

''जिनके खेतों में है अन्न,
कौन अधिक उनसे सम्पन्न ?
पत्नी सहित विचरते हैं वे,
भव वैभव भरते हैं,
हम राज्य लिये मरते हैं।''6

उर्मिला का वियोग आदर्शों से परिपूर्ण है। कठोर वेदना में भी वह धैर्य नहीं खोती। वह चुप रहती है, उसका चुप रहना बड़ा सार्थक एवं पूर्ण है। उस पर वह स्वंय नहीं बल्कि सीता बोलती है। सीता कितना बड़ा सत्य प्रकट करती है –

''सास–ससुर की स्नेहलता, बहन उर्मिला महाव्रता,
सिद्ध करेगी वही यहाँ, जो मैं भी कर सकी कहाँ ?''7

उर्मिला के त्याग–भाव के प्रति सभी को तीव्रतम सहानुभूति है। यदि वह स्वंय बोलकर अपनी स्थिति स्पष्ट करती, तो इस अमूल्य सहानुभूति के लिए अवकाश कम रह जाता। 'साकेत' के चतुर्थ सर्ग के उर्मिला का विरह प्रारंभ होता है और नवम् सर्ग में विरह–वेदना विशद रूप ले लेता है। उसके हदय में आकांक्षा, चिन्ता, स्मृति, उद्वेग, उन्माद आदि विविध वृत्तियों का उदय स्वाभाविक ढ़ग से दिखाया गया है। प्रिय से मिलने की अभिलाषा उर्मिला के हृदय में कई बार तीव्र वेग के साथ आती है। वह विरहकालीन व्यथाओं से अधीर नहीं होती, प्रियतम के अटूट प्रेम का सहारा लेकर बाधा–विषमताओं को धैर्य के साथ सहन करती है। वह प्रियतम के पास पहुँचना चाहती हैं किन्तु उनके व्रत में विघ्न उपस्थित करना भी उसे अभीष्ट नहीं। उर्मिला के विरह–वर्णन में अबला हृदय की विवशता, दीनता और सहनशीलता की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। विरह की ज्वाला में तपकर उर्मिला का प्रेम आध्यात्मिक रूप धारण कर लेता है। वह अपने मानस मन्दिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित करके विरह में जलती हुई स्वयं आरती बन जाती है –

''मानस–मन्दिर में सती, प्रिय की प्रतिमा थाप।
जलती–सी उस विरह में बनी आरती आप।।''8

उर्मिला का हृदय त्याग और विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपने प्रेम से कर्तव्य को बड़ा समझती है; वह अपने प्रिय के कर्तव्य–पथ में बाधा न डालकर उनके भ्रातृ–प्रेम को गौरवान्वित करती है–

''है प्रेम स्वयं कर्तव्य बड़ा, जो खींच रहा है तुम्हे खड़ा।
यह भ्रातृ– स्नेह ऊना हो, लोगों के लिए नमूना हो।।''9

चित्रकूट की सभा में जब उर्मिला और लक्ष्मण का क्षणिक मिलन होता है; उस समय उसका प्रेम, त्याग, विष्वास, धैर्य और विरह जनित कृशता को देखकर लक्ष्मण स्तब्ध रह जाते हैं। उर्मिला का विरह संयत और मर्यादा के अन्दर है। उसमें हृदय की सहिष्णुता, उदारता और कोमलता अच्छी तरह व्यक्त हुई है। उसके चरित्र में विशुद्ध प्रेम, त्याग, सहनशीलता और कर्तव्यनिष्ठा का सुन्दर विकास हुआ है।

उर्मिला के अन्तर्मन को गुप्त जी ने प्रकृति के माध्यम से उतारने में पूरी सफलता प्राप्त की है। सुख में सारी प्रकृति सुखी और दुःख में दुःखी दीख पड़ती है। संयोग के क्षण में जिन मेघों को देखकर मन मोर–सा उल्लास से नाच उठता था। वही मेघ आज वियोग के क्षण में विरह की तीव्रता को और तीव्र बना रहे हैं। शरद की धूप उसे तपा रही है; तो कुहरा उसे आग के धुएँ के समान लगता है। उसका जीवन पतझड़ के समान हो गया है। शिशिर का अन्त ही बसंत के आगमन का सूचक होता है। इसी आशा में वह जी रही है–

''श्लाघनीय है एक से, दोनों ही द्युतिमान।
जो बसंत का आदि है, वही शिशिर का अन्त।।''10

विरह दशा में भी उर्मिला की कर्तव्यबुद्धि आदि से अन्त तक स्थिर रहती है। उसकी कर्तव्यपरायणता उसे रीतिकालीन विरहिणी नायिकाओं से ऊपर उठा देती है। उर्मिला के विरह में स्वार्थ, ईर्ष्या और स्पर्धा का अभाव है। उसके विरह में एक आषा थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पति चौदह वर्ष की अवधि बीतने के बाद अवश्य वापस आएगे। भावोतेजना के क्षणों में भी उसने राजमहल की मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। उसका विरह वर्णन अत्यन्त मार्मिक है–

''भूल अवधि सुधि प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ।

किन्तु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ।।''11

साकेत में भारतीय संस्कृति के प्राचीन आदर्शों और वर्तमान युग की नवीन विचारधारा के बीच सुन्दर सामंजस्य दिखाई देता है। इसमें गुप्त जी अपने युग तथा उसके प्रति अपने दायित्व को न भूलते हुए, उर्मिला के चरित्र के माध्यम से भारतीय नारी भावना को पूरी अभिव्यक्ति देते हुए भारतीय आदर्शों को हमारे सामने लाते हैं। उर्मिला 'साकेतकार' की कल्पना से निर्मित ऐसी नारी चरित्र है, जिसने उर्मिला के परम्परागत चरित्र को एकदम बदल दिया है। उर्मिला के मर्म व्यथा से सभी को परिचित करवाते हुए यह बताया है कि भारतीय नारियाँ सदैव से ही त्याग एवं अनुराग की प्रतिमूर्ति रही हैं। उर्मिला की महिमा अखण्ड है और वह गौरव मण्डित होकर देवी के पद पर आसीन होने योग्य है।

संदर्भ :–

(1) हिन्दी साहित्य एक परिचय – डॉ0 त्रिभुवन सिंह, पृ0– 303

(2) आधुनिक साहित्यिक निबंध – डॉ0 त्रिभुवन सिंह, पृ0– 746–747

(3) आधुनिक साहित्यिक निबंध – डॉ0 त्रिभुवन सिंह, पृ0– 747

(4) साकेत एक अध्ययन – डॉ0 नगेन्द्र, पृ0– 43

(5) आधुनिक साहित्यिक निबंध – डॉ0 त्रिभुवन सिंह, पृ0– 748

(6) आधुनिक साहित्यिक निबंध – डॉ0 त्रिभुवन सिंह, पृ0– 748

(7) साकेत विचार और विश्लेषण– वचनदेव कुमार, पृ0– 61

(8) वही, पृ0– 69

(9) वही, पृ0– 67

(10) वही, पृ0– 70

(11) वही, पृ0– 70

डॉ0 निलेश कुमार सिंह, सह0 प्रा0, आर0 एस0 पी0 कॉलेज झरिया।

Ecofeminism : Interweaving Nature and Women in Theory and Practice

Soma Mandal (Halder)

[ABSTRACT: Emergence of ecofeminism as a theory has provided the academic realm a new platform to address the conceptualisation of women and nature as 'other'. While interrogating the critical debate of associating women with nature, ecofeminism is also relevant in inspiring active participation of women in initiating ecological movement. This paper discusses some of its theoretical implications with a focus on women's role to safeguard nature.]

[Key Terms: Ecofeminism, Environment, Third World,]

Introduction

'Women have had no voice, but ecofeminism is a radical new language. Women must provide the moral energy and determination for both the First and Third Worlds. They are the future and hope in the struggle over life.' - Carolyn Merchant

The conceptualisation of nature as an abstract identity has made it a subject of exploitation to a degree that the existence of the world we inhabit is at the crossroads. While the realm of science is engaged in offering solutions to global ecological crisis, the realm of literature also endeavours to participate in this from various points of view. Ecocriticism is a branch of literary criticism that addresses the interrelation between human culture and physical world. Ecofeminism , on the other hand , also includes the critique of andocentric(man/ woman) dualism (Garrad 23) . As it interweaves feminism and ecology ecofeminism is a unique platform to address the causes that sanction the dominion of both nature and women. According to Stephanie Leland the inextricable connection between ecology and feminism lies in the fact that both of them strive to achieve balance and interrelationship and therefore ecological feminism can lead us to achieve a consciousness of wholeness in which we may learn how best to live together and to cultivate the earth out of love and a conscious understanding of the harmony of life. (Leland, 72).

Theory

Ecofeminism as a theory encompasses a wide range of subjects - deep ecology, feminism, environmental ethics, spiritual subjects, political movement or grassroots activism. Francoise d'Eaubonne(1920-2005), the French radical feminist, set up Ecologie-Feminisme in 1972 as part of the project of "launching a new action : ecofeminism". In 1974 she published a chapter entitled "The Time for Ecofeminism" in her book Feminism or Death (Le Feminisme ou la mort) and tried to synthesize the two struggles - feminism and ecological move-

ment (Merchant,10). She suggests that ecology by definition emphasizes the relations between sexes:

'Ecology, the "science that studies the relations of living beings among themselves and the physical environment in which they are evolving," includes, by definition, the relations between the sexes and the ensuing birthrate. Because of the horrors which menace us , the most intense interest is oriented toward the exhaustion of resources and the destruction of the environment- which is why it is time to recall that other element, the one which so closely ties together the question of women and of their combat' (d'Eaubonne 178)

Ecofeminism as a varied field of study has inspired many theoreticians to participate in its debate over nature and women interconnection. Carolyn Merchant , the American ecofeminist , in her groundbreaking book Death of Nature introduces us to the historical interconnections between women and nature that developed as the modern scientific and economic world took form in the sixteenth and seventeenth centuries. She focuses on the organic communities of sixteenth century Europeans for whom 'the root metaphor binding together the self, society and the cosmos was that of organism' and central to this was the image of nature or earth as a beneficent female or nurturing mother (Merchant1). Nature, conceived as the goddess, was venerated by all, but Western Enlightenment thought exposed nature not as a goddess but as a repository of resources which need to be explored. This not only sanctions the exploitation of nature by all means but also changes the attitude towards nature from a divinity to a thing, therefore, a mute, objective 'other'. What connects ecology movement and feminist movement is, according to her, the fact that both of them are critical of the costs of competition, aggression, and domination arising from the market economy's modus operandi in nature and society. In her another book Earthcare Merchant refers to Charlene Spretnak's book Lost Goddesses of Early Greece (1978) where Spretnak evokes Gaia, the ancient earth mother. This initiated what Merchant terms as the earth based forms of spirituality which is rooted in ancient civilization. Vandana Shiva's book Staying Alive echoes Merchant's study and views the interconnection from the perspective of Third World women. She evokes 'Prakriti' which is the Goddess cult of Indian culture but exploited as an inert identity with the emergence of modern scientific system. She points out that 'Women in India are an intimate part of nature, both in imagination and in practise. At one level nature is symbolised as the embodiment of the feminine principle, and at another, she is nurtured by the feminine to produce life and provide sustenance' (Shiva 38)

In Karren J.Warren's schematic for ecofeminism there are three intersecting spheres, each representing feminism, indigenous knowledge, and science or technology; the complementary spheres create 'an ecofeminist develop-

ment rationale which takes seriously epistemic privilege, women's issues, and technologies which work in partnership with natural systems'(Warren 304). Ecofeminism suggests an all-inclusive world view in which each sphere needs to take into consideration the interest of the other. She observes that ecofeminism combines both theoretical speculations and political debates and the inclusion of environmental issues within feminism will make it a complete whole. Through various empirical examples Warren suggests that water, trees, technology, toxin, food and farming can be viewed from ecofeminist lenses. Ecofeminism also synthesizes the local with the global perspectives. Grassroots ecofeminism is a way of approaching Third World women's participation in the environmental exploitation as Ruether points out 'Only as we learn to connect both our stories and our struggles , in a concrete and authentic way, with women on the underside of the present systems of power and profit, can we begin to glimpse what an ecofeminist theology and ethic might really be all about.'(Ruether 45).

Criticism

Ecofeminism has been subject to critical investigation because of its alliance of women and nature. Particularly spiritual ecofeminism which romanticizes the women /nature interconnection has been much criticized because of its glorification of women as goddess. If ecofeminism sanctions the fact that women are more inclined to nature than culture it falls into the trap of essentialism. Moreover, the term ecofeminism has been criticized by environmentalists like Bina Agarwal who suggests that ecofeminism only operates in theoretical basis. In order to address the heterogeneity of women experiences that is to bring into the question of women and nature from all sections of society one needs to work at a grassroots level. Thus Agarwal coins the term 'feminist environmentalism' which , she suggests, would address the question of women and nature in a more profound way. I think sociological ecofeminism which is a section of cultural ecofeminism addresses Agarwal's contention and has some common features that she suggests to implement through feminist environmentalism.

Movements

Women's active participation in securing nature is a global phenomenon that has local roots. In 1974 in Reni , a remote village in Himalayan range in India , a group of women prevented the felling of trees by hugging them and thus securing their lives which were essentially depending on forest. 'The forest is our mother's home, we will defend it with all our might.'- this was their motto. Mira Behn, Sarala Behn, Bimala Behn, Hima Devi, Gauri Devi, Gunga Devi, Bachni Devi, Itwari Devi, Chamun Devi are some of the women who were 'the significant catalysers'. The movement known as the Chipko Movement is an example how women can take a leading role in articulating their

intimate relationship with ecology. In 2009, hundreds of women in Mohtu , a village in Himachal ,tie rakhis on the trees which will be submerged with the construction of the Renuka hydrolectic project. Rukhmoni Devi, a villager said, "Every day, we (nearly 300 women of various villages) are tying more than 1,000 rakhis around the trees that will be finally submerged with the construction of the dam. We will not allow our 'brothers' to die. We took a pledge that we would prefer a watery grave with them."

In Japan, in the 1950s, the Nakabaru Women's Society and Sanroku Women's Society protested loudly against pollution from industries and power plants in the Tobata region. While industrial development had made the society richer, the environmental destruction began to threaten the health of local citizens. Women started to raise their voices in opposition and organized an increasingly powerful movement. They discussed how to prevent pollution, while holding basic study meetings on pollution and conducting field surveys, collecting scientific knowledge through several years of action. From the authorities and companies, the women claimed the right to live in a safe and healthy environment. This resulted in major pollution prevention measures taken by the local government and corporations. (Kitakyushu Forum on Asian Women, 1995) [Dankelman]

Another well-known example of women's long-lasting involvement in environment is the Greenbelt Movement, Kenya. Launched on Earth Day 1977 by the National Council of Women, this environmental campaign resulted in the mobilization of thousands of women planting indigenous trees. The Movement has created a national network of 6,000 village nurseries, designed to combat creeping desertification, restore soil health and protect water catchment areas. The 50,000 women members of the Movement have planted about 20 million trees. The movement has always sought to address issues of gender disparities, and food security in combination with environmental protection. The statement of Wangari Maathai, founder of the Green Belt Movement ,- "Implicit in the act of planting trees is a civic education, a strategy to empower people and to give them a sense of taking their destiny into their own hands, removing their fear..." - reinforces the participation of people from all sections of the society to secure the future of our planet.

Literary Texts

Ecofeminism as a literary theory has enabled the literary critics to analyse texts with new perspectives. Patrick D.Murphy has pointed out that ecofeminist literary criticism re-evaluates 'the canon that constitutes the list of major works and texts,' and also calls for 'a dialogue between critical evaluations based on humanistic criteria and those based on de-homocentric criteria' (Murphy 25). Many canonical texts of American literature are now being re -explored from

ecofeministic perspectives in which one locates the dual domination of women and nature. Indian literature has a long tradition of identifying woman with nature who is venerated as a woman. In Vedas nature is depicted as a woman: Arannany is worshiped as our mother who sustains all human beings. In early Sanskrit literature land and women are both things to be possessed. The mother cult of goddess as woman is all pervasive in our literature. My particular interest in this domain is the Indian women novelists whose works address the interrelation between nature and women in a way that not only reflect the socio cultural aspects but also reverberate with ecofeminist nuances. In Mahasweta Devi's work, - for example in The Book of Hunter and in Imaginary Maps- she deals with indigenous women and their interconnectedness with nature. As her works record the tension of dislocation felt by the indigenous people and we locate the marginalisation of women who remain the crucial victim of patriarchal society. The assault on nature parallels in a poignant way the domination of women - an ecofeminist strand that forms the basis of the theoretical background. Anita Desai's two novels -'Fire on the Mountain' and 'Cry the Peocock', reflect on the other hand , the inner suffering of the female protagonists who find their psychic state associated with nature. Gita Hariharan's work River Sutra interweaves the image of the river with that of the woman . In Kamala Markandaya's novel Nectar in a Sieve Rukmani , the female protagonist shows her interdependence with nature that gets shattered because of the advent of tannery. In another novel Coffer Dams the female protagonist Helen shows the bonding with nature in a completely unknown locale while her husband strives to tame nature.

Conclusion

Ecofeminism as a literary theory offers a new perspective to analyse literary texts from ecological as well as feminist point of view. As a global phenomenon it also inspires the active participation of women in literary movement. In spite of its contradictory issues, we can accept Merchant's suggestion that an ethic of partnership between people and nature could lead to a sustainable world in the next century. Her observation that taking care of the earth is a human concern, not just a woman's issue is a way of arriving at a new conclusion that rereads the gendered perspective of earthcare.

References :

1. Agarwal, Bina . ' The Gender and Environmental Debate : Lessons from India' , Feminist Studies, Vol. 18, No 1(Spring,1992), pp.119-158 URL: http://www.jstor.org/stable/3178217accessed: 29.06.15 06:12 UTC
2. d'Eaubonne, Francoise. 'The Time for Ecofeminism'. trans. Ruth Hottell. Key Concepts in Critical Theory: Ecology. ed., Carolyn Merchant. New Delhi: Rawat Publications, 1996.174-194. Print

3. Dankelman, Irene. 'Women:Agents of Change for a Healthy Environment' http://aaws07.org/english3/speech/5.2.IreneDankelman.pdf
4. Garrad, Greg. 'Ecocriticism', Oxfordshire: Routledge, 2007. Print
5. Lenand , Stephanie. 'Feminism and Ecology: Theoretical Connections' 67-72,eds Leonie Caldecott and Stephanie Leland Reclaim the Earth: Women Speak out for Life on Earth, London: The Women's Press Limited, 1983.Print
6. Merchant, Carolyn . Death of Nature: Women, Ecology and Scientific Revolution London : Wildwood House ,1980. Print
7. ... Key Concepts in Critical Theory : Ecology, ed by Carolyn Merchant, Jaipur and New Delhi : Rawat Publications, 1996, Print
8. ...., Earthcare Women and the Environment , Newyork: Routledge.1995.Print
9. Murphy,Patrick D.Murphy. Literature, Nature , and Other Ecofeminist Critiques Albany: State University of New York, 1995. Print
10. Ruether, Rosemary Radford., 'Ecofeminism: First and Third World Women.' American Journal of Theology and Philosophy, .18.1 (1997): 33-45 University of Illinois Press, JSTOR.Web. 24 March 2014 < http://www.jstor.org/stable/27944009>
11. Shiva, Vandana. Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India. New Delhi: Kali for Women,1988. Print
12. Vannucci M., Human Ecology in the Vedas . New Delhi: D. K.Printworld (P) Ltd. 1999.Print
13. Vijaya Lakshmi, Lella . 'Identical Oppression of Women and Nature: Re-reading of Anita Desai's Cry, the Peacock and Fire on the Mountain and Kamala Markandaya's Nectar in a Sieve' , ed. by S. Prasanna Sree , Psycho Dynamics of Women in the Post Modern Literature , New Delhi :Sarup and Sons, 2008. Print
14. Warren,Karen J., ed. Ecofeminism: Women ,Culture ,Nature , Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997. Print

Soma Mandal (Halder), Asst. Prof., Jogamaya Devi College, Kolkata

মুক্তিপ্রেমী কবি শামসুর রাহমান

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে বলে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।"[১]

বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতা-পিয়াসী এই কবি শামসুর রাহমান আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রণব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"...১৯৭১-৭২-এর পাক তানাশাহীর বিরুদ্ধে বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম, নৃশংস অত্যাচার নির্যাতন, জয়লাভ কবিকে উজ্জীবিত করেছে। আবার নিজ বাসভূমেই মৌলবাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে কবিকণ্ঠ বিদ্রোহী হয়েছে। বারবার কবিকে জীবনহানির হুমকি সহ্য করে থাকতে হয়েছে। গত বছরের ১৭ই আগস্ট মৌলবাদী বিস্ফোরণ ঘটেছিল বাসস্থানে আর এ বছর ১৭ই আগস্ট দু'বাংলার কবিতার মানচিত্র থেকে চিরবিদায় গ্রহণ।..."[২]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ-ষাট দশকের বাংলাদেশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি শামসুর রাহমানের জন্ম রাজধানী ঢাকার মাহুতটুলিতে ২৪শে অক্টোবর, ১৯২৯। পিতা আলাহাজ্জ মুখলেসুর রাহমান, মাতা মোসাম্মাৎ আমিনা বেগম। তিনি পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। এগার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ সন্তান। তাঁর জন্ম এবং শিক্ষাদীক্ষাও অখণ্ড বাংলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাঙ্গা ও বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। নিজের দেশকে দু'বার—একবার ইংরাজদের কাছ থেকে আর একবার পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীন হতে দেখেছেন তিনি। দেশ ভাগ হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে থাকা তাঁর কবি চর্চায় অন্তরায় হয়েছিল। কেননা, সেই সময়টা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের পক্ষে বড়োই মন্দার যুগ ছিল। উগ্র ইসলামিক আদর্শের প্রচার, ধর্মের জিগিরে বিভক্ত হয়ে গড়ে ওঠা পূর্ব পাকিস্তানে উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেবার পরিকল্পনা প্রভৃতি কবিতার জগৎকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ঢাকায় পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী জনাব নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার কথা ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববঙ্গ)-এর সমগ্র জনগণ জাতি-ধর্ম- দল নির্বিশেষে ছাত্র-শিক্ষক

অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীরা সম্মিলিত হয়ে প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। ফলে যে সংঘর্ষ বেঁধেছিল তাতে পুলিশের হিংস্র আক্রমণে জঙ্গি বর্বরতা লজ্জা পেয়েছিল। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলি অবাধে চালিয়েছিল তারা। ৩০০ জন আহত, ২০০জন বন্দী ও শহীদ হয়েছিল জব্বার, বরকত, রফিক প্রমুখ। এইভাবে নানা সময়ে সংঘর্ষে-প্রত্যক্ষ যুদ্ধে হতাহতে অনেক বলিদানের শেষে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকিস্তানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করে এবং জন্ম নেয় এক স্বাধীন স্বতন্ত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্র—যার রাষ্ট্রভাষা বাংলা। কবি শামসুর রাহমান এই সময় পটভূমিতে প্রতিবাদী কণ্ঠে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং কবিতা রচনায় বিপ্লবীদের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও তীব্র ক্ষোভ তাঁর এই সময়কার কাব্য কবিতার বিশেষত্ব হয়েছিল।

কবি শাসমসুর রাহমান ১৯৪৫ সালে ১৬ বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেও পাঠ অসমাপ্ত থাকে। ১৯৫৩ সালে স্নাতক হন বটে, তবে স্নাতকোত্তর ক্লাসের পড়া অনার্স পড়ার মতোই অসমাপ্ত থেকে যায়। পেশায় সাংবাদিক হলেও সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর নেশা। ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ-এ সাংবাদিক হিসেবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, তারপর যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান'-এ : পরে এই পত্রিকার নাম হয়েছিল 'দৈনিক বাংলা'। পরে তিনি এই পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং আরও পরে সম্পাদক হয়েছিলেন। নাগরিক জীবনের হতাশা, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ এবং সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সমস্যাসংকুল বিষয়গুলি সংগ্রামী জনতার পক্ষ অবলম্বন করে রূপায়িত করেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। তিনি প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ছোট বোনের মৃত্যুতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছিন্নমুকুল' অনুসরণে কবিতা লিখে ছেলেবেলায় তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। জীবনানন্দ দাশের অনুসরণে রচিত তাঁর প্রথম কবিতা '১৯৪৯' সোনার বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' ১৯৬০ সালে রচিত। প্রসঙ্গত তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী উল্লেখ্য বিষয়—

কাব্যগ্রন্থ ঃ

১) প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আহেগ (১৯৬০)
২) রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩)
৩) বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭)
৪) নিরালোকে দিব্যরথ (১৯৬৮)

৫) নিজ বাসভূমে (১৯৭০)
৬) বন্দীশিবির থেকে (১৯৭২)
৭) দুঃসময়ে মুখোমুখি (১৯৭৩)
৮) ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা (১৯৭৪)
৯) আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি (১৯৭৪)
১০) এক ধরনের অহংকার (১৯৭৫)
১১) আমি অনাহারী (১৯৭৫)
১২) শূন্যতায় তুমি শোকসভা (১৯৭৭)
১৩) বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে (১৯৭৭)
১৪) প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে (১৯৭৮)
১৫) ইকারুসের আকাশ (১৯৮২)
১৬) উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২)
১৭) মাতাল ঋত্বিক (১৯৮২)
১৮) কবিতার সঙ্গে গেরস্থালি (১৯৮৩)
১৯) নায়কের ছায়া (১৯৮৩)
২০) এক ফোঁটা কেমন অনল (১৯৮৩)
২১) আমার কোন তাড়া নেই (১৯৮৪)
২২) যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে(১৯৮৪)
২৩) অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই (১৯৮৫)
২৪) হোমারের স্বপ্নময় হাত (১৯৮৫)
২৫) ইচ্ছে হয় একটু দাঁড়াই (১৯৮৫)
২৬) শিরোনাম মনে পড়ে না (১৯৮৫)
২৭) টেবিলে আপেলগুলো হেসে ওঠে (১৯৮৬)
২৮) ধূলায় গড়া শিরস্ত্রাণ (১৯৮৬)
২৯) দেশদ্রোহী হতে ইচ্ছে করে (১৯৮৬)
৩০) অবিরল জলভূমি (১৯৮৬)
৩১) আমার কজন সঙ্গী (১৯৮৬)
৩২) ঝর্ণা আমার আঙুলে (১৯৮৭)
৩৩) স্বপ্নেরা ডুকরে ওঠে বারবার (১৯৮৭)
৩৪) খুব বেশি ভালো থাকতে নেই (১৯৮৭)
৩৫) মঞ্চের মাঝখানে (১৯৮৮)

৩৬) বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)

৩৭) হৃদয়ে আমার পৃথিবীর আলো (১৯৮৯)

৩৮) গৃহযুদ্ধের আগে (১৯৯০)

৩৯) সে এক পরবাসে (১৯৯০)

৪০) খণ্ডিত গৌরব (১৯৯২)

৪১) ধ্বংসের কিনারে বসে (১৯৯২)

৪২) হরিণের হাড় (১৯৯৩)

৪৩) আকাশ আসবে নেমে (১৯৯৪)

৪৪) এসো কোকিল, এসো স্বর্ণচাঁপা (১৯৯৫)

৪৫) উড়াড় বাগানে (১৯৯৬)

৪৬) তুমিই নিঃশ্বাস, তুমিই হৃৎস্পন্দন (১৯৯৬)

৪৭) মানবহৃদয়ে নৈবেদ্য সাজাই (১৯৯৬)

৪৮) তোমাকেই ডেকে ডেকে রক্তচক্ষু কোকিল হয়েছি (১৯৯৭)

৪৯) কৃষ্ণপক্ষে পূর্ণিমার দিকে

৫০) ভাঙাচোরা চাঁদ মুখ কালো করে ধুঁকছে (১৯৭৪)

৫১) হেমন্ত সন্ধ্যায় কিছুকাল (১৯৯৭) ইত্যাদি

শিশুতোষ গ্রন্থ/ছড়া ঃ

১) এলাটিং বেলাটিং (১৯৭৫)

২) ধান ভানলে কুঁড়ো দেব (১৯৭৭)

৩) গোলাপ ফোটে খুকীর হাতে (১৯৭৭)

৪) স্মৃতি শহর (১৯৭৯)

অনূদিত গ্রন্থ ঃ

১) ফ্রস্টের কবিতা (১৯৬৫)

২) খাজা ফরিদের কবিতা (১৯৬৯)

৩) Shamsur Rahaman : Selected Poems translated by Kabir Chowdhury (1975)

সংকলন ও শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ

১) প্রেমের কবিতা (১৯৮১)

২) শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯৬, ১৯৮৫)

৩) শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা (১৯৯৩)

৪) শামসুর রাহমানের প্রেমের কবিতা (১৯৯৩)

প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ আমৃত্যু তাঁর জীবনানন্দ (১৯৮৬)

উপন্যাস গ্রন্থ ঃ ১) নিয়ত মন্তাজ ২) অদ্ভুত আঁধার এক ৩) এলো সে অবেলায় ইত্যাদি।

"কবি শামসুর রহমান কাব্যজীবনের শুরুতে আত্মকেন্দ্রিক ভাবের দ্বারা পরিচালিত হন। তবে তিনি বুদ্ধির বিচারে কবিতার মূল্যায়নের পক্ষপাতী। ফলে প্রথম দিকে কবির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটেছে অস্পষ্ট জটিলতা ও দুর্বোধ্য ভাবপরিমণ্ডলকে কেন্দ্র করে। তাঁর কবিমানসের এই প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে একালের বুদ্ধিবাদী কবিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছে।"

আধুনিক কবিদের মতো শামসুর রাহমানের কবিতায় আত্মগত ভাবের প্রাধান্য আছে। তবে তাতে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে হৃদয়বৃত্তির পরিচর্যা ব্যাহত হয়নি। তিনি ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতেন না। সতত মৌলবাদীদের রোষদৃষ্টির মধ্যে পড়তেন। স্বদেশ ও স্বভাষা সাধনা তাঁর জীবনব্রত; সাংবাদিকতা তাঁর পেশা হলেও কবিতা তাঁর নেশা এবং এই কবিতার মধ্যেই তিনি অমরত্ব কামনা করেছিলেন। তাঁর প্রায় ৭৭ বছর আয়ুষ্কালে ৪৬ বছরের কাব্যসাহিত্য সাধনায় কী কী বিশেষত্ব প্রকাশিত হয়েছে তা সংক্ষেপে সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে—

১) স্বদেশপ্রীতি শামসুর রাহমানের মন, মনন ও মানসিকতার এক অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট্য।

২) তাঁর স্বাদেশিকতায় দেশজ ঐতিহ্যের বিকশিত সৌন্দর্য ধারা প্রকাশিত।

৩) তাঁর স্বদেশচেতনায় দেশীয় জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৪) তাঁর স্বদেশচেতনা শুধু স্বদেশপ্রীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিবিধ যুগীয় সমস্যা, সংকট, বিভ্রান্তি তাঁর সংবেদ শীল কবিচিত্তকে আন্দোলিত করেছে।

৫) বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম প্রভৃতি উত্তপ্ত পটভূমিতে তাঁর কাব্য-কবিতায় দেখা গিয়েছে প্রতিবাদ, স্বদেশ ও ভাষানুরাগ।

৬) পরিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার, কবিতায় নতুন নতুন ব্যাকরণের প্রয়োগ, নতুন সংবেদনশীলতা, অভিনব কলাকৌশল, ভবিষ্যৎ জীবনবোধের ইঙ্গিত, সময় বা স্বকাল চেতনা প্রভৃতি তাঁর কবিতার বিশেষত্ব। স্বয়ং কবির স্বীকারোক্তি—"...আমার কবিতা হয়ত আত্মকেন্দ্রিক ছিল। আমার কবিতা সে সময় প্রতিবাদী ছিল না। তবু আমার অবস্থান সবসময় ছিল বামপন্থার দিকে।... আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে মার্কসবাদী কিংবা কমিউনিষ্ট বলি না। কারণ একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়া কঠিন।... কিন্তু হ্যা, আমি ববরাবরই প্রগতির সপক্ষে আছি।"

৭) তিন সময়ের মুখোমুখি কবি। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার; তাঁর জীবনে, কর্মে ও রচনায় আছে সমকালীন অভিজ্ঞতা, আঘাত ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। তিনি দায়বদ্ধ কবি ও সময়ের ঋত্বিক।

৮) তাঁর কবিতায় দিনযাপনের ক্লান্তি, আত্মহননোচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে আলবেয়ার কাম্যুর 'মিথ অব সিসিফাস' তথা অ্যাবসার্ডিটি তত্ত্বের আলোয় উদ্ভাসিত।

৯) শাসকশক্তি স্বদেশ ও মাতৃভাষা প্রেমীদের 'লাশ' বানাতে চায়; সেই লাশ সমাধিস্থ করার স্থান নেই বলেই কবির প্রশ্ন—"এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়?" মানবদরদী, আত্মোৎসর্গীকৃত মানুষ স্মরণীয় ও বরণীয় বলেই কবির আন্তরিক ঘোষণা—'এ লাশ মাটিতে, পাহাড়ে বা সাগরে পড়ে থাকার নয়, হৃদয়ে রাখার, স্মৃতির সরণীতে শাশ্বত করে রাখা—

"তাইতো রাখি না এ লাশ আজ
মাটিতে পাহাড়ে কিম্বা সাগরে,
হৃদয়ে হৃদয়ে দিয়েছি ঠাঁই।"[৫]

১০) সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা-কুসংস্কার স্বৈরাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন আপোষহীন সংগ্রাম, জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্প্রীতি, নৈতিকতা, শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ প্রভৃতি সার্থক প্রকাশ দেখা যায় তাঁর রচনায়।

১১। পরাধীন দেশের শাসন-শোষণ-পীড়ন জনিত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনায়।

১২) বাঙালী, বাংলাভাষা ও বাংলাদেশের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও ভালোবাসা আছে বলেই তিনি পাকিস্তানী সেনানীর বর্বরতায় ও নারকীয়তায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পটভূমিতে প্রতিবাদমুখর ভাষায় লিখেছেন—

"দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে ঐ নয়াবাজার
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাতী শিলাবৃষ্টি অবিরাম।"[৬]

১৩) কবি 'ঝাঁকের কই' হয়ে গতানুগতিকতার চোরাস্রোতে মিশে যেতে পারেননি, আত্মোপলব্ধিতে সত্যকেই বুঝে নিতে চেয়েছিলেন—

"কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি,
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কাটাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি,
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।"[৭]

মানবপ্রেমী স্বাধীনতাকামীদের উদ্দেশ্যে কবি বলেছেন—

"গলায় রক্ত তুলেও তোমার মুক্তি নেই।
হঠাৎ-আলোয় শিরায় যাদের আবির্ভাব।
আসবেই ওরা ঝড়ের পরের পাখির ঢেউ।"[৮]

আর 'দুঃস্বপ্নের একদিন' কবিতায় দেখা যায় তারই হৃদয়বিদারী শিহরণ, সখেদ-কাতর-দুঃস্বপ্ন—

"দোহাই আপনাদের, সেই পাখির
টুঁটি চেপে ধরবে না, হত্যা করবেন না বেচারীকে।"[৯]

১৪) অত্যাচার-অনাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলে কবি বাঁচার অদম্য প্রয়াসের কথা বলেছেন—

"আমিও বাঁচতে চাই, চাই পড়ো-পড়ো বাড়িটাকে
আবার করাতে দাঁড়।"[১০]

১৫) তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের তপস্যা কখনো বিফলে যায় না। অনেক বলিদানের পর অবশ্যই স্বাধীনতা আসবেই—

"পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকেই আসতে হবে, হে স্বাধীনতা।"[১১]

১৬) মাতৃভাষা প্রীতি তাঁর প্রাণের সত্তায় বিরাজমান—

"নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড়
ঘিরে রয় সর্বদাই।"[১২]

"রাজপথ নিদাঘের বেশ্যালয়, স্তব্ধতা রঙিন হয়ে বুকে
গেঁথে যায়; একটি কি দুটি
লোক ইতস্ততঃ
প্রফুল্ল বাতাসে ওড়া কাগজের মতো ভাসমান।"

হরতালের পরিণতিও প্রকাশিত হয়েছে এই কবিতায়—

"চকিতে বদলে গেছে আজ,
আপাদমস্তক
ভীষণ বদলে গেছে শহর আমার।"[১৩]

১৮) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ প্রমুখের ঐতিহ্যের স্বীকরণে ও স্বীকৃতিতে তিনি এবং তাঁর কবিতা স্মরণীয় ও বরণীয় হয়েছে। বাংলা ভাষা ও স্বাধীনতার মুক্তি

প্রসঙ্গে তা স্মরণীয়—

“স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।”[১৪]

শামসুর রাহমানের কাব্য-কবিতা নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচয়িতা কবি-প্রাবন্ধিক-সমালোচক হুমায়ুন আজাদ মন্তব্য করেছেন—“স্বাধীনতাকে তিনি সাজিয়েছেন নানা রঙে-রূপে-সুরে, আর সেই রূপ-সুর তিনি সংগ্রহ করেছেন বাঙলার স্বপ্ন-নিসর্গ-জীবন থেকে।”[১৫]

১৯) পরিবর্তিত যুগে যুবক-যুবতীদের উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বিপথগামিতা-জনিত কারণে পারিবারিক জীবনের মালিন্যে দিশেহারা হয়ে কবি জীবনের অভিশাপের দিকটিও এঁকেছেন—

“যুবকেরা আড্ডাবাজ, মেয়েরা আহ্লাদী প্রজাপতি,
মক্ষিরাণী, সংসারে কেবলি বাড়ে শিশুর বাহিনী।...”[১৬]

২০) মানুষের দুঃখ ও বন্দীদশা মোচনের কথা আছে তাঁর কথায়, কর্মে ও রচনায়। তাঁর কবিতায় আছে আন্তর্জাতিকতার স্পর্শ।

২১) কবিতা যে হৃদয়ের গভীর তলের রসবেদন, তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

“এই ইঁট সুরকির ভেতর যদি নিজেকে গুড়িয়ে দাও, তবে হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।”[১৭]

অথবা—“আমার মুখের রেখাবলী
তুলে নিতে পারো
নিজের মুখাবয়বে, তবে
হয়তো বা পেয়ে যাবে একটি কবিতা।”[১৮]

২২) তিনি মনে করতেন শুধু প্রচারধর্মিতা নয়, দায়িত্ব সচেতন দায়বদ্ধ কবিকে শিল্পীও হতে হবে এবং রচনায় শিল্পগুণ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নিজেকে তিনি ‘শিল্পের শহীদ’ আখ্যা দিয়েছিলেন। শিল্পীকে সৎ, ধৈর্যশীল ও নিরলস পরিশ্রমী হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর কবিতায়—

“দেখছি ক’দিন ধরে গৃহিণীর হাতে তৈরি হচ্ছে অনুপম
একটা চাদর।
সতত এবং অনলস যে অধ্যাবসায়
শিল্পীকে সফল করে তারই যুগ্মতায়
সে একটা চাদর সেলাই
করলো ক’দিন ধ’রে।...”[১৯]

২৩) যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অচলায়তনকে ভেঙে প্রগতিশীলতার প্রবর্তন ও স্থায়িত্ব দান করাকে তিনি কবি-শিল্পীর দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তাঁর স্পষ্টোক্তি—“আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ। আমার এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি লিখি।”

২৪) কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তার অন্যতম আশ্রয়—উদ্দীপন বিভাব—

“আমার দিনকে তুমি দিয়েছ কাব্যের বর্ণচ্ছটা/রাত্রিকে রেখেছো ভ’রে গানের স্ফুলিঙ্গে, সপ্তরথী কুৎসিতে ব্যূহ ভেদ করবার মন্ত্র আজীবন/পেয়েছি তোমার কাছে।...”[২০]

তিনি অকাতরচিত্তে বলেন—

“আমার মননে
রাবীন্দ্রিক ধ্যান জাগে নতুন বিন্যাসে
এবং মেলাই তাকে বাস্তবের তুমুল রোদ্দুরে
আর চৈতন্যের নীলে কতো স্বপ্ন-হাঁস ভাসে
নাক্ষত্রিক স্পন্দনে সর্বদা।”[২১]

২৫) কবি শামসুর রাহমান প্রেমের কবিও। তাঁর কবিতায় শাশ্বত প্রেমের বাণী যেমন আছে, তেমনি আবার যৌনতাও আছে। এপার বাংলার কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখেরা প্রকাশ্যে যৌনজীবন ও কর্মের অলজ্জ বর্ণনা দিয়েছেন, ওপার বাংলার কবি শামসুর রাহমানের মধ্যেও দেখা যায় সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকারের পাশে যৌনতা ও প্রেমের যুগলবন্দী রচনা।

কবি শামসুর রাহমানের প্রেমচেতনা কখনো কখনো আবার স্বদেশচেতনার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। জন্মভূমিকে জননী ও প্রিয়তম দুই রূপেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—

“তোমার চোখ, তোমার কেশভার
ঝলসে ওঠে আমার চোখে শুধু।
কে আশাবরী শোনায় বারবার,
হৃদয়ে জ্বলে স্মৃতির মরু ধূ ধূ।
....

কিন্তু মেয়ে তোমাকে ভালোবেসে
হৃদয়ে চাই জন্মভূমিকেই।"[২২]
কিংবা কবি যখন বলেন—
"কখনো আমার মাকে কোনো গান গাইতে শুনিনি।
সেই কবে শিশু রাতের ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে
আমাকে কখনো ঘুম পাড়াতেন কিনা আজ মনেই পড়ে না।"[২৩]

তখন বোঝা যায় কবি এখানে তাঁর মায়ের বিষণ্ণ মূর্তিকে অবলীলায় ছড়িয়ে দিয়েছেন দেশমাতৃকার বিষাদকাতর ভাবকল্পের মধ্যে। কবি মা, মায়ের ভাষা ও স্বাধীনতা—এই তিনটি শব্দকে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পেছনে অপ্রতিরোধ্য শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কবির প্রেমচেতনা ক্ষুদ্র ব্যক্তিসীমায় আবদ্ধ না থেকে দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সমস্ত দেশে ও মানবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। বিশিষ্ট সমালোচক তারুণ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—

"ধরা-অথবা প্রেমে কবি তাঁর জন্মভূমিকে বরণ করেন। হৃদয়ভূমিতে অভিষিক্ত হয় সেই দেশ, সেই ভাষা, সেই নারী। এই মাটিতেই জন্ম নিয়ে কবি শেখেন বাঁচার মানে। প্রিয় নারীকে ভালবেসে বুঝে যান জীবনের মানে। তাঁর চিন্তা চেতনায় ও সত্তায় এভাবেই অভিন্ন হয়ে যায় প্রিয়তমা ও জন্মভূমি।..."[২৪]

কবি শামসুর রাহমান নিছক বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের কবিমাত্র নন, তিনি অখণ্ড বাংলার কবি, তিনি সবার কবি, প্রিয় কবি। বিষয়ের বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে, স্বতঃস্ফূর্ততায়, সময় ও সমকাল সম্পর্কে প্রখর অভিনিবেশে তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই সমাদৃত। তিনি বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের আত্মীকরণ অনায়াসে ঘটিয়েছেন যেমন, তেমনি তাঁর অবিরাম বিচিত্র প্রয়োগ-কৌশলে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় চিন্তার ও অনুভূতির জগতে তা বিস্তৃতি ঘটেছে। ব্যক্তিগত কাব্য ও সামাজিক কাব্যের অসামান্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যরচনায়।

কবি শামসুর রাহমান কেন দুই বাংলার জনখ্যাত কবি তা পরিস্ফুটনের জন্য আরও কয়েকটি কথা বলে আমাদের বক্তব্য আপাতত শেষ করা যেতে পারে—

১) তিনি কলাকৈবল্যবাদে বা কবিতা-বিলাসিতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। উষর ও সমকালে আক্রান্ত মানবিক মূল্যবোধের দায়িত্ব এড়িয়ে তিনি 'উটপাখি' জীবন কাটাতে পারেননি।

২) বাংলাদেশের কবিতা যে এক পরম্পরাগত ধারার জন্ম হয়েছে তার প্রধান ও অন্যতম প্রত্যক্ষ উৎস তাঁর কবিতা। তাঁর কবিতার অবিরল বৃষ্টিধারায় বাংলা কাব্য কবিতার ক্ষেত্রে সিক্ত ও সরস হয়েছে এবং তাতেই নতুন কাব্যশস্য সৃষ্টির অনুকূল উর্বর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

৩) তাঁর কবিতায় প্রায়ই প্রতিধ্বনিত হয়েছে নতুন কণ্ঠস্বর। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতায় পালাবদলের ভিত্তি স্থাপয়িতা তিনিই। পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের গ্রহণ, আত্মীকরণ ও স্বনিষ্ঠতায় বিকশিত হবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি।

৪) মানবতার অপমান, বীরের আত্মোৎসর্গ, স্বৈরশাসকের উদ্ধত অনাচারে-অজাচারে তাঁর কণ্ঠস্বর নিয়ত উচ্চকিত হয়েছে জ্বালাময়ী কবিতার উজ্জ্বল চরণে।

৫) রাজনীতির কলুষতা ও ক্ষুদ্রতা-নীচতা থেকে দূরে সরে থেকেও তিনি জাতিকে দিয়েছেন এক বিরল নৈতিক নেতৃত্ব ফলে মৌলবাদীদের অন্ধরোষের শিকার হয়েছিলেন তিনি বারেবারে। তিনি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ।

৬) তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা—ব্যক্তিস্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভাবনা ও লেখার স্বাধীনতা।

৭) তিনি কী লিখবেন, কেন লিখবেন, কাদের জন্য লিখবেন বা লিখছেন তা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন তাঁর কবিতায়।

৮) আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র শহরকে নিয়ে তিনি লিখলেও পল্লীপ্রকৃতির আবহ থেকে বিচ্যুত হননি।

৯) তিনি মনে করতেন সৃজনশীলতাই প্রতিভা এবং প্রেরণা হলো প্রস্তুতি।

১০) জীবনের সঙ্গে গূঢ় ও প্রত্যক্ষ অচ্ছেদ্য সম্পর্কের দলিল তাঁর কবিতা। অসাধারণ অকপট স্বচ্ছতায় তিনি নিজেকে উন্মোচিত করেছেন তাঁর কবিতায়।

"জীবনে মোহন মহান স্বপ্ন' প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আজীবন লিখে যেতে চেয়েছিলেন—"যদি বেঁচে যাই একদিন আরো/লিখবো," মৃত্যুই তাঁকে সেই স্বপ্ন সার্থক হতে না দিলেও তিনি এখন পর্যন্ত যা লিখে গেছেন তাতেই তিনি অবশ্যই কালে কালে মানুষের হৃদয়ে অমর প্রতিষ্ঠা পাবেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ

*১ = 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', "বন্দীশিবির থেকে," "শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা," দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা -৮৭

*২ = 'গণশক্তি' ২৭শে আগষ্ট, ২০০৬, রবিবার

*৩ = বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ, আজহার ইসলাম, অনন্যা (বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা ৮৪৪

*৪ = সাক্ষাৎকার/বাংলা প্রগতি কবিতার নানা প্রত্যন্ত, নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস সম্পাদিত।

*৫ = 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায় ?' "নিজ বাসভূমে", "শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা", পৃষ্ঠা-৮২

*৬ = 'তুমি বলেছিলে, "বন্দীশিবির থেকে", তদেব, পৃষ্ঠা- ৯২

*৭ = 'দুঃস্বপ্নের একদিন', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪

*৮ = 'আত্মজীবনীর খসড়া', "প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে", তদেব, পৃষ্ঠা-২০

*৯ = 'দুঃস্বপ্নের একদিন', "নিজ বাসভূমে" তদেব, পৃষ্ঠা ৮৪

*১০ = 'টেলেমেকাস', "নিরালোকে দিব্যরথ", তদেব, পৃষ্ঠা-৬৭

*১১ = 'তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা', "বন্দীশিবির থেকে", তদেব, পৃষ্ঠা-৮৮

*১২ = 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭১

*১৩ = 'হরতাল', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭৭, ৭৯

*১৪ = 'স্বাধীনতা তুমি', "বন্দীশিবির থেকে", তদেবা পৃষ্ঠা-৮৮

*১৫ = "শামসুর রাহমান ঃ নিঃসঙ্গ শেরপা", কবি হুমায়ুন আজাদ, ঢাকা, ১৯৮৩

*১৬ = 'বাড়ি', "বিধ্বস্ত নীলিমা", তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪

*১৭ = 'একটি কবিতার জন্যে', "আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি",

*১৮ = তদেব, পৃষ্ঠা-১১৬

*১৯ = 'একটা চাদর', "নিরালোকে দিব্যরথ", তদেব, পৃষ্ঠা-৬১

*২০ = 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', "রৌদ্র করোটিতে", তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩

*২১ = 'ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯', "নিজ বাসভূমে", তদেব, পৃষ্ঠা-৭৩

*২২ = 'জন্মভূমিকেই', "যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে," তদেব, পৃষ্ঠা-২২৭-২২৮

*২৩ = 'কখনো আমার মাকে', "বিধ্বস্ত নীলিমা", তদেব, পৃষ্ঠা-৫৬

*২৪ = "কবি শামসুর রাহমান", অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায়, এবং মুশায়েরা', কলকাতা, পৃষ্ঠা-৬২

ড. মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা, অধ্যাপক, টাকী সরকারি মহাবিদ্যালয়, বসিরহাট

NO LONGER MEEK- A Global Call Of Judith Wright and Kamala Das

Indrajit Kumar

Development has its own standards and parameters. The over-all development of the world can't be realized without noticing the developments of all groups of the people barring caste, creed, region, gender etc. This holistic approach to understand the world can provide the guts to understand the real and rational developments of the world. When we talk about real & rational development, we must notice the echoes and groans of all strata under the Sun. Whether it is literary compositions or philosophical speculations, poetic power or fictional flight, sociological survey or anthropological outlines, economical development or political awareness, community sensibility or gender vulnerability ------ change and uninterrupted change has remained the essence of all sorts of knowledge & learning. We can neither judge and nor we can conclude regardless to these aspects of life and society.

As it is a well-accepted fact that literature plays the role of torch-bearer and shows new and right paths to the mankind in general, therefore, as per its nature and character, it couldn't remain mum or aside. It might be our faults (as generally we do so and sooner or later we accept so) that we fail to hear and bear the echoes of literature that has been representing and trying its best to draw our attention since time in memoriam. This can be called human's Nature that we take things as per our convenience and explain them as per our requirements rather understanding the stark realities of our traditional practice. Perhaps, for that reason we failed to listen "the Voices from the Margin" that we do listen and do notice today.

At this stand, I have tried to find out whether there was any call for value-system, any urge for self-respect, any effort for mass-welfare, any passion for gender-classification and any complain against the existing systems of the society across the globe, in general, through the eyes of Kamala Das and Judith Wright. Simultaneously, I must try to convince you of their struggle for self-respect, gender-status, self-confession and self-realization. Moreover, I must try to draw your attention towards their groaning, moaning, compulsive stands and their struggle for fresh breathing and free status.

When poetry becomes self-expressive and confessional, it provides no place either for religion or for moral ethics in it. It becomes intensely personal and typically subjective. "I" becomes prominent and it remains never merely a personal pronoun rather it expresses exclusively about pains, sufferings, anger, anxiety, lust, sex love etc. "I" is the representation of suppressed womanhood and an attempt to introspect. I have wonderful but very powerful custodians of "I" such as Judith Wright and Kamala Das. They have remained the significant poets of this genre of poetry. These two poets experienced and expressed almost the same saga that can be traced as their Global Call.

Unfortunately, these poets were grouped as typical and against the deep rooted conventional system. They wanted to be unique and not a part of the conventional social set up. This conflict with the society leads them to introspection. Their incessant effort to provide women a solid and sound platform proved boons and blessings for their next generations.

Judith Wright too has handled her themes in a brilliant way. Her struggle to have equal rights for the aboriginals, established her as a social activist as well. True love is the essence of life and Judith too, roamed for it. It is another social aspect that her society was not conventional like India and nor women were kept in man-made cells. In comparison to Kamala das, she hails from permissive society. But, I do believe and it is also correct that their voices were heard partially, for that I gave the title of this paper ----- (Voices) Heard & Unheard ----- A Global Call by Judith Wright and Kamala Das.

Kamala Das is very panic in her expression when she writes :-

... When
I asked for love, not knowing what else to ask
For, he drew a youth of sixteen into the
Bedroom and closed the door. He did not beat me
But my sad woman-body felt so beaten.
The weight of my breast and womb crushed me.
I shrank pitifully.

Das is candid and vocal. She tries to draw our attention towards our hunger for sex and our bestial tendencies in the matter of sex. This is not the pain of Kamala rather this is the universal state of women without any ifs and buts. This state of behavior is the result of our attitude and mindset. Actually, we

will have to come out from the cell - the manhood Cell and to think out rationally and respectfully. We must shade out our dominating attitude and need to take things afresh.

Kamala Das and Judith Wright were poets of love, sex, lust, pain, confession and frustration. Love and affection has remained the forte of their personal experiences and subjects of their writings. But they are deeply hurt and humiliated and the ultimate result is dissatisfaction. Such painful experiences of life made Kamala highly poignant and very straight forward. She started attacking on the established male dominance in the society. She looked revengeful but very true when she hammered on the conventional and traditional structures of the society. Since then, she never looked back and remained in attacking temperament in her poetic career.

The theme of Kamala's writing is the exploration of the man-woman relationship. For Kamala marriage is not a way to get love and affection rather it indulges women in a male-oriented world of sex and lust. Das herself wrote: "...every morning I told myself that I must raise myself from the desolation of my life and escape, escape into another life and into another country". She always expressed the need of the feminine self for love. K R Sreenivasa Iyengar once remarked about her poetry her poetry is "An attractive, protective or defiant cover to hide the nakedness of the self, but more often than not an engine of catharsis, a way of agonized self-knowledge". Even with all the limitations of her poetic self, the poetry of Kamala Das took on herself the burden of the feminine self's objective to accept the world and be accepted by it in its totality.

Kamala urges for freedom and seeks enjoyment in each and every moment of life. In the words of Devindra Kohli , "Her poetry is a compulsion neurosis, so intense is her need to find release from her emotions" that she longs freedom and a much higher release of herself which she finds in God. She, too, keeps the same view. Once she spoke in an interview, "I always wanted love, and if you don't get it within your home, you stray a little" .

Outside the subcontinent, feminist literary critics who have written on Das have taken their cue from the local feminism which Das's work is shaped by and shapes in turn. On sexuality in My Story, Katrak writes: "In Das, the sexuality is often so

completely self-absorbed, so navel-gazing as to become both narrowly personal and problematically sensationalised and voyeuristic."

What Kamala was doing in India, Judith had done in Australia a few decades earlier. Throughout her literary and social career, she tried her best to drag women out from dumping sexual status. Her second collection, Woman to Man, is a celebration of womanhood, with all its grace and delicacy. She drew total attention of the readers across the globe singing the music of womanhood. For her, being woman is not less than blessing and she felt proud of her gender. She enjoyed all the biological stages that come in a woman's life like conception, pregnancy, and childbirth and even childcare. In her poem 'The Maker', she celebrated her pregnancy, as she wrote beautifully:

I hold the crimson fruit
and plumage of the palm;
flame- tree, that scarlet spirit,
in my soil takes root.
My days burn with the sun
my nights with moon and star,
since into myself I took
all the living things that are .

Kamala Das remained the vibrant voice for the existence of women. Throughout her career, she advocated strongly for the welfare, strength, position, prestige and betterment of woman. Kamala's writings are the saga of common women, their natural journey, their varied natural stages of life and their changing desires and requirements of life. As a wise lonely lady, she confessed in her wonderful poem "Glass" from his collection The Old Playhouse :-

I want to him for half an hour
As pure woman, pure misery
Fragile glass, breaking
Crumbling......
The house was silent in the heat
Only the old rafters creaking
He drew me to him
Rudely
With a lover's haste, an armful
Of splinters, designed to hurt, and,

Pregnant with pain.

Kamala had nothing to do with traditional and conventional pattern of literary creation. She went far ahead and opted literature as a strong, powerful and concrete platform for inner expressions. In her view, for a woman the male is rude, rough and cruel. She hated that ugly sense of man to understand woman a tools of entertainment. She seeks love but she remains bereft of that:-

It was indeed awkward for him
When the latest toy
Began to speak after the day's best
Games were over.

Women, in general, are in search of true love. Their silence does not symbolize their satisfaction and contentment. It indicates the emptiness of the heart and total vacuum inside. Sex is solely the biological need. Mental and hearty satisfaction can't be attained through sexual relations rather it needs depth of emotions, feelings and affections. These lines of Kamala are the echoes of the mass- a loud knock by the marginalized:

If loving me was hard then, It's harder now
But love me one day, For a lark
Love the sixty-seven, Kilogram's of ageing flesh
Love the damaged liver, The heart and its ischemia
Just for a lark , Show me what our life would have been
If only you had loved.

In their several writings, they represent the women persona in various forms of women such as unhappy wife, mistress, sad lady, silent lady etc and try to explore the natural woman in natural posture. In Kamala's well-acknowledged poem "An Introduction", she tries to attain self-confidence in almost all walks of life, as she writes:

"I am Indian, very brown, born in
Malabar, I speak three languages, write in
Two, dream in one".
"Why not leave Me alone ....
Why not let me speak in
Any language I like?".

Like Kamala, Judith tried to portray the different stages of a woman through her practical experiences of various colors of a woman. Her Woman To Man is a artistic creation of the various traits of a woman like love, joy, fear etc. As she writes:-

This is the strength that your arm knows,
the arc of flesh that is my breast,
the precise crystals of our eyes.
This is the blood's wild tree that grows
the intricate and folded rose.

One remarkable call for the rights of the aboriginal can be seen in a number of poems of Judith Wright such as 'Bora Ring', 'New England', 'At Cooloolah, 'River Bend' etc. For this, she successfully tried to explore the facts lying behind her strong opinion. Judith's this approach and achievement proved milestone in the developing socio-economic and political saga of mankind. I take this as a response to the Rudyard Kipling's egoistic creation " The Whiteman's Burden". As Judith writes :

" The blue crane fishing in Cooloolah's twilight
Has fished there longer than our centuries.
He is the certain heir of lake and evening,
And he will wear their colours till he dies.

In nutshell, I do believe that these to stalwarts of world literature enriched the feminist literature, accelerated the urge for gender equality, broadened the range of socio-political horizons of the world society and led stress to understand the worth of each and every individual. There is no denying and nor any scope to negate that they put milestones in their respective career for a common goal. Unfortunately it was heard & unheard by the concerned gender groups. However, it is a paradox that the duos have been creating vibrations in the nerves of the opposite sex.

Thanks

Barber's Trade Union: The Story of Chandu, The subaltern who speaks

Dr. Niraj Dang, Assistant Professor, Dept. Of English, St. Columba's College, Hazaribag [e-mail id: dang.niraj75@gmail.com]

Abstract :

Anand's writings are a compassionate crusade through art and activism to claim for the marginalized a just and honourable place in India's national life. His literary works are apt vehicles for the expressions of his opinions to bring about his social activism into action. Anand is against abstractions in art. Art is not for 'disinterested contemplation' but for developing a revolutionary vision that opts for and achieves qualitative change in human life. The present article discuses the depiction of the whole man,

his development, sense of dignity and decency in living is Anand's concern. This paper locates its argument in the very act of reclaiming this dignity denied to the protagonist by the high-caste Hindus. Chandu is a brilliant example of how a subaltern cannot be forced in to silence if he/she chooses to assert his/her 'being'.

Key Words : subaltern, marginalized, exploited, assert, orthodox etc.

Mulk Raj Anand writes to document the true face of India. He writes to instil shame in the reader who is not sensitive to the issues of caste/class exploitation and the resistance of the exploited. His writings are a compassionate crusade through art and activism to claim for the marginalized a just and honourable place in India's national life. Anand may not out rightly confess, but his well-considered opinions as reflected in his works are merely vehicles to bring his social activism into motion. He is against abstractions of any kind in art. Art is not for "disinterested contemplation" but for developing a revolutionary vision that opts for and achieves qualitative change in human lives. To put in Aristotelian dictum, he would go for the "vision of what life could be like" (An Apology for Heroism, p. 133). The function of art, thus, is to "disclose the way to a new life" (ibid., p. 134) thereby transforming the artist as educator of such men:

Who may not always have to seek sanction for his behaviour in the external and arbitrary rules of conduct enforced on him by others, but an individual with the inward monitor of his own conscience, who will bend before no tyrants, but only follow his own enlightened will (ibid., p. 135).

Like Shelley, Anand too believes that poets are the "unacknowledged legislators". He has to accept his "mission as the conscience of the race, the guide, the mentor" (ibid., p. 147).

The depiction of the whole man, his development, sense of dignity and decency in living was his concern. He is, therefore, legitimately called a humanist of the highest order. Man is unprotected everywhere and the annihilation of his precious individuality is a matter of concern for all humanists.

The Barber's Trade Union, the story of a young dynamic barber, is a satisfying diversion from the grave novels- Untouchable, Coolie and the Lalu trilogy that preceded it. It depicts the conflict between a barber boy and the traditional society. A recurrent

theme- the exploitation of the poor, the downtrodden and the oppressed- is given a deft touch of humour. The plot is a dialectical rubric of various opposites namely: upper caste orthodox society versus individual, speech versus silence, myth versus reality, power of authority versus powerlessness of socially, economically and politically marginalised. As a proletarian humanist Anand has full faith in human dignity and potentiality of man. This paper locates its argument in the very act of reclaiming this dignity denied to the protagonist by the high-caste Hindus. Chandu is a brilliant example of how a subaltern cannot be forced in to silence if he/she chooses to assert his/her 'being'.

The setting of the story is a typical North Indian village. The anonymous narrator is a character in the story and events are reflected through his consciousness. However, the narrator is sympathetic towards the protagonist. The events in the story are an outgrowth of its central character named Chandu. He is introduced by the story writer, as if in a mock-heroic fashion, rendering him heroic heights. "Among the makers of modern India, Chandu, the barber boy of our village has a place, which will be denied him unless I press for the recognition of his contribution to history" (U.D. padamwar, 2010: 169). Chandu is both an individual and a type. Although, he unconsciously embarks on an exploit eventually it brings about his emanation. We are told that chandu is natively egotistical like great men of India, but unlike them he nourishes no exaggerated opinion about himself. Chandu's portraiture as the underprivileged lad of the village is highly realistic. At school he is weak in Mathematics, but he is not solely responsible for it. He has to run his hereditary profession on behalf of his father. He is sent out for hair-cutting in the village and this keeps him too occupied to devote time to his studies.

The narrator's mother constantly dissuades him from playing with Chandu saying that he is a low-caste barber's son and that he the narrator must keep his status quo of his caste and class. Chandu's schooling comes to standstill due to his father's demise. At a tender age, chandu embarks upon his profession wholeheartedly and, as a routine, makes rounds of the high-caste village for shaving and hair-cutting.

All goes well until one day Chandu decides to dress up like the city doctor Kalan Khan in a white turban, a white rubber coat

with a leather bag in hand. The doctor's dress symbolizes an agreeable change from the worn out monotonous routine life. His fascination for medical profession is, after all, justifiable for historical reasons. Chandu is conscious of his heritage, for he says; he "learnt how to treat pimples, boils and cuts on people's bodies from my father, who learnt them from his father before him".

Chandu's appearance in new attire causes unprecedented uproar and chaos in the village. The stratified society that believes in hierarchy pooh-poohs him. Having seen Chandu in a new robe the dogmatic and orthodox landlord threatens to have him flogged if he does not revert to wearing clothes befitting "his low status" as a barber. He chastises Chandu barbarously: "The son of the pig! Get out! Get out! ... You will defile my religion". Chandu is instantly made aware of his reality and that he cannot dream of otherwise that what he is. Did Chandu commit a sin by wearing a dress like that of Kalan Khan's? De facto, innocent low-caste people like Chandu, Bakha and Munoo are always despised and humiliated for no fault of theirs. The orthodox society makes Chandu realize that a low-caste boy is not entitled to such felicity and he is permanently destined to serve the upper caste society. The village Sahukar goes a step farther and hurls malicious abuses on him: "You little swine, you go disguising yourself as a clown when you ought to be bearing your responsibilities and looking after your mother".

Pandit Parmanand, the keeper of the village shrine disdainfully bullies Chandu: "He is a low-caste devil! He is a rogue!" Chandu is utterly mortified at this treatment however, Chandu withstands every adversity heroically and there lies the difference him and Anand's other protagonists like Bakha and Munoo. They would have resigned and succumbed to the formidable social strictures. Chandu is the rarest of whole humanity. He is bent on subverting everything orthodox. He despised and humiliated, though, he resorts to revolution with a view to teaching the hypocrites a lesson.

In spites of his low-status, Chandu is not a dummy. He is clever and witty and cannot be taken for a ride. He represents the modern man in the modern world. He believes in putting things upside down. He wills to write his own destiny and the destiny of his fellow-brothers by conquering his adversaries. He

vows to avenge himself on the orthodox idiots. He ceases to dance attendance to the high-caste notables and others. Instead, he frequents the town to earn his daily bread.

Chandu not only designs an ingenious scheme but he also takes the other barbers in his confidence as well as convinces them that "it was time the elders of the village came to the barbers than they should dance attendance upon their masters" (A. C. Thorat, 2009). The repercussions of the strike are all pervasive, causing problems and inconvenience. As a result the landlord's face is dirtied by the white scum of his unshaved beard; the Sahukar looks like a leper with the brown tinge of tobacco on his walrus moustache. Naturally the village elders become a laughing stock of the common people. Chandu's move for non-cooperation succeeds according to his design.

While Chandu prospers in the town the villagers face an awkward situation. They approach the barber at Verka with a double pay offer but in vain. Chandu summons all the barbers within a range of seven miles from his village and the barber-brotherhood launches 'Rajkot District Barbers' Hairdressing and Shaving Saloon', heralding the new age of freedom and justice. In the 1930s when Anand wrote this story, social stigma like casteism and untouchability were rampant. The proletariat and the have-nots were considered barbaric and subhuman. Hence, Chandu's victory over the orthodox and repressive traditions assumes greater significance in the backdrop of contemporary Indian society. Chandu's victory is not individual but a victory of freedom, justice and human dignity.

Chandu is not a passive sufferer of the atrocities of high-caste but protests against the evils of stratified society. He subverts dogmatism and fights to seek his identity. He makes the orthodoxy realize its moral inferiority in trying to take away his freedom and dignity. The character symbolizes a mode of an unequal and uneven process of representation. The story deconstructs the prevailing understanding of the dominant upper class ideologies to neutralize the elitist bias that had, until now, effectively silenced the voice of the powerless.

References:

Anand, Mulk Raj (1975): Apology of Heroism: A Brief Autobiography of Ideas, New Delhi: Heinemann.

Goswami, Ketaki (2009): Mulk Raj Anand: Early Novels, New Delhi: PHI Learning Private Limited.

Iyenger, K. R. Sriniwasa (2001): Indian Writing in English, New Delhi: Sterling Publication, pp.331-357.

Padamwar, U. D. (2010): "Overcoming Marginality: The barber's Trade Union". International Refereed Research Journal. Vol. II. 18, 13.

Rawat, B. K. (2011): Mulk Raj Anand: A Critical Study, New Delhi: Omega Publications.

The Baber's Trade Union and Other Stories (1944): Jonathan Cape, London.

Thprat, A. C. (2009): "Chandu in Mulk Raj Anand's, Barber's Trade Union: An Outsider Insider." International Research Journal. Vol. I. 16, 21-23.

Dr. Indrajit Kumar, indrajitkbc@gmail.com, Assistant Professor, P.K.R.M.College, Dhanbad, VBU, Hazaribag

ছড়ায় কবিতায় খাদ্য উপকরণ

সমরেশ ভৌমিক

লোক সাহিত্যের এক বিশেষ উপাদান হল ছড়া। ছড়া কেবলশিশু পাঠ্য বা শিশু মনোরঞ্জনের বিষয় নয়। ছড়া সে প্রচলিত বা অপ্রচলিত যাই হোক না কেন তার উপাদানগুলি সংগৃহীত হয় চলমান সমাজ থেকে। নিত্যদিনের ঘটনা, গৃহস্থালীর নানা জিনিসপত্র আহার্য সামগ্রী সবকিছুকে গ্রহণ করে ছড়া হয়ে ওঠে রসালো, তার সুস্বাদু রস পান করে পাঠক তৃপ্তির স্বাদ পান। শিষ্ট সাহিত্যও সমাজ মানুষের প্রতিবিম্ব। তার অগাধ প্রসারিত জলাশয়ে ছায়া পড়ে কত না বিষয়ের। জীবনের প্রতিটি পল, অনুপল, অনু পরমাণুর রহস্য রোমাঞ্চময়তা নিয়ে তা নিত্য গতিশীল। এখানেও মানুষের নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের বিচিত্র পসরা। তার জন্ম বিবর্তন, বাধ্যক্য, মৃত্যু সবই যেমন সাহিত্য উপাদান হয়ে ওঠে তেমনি নিত্য ব্যবহার্য খাদ্য-সামগ্রীও তার এর পাতায় পাতায় ভিড় করে বিচিত্র বিষয়ের অনুপুঙ্খে। জীবনের নানা ওঠা পড়া, বা সমাজ ইতিহাসের বিবর্ণতায় কুঁজ গলগণ্ড যেখানে উপামিত হয়—“নষ্ট শস্য-পচা, চালকুমড়ার ছাঁচে সেখানে লোক ছড়াকার কবি সে পথে হাঁটিতে চাননা। তিনি হয়তো তখন শিষ্ট সাহিত্যের খাদ্য উপকরণ চালকুমড়ো দিয়ে বানিয়ে চলেছেন ছেঁকি কিংবা ফুলবড়ি। কবিতার বাগানে ফলে থাকা খাদ্য সামগ্রী অচিরেই লোক কবিতা ছড়ার ভিতরে থেকে হেঁসেলে পরিণত হয় সুস্বাদু খাদ্যে।

কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি। আরো অনেক কিছুতে বাঙালির নাড়ির যোগ থাকলেও তার প্রিয় খাদ্য যে ভাত তা বোঝা যায় শুধু তার অভাবে কিছু দিন অন্য খাবার খেতে হলে। এই ভাতের প্রধান আধার ধান। বাংলা কবিতায় নানা সময়ের নানা কবিরা ধানকে ব্যবহার করেছেন নানা ভাবে। যেমন—

“গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।[১]
কিংবা। শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।”[২]

কবির কাব্য সম্পদ এখানে উপমিত হয়েছে আমাদের জীবনে অপরিহার্য খাদ্য উপাদান ধানের সঙ্গে।

কবির মন যখন প্রকৃতির ঋতুরঙ্গে আনন্দে হিন্দোলিত হয় তখনও তাঁর মনে ভাসে ধানের ক্ষেতের কথা।”

‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলারে ভাই লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলারে ভাই [৩]

বাংলা কবিতায় ধান প্রতীক অনুষঙ্গ পায় রবীন্দ্রপরবর্তী খ্যাতকীর্তি কবি জীবনানন্দের হাতে। বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী সামাজিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও বিশ্ববিধানের কেন্দ্র থেকে উঠে নানা সংশয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েন কবি। তাই তাঁর কাব্য থেকে কাব্যান্তরে ফসল বীজ ধান আর ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের মায়াবী রূপ নিয়ে হাজির হয়না। কবির স্মৃতি সত্তায় বেঁচে থাকে বিনষ্টির বীজ ধান রূপে। ‘বোধ’ কবিতায় তাই কবি বলেন—

“সকল লোকের মত বীজ বুনে আর
স্বাদ কই ফসলের আকাঙ্ক্ষায় থেকে।”[৪]

‘অবসরের গান’ কবিতায় কবি ‘ধান’কে বহুমাত্রিক ভাবে উন্নীত করেন আট বার ব্যবহার করে।

(১) শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে’।[৫]

(২) তাহার আস্বাদ পেয়ে অবসাদে পেকে ওঠে ধান,[৬] দেহের স্বাদের কথা কয়;

(৩) শরীর এলায়ে আসে এই খানে ফলন্ত ধানের মত করে[৭]

‘পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।”[৮]

(৫) কিংবা

“ফলন্ত ধানের গন্ধে রঙে তার স্বাদে তার ভরে যাবে আমাদের সকলের দেহ”[৯]

(৬) “সবুজ ধানের নিচে-মাটির ভিতরে
ইঁদুরেরা চলে গেছে; আঁটির ভিতর থেকে চলে গেছে চাষা।[১০]

(৭) ‘অগাধ ধানের রূপে আমাদের মন
আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।[১১]

(৮) ‘সময় হাঁকিয়া যায় পেঁচা তাই আমাদের তরে!
হেমন্তের ধান ওঠে ফলে’ [১২]

এখানে কবি ধানকে ধান্যজাত খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত করে জৈবিক ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা না করে তাঁর আঘ্রাণকে ভালোবেসে সুখোকর স্বাদ নিয়ে জীবনকে পরিপূর্ণ করতে চান।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যের (পেঁচা' কবিতায়)

পৃথিবীর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে উপমিত করেন ধানক্ষেতের সঙ্গে—

'ধান ক্ষেতে মাঠে
জমিছে ধোঁয়াটে
ধারালো কুয়াশা'।[১৩]

প্রকৃত পক্ষে বাঙালি কবি (সাধারণভাবে) বাংলার নদী, মাঠ, পথ ঘাটকে ভালোবাসা কবি বাংলার মুখকে দেখতে পেয়ে পৃথিবীর মুখকে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না, কারণ তিনি তো সেই পরিপূর্ণ বাংলায় ফিরে আসতে চান যেখানে 'হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে

হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে।"

দেখিবে ধবল বক, আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে সোনালী ধান বা ধানের ক্ষেত কবির মানসভূমিতে এমনভাবে স্থান পায়, যাকে কবি সঞ্চারিত করে দিতে পারেন পৌরাণিক কাহিনির মধ্যে। বেহুলার পাণ্ডুড়ের জলে এককভাবে ভেসে চলার মধ্যেও পটভূমি হয়ে উঠে আসে ধানের ক্ষেত ঃ

'অথবা বেহুলা এক যখন চলেছে ভেঙে গাঙুরের জল
সন্ধ্যার অন্ধকারে, ধানক্ষেতে আমবনে, স্পর্শ শাখায়
কোকিলের ডাক শুনে চোখে তার ফুটেছিল কুয়াশা কেবল।'[১৪]

(এখানে আকাশনীল)

'ধানকাটা হয়েগেছে' কবিতার 'ধান' কবির কাছে নিঃসঙ্গতার প্রতীক, যুগোচিত বিষণ্ণতা ধানের রূপ নিয়ে হাজির হয়।

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতা কুটো ভাঙা ডিম-সাপের খোলস নীড় শীত,[১৫]

'আমাকে তুমি' কবিতায় 'সমাসোক্তি অলংকার প্রয়োগ করে 'দুপুরের বাতাসে নায়িকার ব্যবহার আরোপ করে তাকে বর্ষীয়সী রমনীর মতো ধান ভানার কাজে যুক্ত করেন—

"খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধানভানেগান
গান গায়—
এই দুপুরের বাতাস।"[১৭]

আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হাতে ধান শস্য এযুগের নিঃস্বতা, রিক্ততার প্রতীক হিসাবে উঠে আসে। তাঁর 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ' কাব্যের জরাসন্ধ কবিতায় তাই কবি বলেন—

'আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে।
....................। এমাঠ আর নয়,
ধানের নাড়ায় বিঁধে কাতর হ'লো পা।[১৮]

কিংবা ঐ একই কবিতার পরবর্তী পংক্তিতে ধান শস্যটি 'পচা' ধানের অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়—

পচা ধানের গন্ধ, ডুবো জলে তেচোখা মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি সারি তোর ভাঁড়ারের নুন মশলার পাত্র হ'লো মা।"[১৯]

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'চিরকুট' কাব্যের 'স্বাগত' কবিতায় আধুনিক নাগরিক সভ্যতার সম্প্রসারণে হারিয়ে যাওয়া গ্রামকে প্রত্যক্ষ করেন বুকভরা ধানের মাঠের মধ্যে। ধান এখানে খাদ্যের সম্ভার নিয়ে হাজির হয়না; বরং শূন্যতার মধ্যে পরিপূর্ণতার প্রতীকে উপস্থাপিত হয় ঃ

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর শূন্য গোলা
ধান বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকনো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,"[২০]

তবে কবি আশাবাদী কারণ—

'মাঠের সোনালী ধান গুচ্ছ গুচ্ছ বাড়ে।"[২১]

শহরের বুকে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলি আবার স্বপ্ন দেখে গ্রামীণ নবান্নের—

"প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে
আকাশে নক্ষত্র ফোটে
নদী করে সম্ভাষণ পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধ নেত্রে
ধান আর ধান।"[২২]

'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যগ্রন্থের 'একটু পা চালিয়ে ভাই' কবিতায় যুগ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কবি যাতনার শুরু ও সমাপ্তি সন্ধানে অগ্রসর হয়ে ভাবেন—

'ধানের মধ্যে বীজের পরম্পরায় অন্তহীন ধান? নাকি/কাঁধে তোলা খাটিয়ার আগে আগে ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া

ভাঙানো পয়সার টোপে গাঁথা হরিলুটের খই?[২৩]

শিষ্ট সাহিত্যের কবিতায় 'ধান' কেবল মানুষের বিশেষ খাদ্য উপকরণ হিসাবে বর্ণিত হলেও (যদিও ধান নির্মিত খাদ্য সম্ভারের অভাবও নেই) লোক সাহিত্যে বিশেষত বাংলা ছড়ার এটি নিছক খাদ্য উপকরণ থেকে পরিণত হয়েছে নানা স্বাদের হরেক রকম সুস্বাদু খাদ্যে।

প্রথমে প্রচলিত ছড়াগুলিতে ধান্য নির্মিত নানা খাদ্য সম্ভারগুলি দেখা যেতে পারে। যেমন—

।। এক।। মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর

কখনো মাসি বলেননা যে খই মোয়াটা ধর।[২৪]

ধান থেকে খই ও খই থেকে সুস্বাদু মোয়া যে কখন সাধারণ খাবার থেকে সোহাগের প্রতীকে উত্তীর্ণ হয় তা কিন্তু ছড়াকারই দেখতে পারেন।

।। দুই।। ধান থেকে সুস্বাদু খাবার চিড়া তৈরীর কথাও পাই প্রচলিত ছড়ায়—

"ঘুম ঘুমানী মাসি গো ঘুম দিয়া যাও।
বাটায় বাটায় পান দিব গাল ভরে খাও।।
খোকা হাসে খোকা নাচে, কথা কইয়া যাও।
দধি চিড়া খাইয়া তুমি ঠাণ্ডা হইয়া যাও।
আমার খোকার চোখে একটু ঘুম দিয়া যাও।"[২৫]

।। তিন।। ধান থেকে ভাত তো বাঙালির প্রধান খাদ্য। তাই ছড়াতে ভাতের ছড়াছড়ি—যেমন—

(ক) বাছা গিয়ে উত্তর পাড়া।
ভাত হইয়ে যে কড়কড়া [২৬]
(খ) শাউড় নাই ননদ নাই কারে করমু ডর
আগে বাড়ুম ভিজ্যা ভাত পাছে মুচুমঘর [২৭]

।। চার।। ধান থেকে চাল তা থেকে মনভুলানো খাবার চাল ভাজার কথাও সমাদরে বলে বাংলা ছড়া—

'চালভাজা খই ঘরে ঘরে
তিল ভাজা খই গন্ধ
রাজার বাড়ি বিয়ে হবে হাজার টাকা দণ্ড।'

কেবল প্রচলিত ছড়া নয় বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় কবিরাও তাঁদের নির্মিত

ছড়াতে ধান নির্মিত চাল থেকে সুস্বাদু সবখাবার বানিয়েছেন। উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী তাঁর 'কমলা নাপিত' কবিতায় বলেন—

"ধান হলে ভাত খেয়ে হব মোটা তাজা
তখন বরং আমায় খেয়ে দিসরে ব্যাটা সাজা।"[২৮]

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'ঝিঙে ফুল' কাব্যগ্রন্থের 'খুকীও কাঠবেড়ালি' ছড়ায় ধানকে মুড়ি ও ভাতে পরিণত করে সন্তুষ্ট হবে তারও তালিকা বানিয়েছেন—

'কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও
গুড় মুড়ি খাও? দুধ ভাত খাও? বাতাবিনেবু লাউ?[২৯]

দুধের সঙ্গে ভাত কিংবা মুড়ির সঙ্গে গুড় যে আজও বাঙালির প্রিয় খাদ্য তাও বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুকুমার রায় তাঁর 'খাই খাই' ছড়ায় যে খাদ্য সম্ভারে তালিকা দেন তা অসাধারণ—

"খাই খাই কর কেন, এস বস আহারে
খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে।
যত কিছু খাওয়া লেখে বাঙালির ভাষাতে,
জড় করি আনি সব থাক সেই আশাতে।
ডাল ভাত তরকারি ফলমূল শস্য,
আমিষ ও নিরামিশ চর্ব্য ও চোষ্য,
রুটি, লুচি, ভাজাভুজি, টক ঝাল মিষ্টি,
ময়রা ও পাচকের যত কিছু সৃষ্টি।"[৩০]

এক অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি এখানে ব্যাঙ, আরশুলা, বিড়ি, এমনকি সুদকে খাদ্যে পরিণত করে অসাধারণ কাব্য ও হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একধাপ এগিয়ে তাঁর 'দামোদর শেঠ' ছড়ায় ধান থেকে মুড়ি তার থেকে মুড়কি ও সবশেষে মুড়কির মোয়া তৈরী করে তবেই স্বল্পে না খুশি দামোদর শেঠের রসনা পূর্ণ করেছেন—

'অল্পেতে খুশি নয় দামোদর শেঠ কি;
মুড়কির মোয়া চাই, চাই ভাজা ভেট্‌কি।'

আশুতোষ ভট্টাচার্যের বাংলার লোক-সাহিত্য গ্রন্থে উল্লিখিত একটি প্রচলিত ছড়াও মুড়কি ও খই ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির আতিথেয়তা বিধানে বাংলা দেশের লোক সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়েছে—

'ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো।।

শান বাঁধানো ঘাট দেব বেসম মেখে নেয়ো।
শীলতপাটি পেড়ে দেব পড়ে ঘুম যেও।।
আম কাঁটালের বাগান দেবো ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব কাঁধে করে নেবে।।
দুই দুই বাঁদি দেব, পায়ে তেল দেবে।
উলকি ধানের মুড়কি দেব। নাবেঙ্গী ধানে খই।
গাছপাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি ভরা দই।।
বস্তুত রবীন্দ্রনাথও ওই ছড়াটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে—
'লোকসাহিত্য গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।' [৩১]

মধ্যযুগের খ্যাতকীর্তি কবি কৃত্তিবাস ওঝা তাঁর অনুবাদমূলক 'শ্রীরাম পাঁচালিতে' বাংলাদেশের খাদ্য ফসল গুলিকে ব্যবহার করেন আতিথেয়তা বিধানে। চণ্ডাল গুহকের কাছে অতিথি বেশে উপস্থিত হয়েছেন ভরত। গুহক তখন ভরতকে নারকেল, কলা, আম, কাঁঠাল দুধ প্রভৃতি দিয়ে সাদরে বরণ করে নেন।

আধুনিক ছড়াকার ভবানী প্রসাদ মজুমদার তাঁর 'ছড়ার ভিড় আবৃত্তির' গ্রন্থে 'পৌষ পার্বণের নেমন্তন্ন' ছড়ায় আনায়াসে বানিয়ে ফেলেন দুধ নারকেলের মন ভোলানো সব পিঠেপুলি, কবিতার ডাল শস্য দিয়ে বানিয়ে ফেলেন 'মুগ-সাউলি', দুই নারকেলের সরুচাকলি'—

"এই যে ভায়া, পার্বণেতে তোমার 'নেমন্তন্ন'
আমার বাড়ি আস্‌লে তুমি সত্যি হবে ধন্য।
পৌষ পার্বণ নামটি শুনেই মনকি সুখে ভাসছে?
পিঠে পায়েস পুলি গন্ধে জিভে কি জল আসছে?
'গোকুল-পিঠের' নাম শুনেছ? কিংবা পাটি সাপটার?
কোন্ পিঠেটা বিফোর খাবে? কোন্‌টা খাবে আফটার?
'আসকে' পিঠে বাসকে ভরে রাখলে কি হয় মিষ্টি?
'ভাজা-ভিজে-শুকনো-সরস' শুনবে পিঠের লিষ্টি?
'মুগ-সাউলি' কোথায় পাব? জানো মুগের মূল্য?
'সরু-চাক্‌লি' খেয়েই কত পাগল পটল তুলল।
'দুধ পুলি' আর খাবে কি তাই, দেখছ না কী ঠাণ্ডা
গোরুর বাঁটেই দুই জমে যায়, যতই মারো ডাণ্ডা।' [৩২]

জীবনানন্দের কাব্যে চালকুমড়ো সাধারণ পচনশীল সব্জি হিসাবে উপস্থিত।

আধুনিক সভ্যতার বিনষ্টির ক্ষত ও যন্ত্রণাকে উপমিত করেছেন চালকুমড়োর পচে যাওয়ার সঙ্গে। 'বোধ' কবিতার সেই অবিস্মরণীয় কয়েকটি পংক্তি—

'যেই কুঁজ-গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শস্য-পচা চালকুমড়ার চাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব।' [৩৩]

বাংলা খেলাধূলা মূলক ছড়ায় কিন্তু কুমড়ো কেবল একটি ফসল সব্জি হিসাবে থাকেনি। ছড়াকার তা দিয়ে বানিয়েছেন ঝোলের মত খাদ্য সামগ্রী—

'কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্।'

আধুনিক কবি জীবনানন্দের অনেক কবিতার শস্যগুলি নিজস্ব নাম বা প্রতীক পায়নি। যুগের ক্লান্তি ও বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়ে কবি কখনও শস্যকে রিক্ততার প্রতীক ভেবেছেন আবার কখনও মৃত্যুর পরবর্তী শীতল শবও ভেবেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপির' 'মাঠের গল্প' কবিতার অন্তর্গত, 'পঁচিশ বছর পরে' কবিতায় কবি দেখেন—

"দিকে দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা,
শিশিরে গিয়েছে ভিজে পায়ের উপর
পাখির ডিমের খোলা ঠাণ্ডা কন্‌কন্
শস্যফুল-দু একটা নস্ট সাদা শস্য।" [৩৪]

কিংবা 'বনলতা সেন' কাব্যের 'সুচেতনা' কবিতায় শস্যকে কবি মনে করেছেন 'মানুষের শব'—

'কেবল জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিতে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব। [৩৫]

বাংলা ছড়ায় অনেক সময় শস্যের নাম নেই। কিন্তু তা থেকে নির্মিত খাদ্য সামগ্রীর উল্লেখ দেখলে বোঝা যায় শস্যের প্রকৃতিগুলি। ছড়া আসলে মানুষের সহজতা, সরলতা, ও একান্ত ভালোবাসার অনুভূতি জাত। তাই এগুলি খাদ্য উপাদান নয়, খাদ্য হিসাবেই সাধারণ মানুষ ও শিশুদের কাছে উপভোগ্য হয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের উদাহরণগুলি থেকে শস্যের প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে। ভবানী প্রসাদ মজুমদারের 'হরেক রকম খাবারদাবার' ছড়ায় খাবারের সমারোহ সত্যি লোভনীয় এবং তার সবকিছুই তৈরী বাংলাদেশের প্রকৃতিতে ফলা শস্য উপাদান থেকে। যেমন—

'কেউ বলে ছ্যাঁচড়া, কেউ বেলে ছেঁচকি

মুড়ো চুড়ো দিলে খেতে পারি পাঁচ—ডেচকি!
কেউ কয় শুক্তানি, কেউ কন শুক্তো
বড়ি টড়ি দিলে মেলে তড়িঘড়ি সুখতো!
কেউ বাঁধে চচ্চড়ি, কেউ ঘ্যাঁট-ঘন্ট
যত পাই তত চাই, খেতে উৎকণ্ঠ
কেউ রাঁধে লাবড়া, কেউ দম ডালনা
যেতে রাজি হাবড়া কাটোয়া বা কালনা!

কেউ রাঁধে কোপ্তা, কেউ রসা কালিয়া
চোখের নিমেষে সব চেটে পুটে খা লিয়া!
কেউ রাঁধে কোর্মা, ভরতা বা দোলমা
পেট ফুলে জয়ঢাক তোল্ টেনে তোল মা!

পাতুরি মালাইকারি ভাপা-দই সরষে
দেখে মাছ, জুড়ি নাচ, মনে মনে জোরসে!
টোস্ট রোস্ট বোল-ফ্রাই, ঝাল কোন চাটনি
যত খুশি দিয়ে যাও হোক খেতে খাটনি।

বলিস কি আরো আছে, দো-পিঁয়াজি-বিরিয়ানি?
দাঁড়া ভালো করে বসি, আরো দুটো পিঁড়ি আনি।
চিকেন-মাটন-চাপ, গ্রিন-হ্যাম-রেজালা
খাইয়ে মারবি নাকি? যত খুশি দে জ্বালা।
আলো নানা মিষ্টি মার্কেটে ঘুরিয়া
তরতাজা সরভাজা, খাজা, সরপুরিয়া!
মিহিদানা-সীতাভোগ আন দেখি খুঁজিয়া
বালুসাই চমচম, বোঁদে-গজা-গুজিয়া!
পান্তুয়া-রাজভোগ, সন্দেশ-বরফি
আমি মরি মরব, তাতে ক্ষতি তোর কী?
তোর তো পেটের ব্যামো, তুই অতি অবিশ্যি
ভাতে ভাত রেঁধে কর ঘি দিয়ে হবিষ্যি! [১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' কাব্যের 'নাম কবিতায় খাদ্য উপকরণ হিসাবে 'দুগ্ধে'র উল্লেখ আছে। কচ গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপান্তে দেবলোকে ফিরে যাবে। তার প্রতি নিবেদিত প্রাণ দেবযানী কচকে মনে করিয়ে দিতে থাকে পুরানো দিনের কতনা

স্মৃতি। এক সময় আবেগ তাড়িত হয়ে বলে ফেলে—

"মনে রেখো আমাদের হোক ধেনুটিরে,
স্বর্গসুধা পান করে সে পুণ্য গাভীরে
ভুলোনা গরবে।" [১৭]

তার উত্তরে কচ বলেছিলো—

"সুধা হয়ে সুধাময়
দুগ্ধতার; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তি স্বরূপিনী শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী।" [১৮]

দুধ সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলেও আধুনিক যুগ মায়ের পেটের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নিয়ে তাকে দুগ্ধ হীনতার প্রতীকে রূপান্তরিত করে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাঁর, 'ঈশ্বর থাকেন জলে' কাব্যের 'আমি সহ্য করি' কবিতায় দুধকে ব্যবহার করেন এভাবে—

"...............যেন আমি
দেড়বস্তা রাক্ষুসে বাচ্চার জন্যে দুধহীন মাই খুলে রেখে বসে থাকি
আর দাঁত চিবোয় চামচিকে মাংস তার............খেলা করে,............" [১৯]

বাংলা ছড়া কিন্তু দুধকে এত রূপক প্রতীকে না দেখে ছোট শিশুর উপযোগী করে বানিয়ে ফেলে একাধিক দুগ্ধজাত সামগ্রী। উদাহরণ গুলি অসাধারণ—

(ক) শিয়ালের বিয়ে হল ক্ষীরনদীর কূলে
বাপ দেয় ধান দূর্বা মা দেয় ফুলে।

(খ) অন্নপূর্ণা দুধের সর
কাল যাব মা পরের ঘর।

(গ) আলু পাতা আলুথালু ভ্যান্না পাতায় দই
সকল জামাই খেয়ে গেল গোদা জামাই কই

(ঘ) এক পো দই কিনেছি কী হবে তা বলো না?
ক্ষীর হবে সর হবে ছাপা হবে মাখন হবে।

(ঙ) দুধ মিঠে দই মিঠে আর মিঠে নবনী
সংসার দুর্লভ মিঠে যা বড়ো জননী।

(চ) ভাই ফোঁটাতে বোনটি মাতে?—ছড়ায় ভবানী প্রসাদ মজুমদার—বানিয়ে ফেলেন দুগ্ধ নির্মিত নানা খাবার—

'ভাই ফোঁটাতে ভাইকে ফোঁটা বোন দেবে তাই আজ

সকাল থেকেই ছোটবোনের হাজার রকম কাজ।
ভায়ের কপালে দিবি ফোঁটা?
রাজভোগ আন গোটা-গোটা
দই সন্দেশ খেয়েইতো ভাই
দিব্যি হবে মোটা সোটা।[৪০]

শিষ্ট সাহিত্যে যা খাদ্য উপকরণ হিসাবে উপস্থিত ছড়াতে তা কেন খাদ্য সামগ্রিতে পরিণত হয়েছে? সাহিত্যের পরিবেশ পরিস্থিতি দৃষ্টিভঙ্গী জনিত কারণ এর মূলে আছে বলে মনে হয়। শিষ্ট সাহিত্যের কবিতায় শৈলী বিধানে অর্থকে প্রতীকী করার যে প্রয়াস থাকে, লোক সাহিত্যের উপাদানে সাধারণত তা থাকেনা। ছড়া বিশেষত শিশুর চিত্তমনোরঞ্জনে সহায়ক হওয়ায় তার কাছে তার মন মেজাজ ও চাহিদার উপযোগী করে ছড়াকে উপস্থিত করার একটা তাগিদ ছড়াকারে থাকে। গ্রাম্য সাহিত্য হিসাবে ছড়া-শুধু নয় সমস্ত লোকসাহিত্য নির্দিষ্ট পাত্র পরিবেশ প্রভৃতির সময়পোযোগী হতে যখন খাদ্য উপকরণকে খাদ্যে পরিণত করে তখন তা পরিবেশক ও শ্রোতার কাছে বিশেষ উপভোগ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর 'লোকসাহিত্য' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখিয়েছেন লোকসাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির যোগ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠাকে।

"একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা রাজশাহীর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোট ছোট গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলার পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময় দেখা গেল প্রায় দশবারো জন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জলে ঠেলিয়া দ্রুত বেগে চলিয়াছে। গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারং বারং আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুবতী, ক্যান বা কর মনভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা দামের মোটরি।"

ভরা বর্ষার জল প্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে পাঠক মাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুইটি চরণে সেই শৈবাল বিকীর্ণ জনমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল (৪১)

একথা তাই সহজে বলা যায় ছড়ায় উল্লিখিত খাদ্য সম্ভারের স্বাদ সবার জানা থাক বা না থাক কোথাও পাওয়া যাক বা না যাক তাতে কিছু যায় আসে না। ছড়া পরিবেশন কালে অনাবিল আনন্দের সঙ্গে কল্পনার রহস্যালোকে বিচরণ করাতে এগুলি জুড়িমেলা ভার।

তথ্যসূত্র ঃ

১। 'সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারুল প্রকাশনি ১ম সংস্করণ ২০০২, পৃ. ৬৯
২। ঐ পৃ-৬৯
৩। গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এস. বি. এস পাবলিকেশন? তৃতীয় প্রকাশ ১৪২০, পৃ. ৪১৭।
৪। জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠকবিতা, নিউ স্ক্রিপ্ট, সপ্তম সংস্করণ, শারদীয়া ১৪১০, পৃ. ২৪
৫। ঐ পৃ-৩০
৬। ঐ পৃ-৩০
৭। ঐ পৃ-৩০
৮। ঐ পৃ-৩০
৯। ঐ পৃ-৩১
১০। ঐ পৃ-৩২
১১। ঐ পৃ-৩৩
১২। ঐ পৃ-৩৯
১৩। ঐ পৃ-৩৯
১৪। ঐ পৃ-৪৯
১৫। ঐ পৃ-৫০
১৬। ঐ পৃ-৫১
১৭। ঐ পৃ-৫৩
১৮। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দেজ পাবলিশিং, পঞ্চবিংশ সংস্করণ, জানু ২০১৪, পৃ-১৯
১৯। ঐ পৃ-১৯
২০। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠকবিতা, দেজ পাবলিশিং, দ্বাদশ সংস্করণ জানু ২০০৮, পৃ-৩২
২১। ঐ পৃ-৩২
২২। ঐ পৃ-৩৩
২৩। ঐ পৃ-১৩৪
২৪। বাংলা ছড়া পরিক্রমা, (সম্পাদনা) বরুণ কুমার চক্রবর্তী, অক্ষর প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০১৪, পৃ-২৪
২৫। ঐ পৃ-৩৩
২৬। ঐ পৃ-৫৯

২৭। ঐ পৃ-৫৯

২৮। সেরা আবৃত্তির কবিতা সংগ্রহ, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), সূর্য পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ -২০১১, পৃ-২৯

২৯। সঞ্চিতা, কাজী নজরুল ইসলাম, ডি. লাইব্রেরি, দ্বাষষ্ঠিতম সংস্করণ-১৪২২, পৃ-১৬২।

৩০। সুকুমার রচনা সমগ্র, সরস্বতী লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, পৃ-৫৫।

৩১। বাংলা ছড়া পরিক্রমা, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত), ২০১৪ পৃ-১২০

৩২। ছড়ার ভিড় আবৃত্তির, ভবানী প্রসাদ মজুমদার, নির্মল বুক এজেন্সি, প্রকাশ ২০০৫, পৃ-১০

৩৩। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২০, পৃ-২৭

৩৪। ঐ পৃ-৪১

৩৫। ঐ পৃ-৫৯

৩৬। ছড়ার ভিড় আবৃত্তির, ভবানী প্রসাদ মজুমদার, নির্মল বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ-২০০৫, পৃ-৪৫

৩৭। সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পারুল প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ ২০০২, পৃ. ১৫৩

৩৮। ঐ পৃ-১৫৩

৩৯। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং পঞ্চবিংশ সংস্করণ, জানু-২০১৪, পৃ-১০১

৪০। ছড়ার ভিড় আবৃত্তির, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, নির্মল বুক এজেন্সি, ২০০৫, পৃ-৯৩

৪১। লোকসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন-২০০৫, পৃ. ৫৯

ড. সমরেশ ভৌমিক, অধ্যাপক, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা

সোহারাব হোসেন ঃ কবিতার নবনির্মাণ

তৌষিক আহমেদ

বাংলা কবিতা সৃজনে বৈচিত্র্যের আস্বাদন এসেছে সোহারাব হোসেন-এর হাতে। স্কুল পাঠ্য ম্যাগাজিনে হাতেখড়ি হলেও সাহিত্যের অতল সাগরে ফেনা তোলার সহজাত প্রয়াস অতি অল্প বয়সে। নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে পেশাদারি ভাবনায় লিটল ম্যাগাজিনের নিয়মিত কবিতাকার তিনি। গদ্যের মৌতাতে রূপ নেয় কবিতার কায়া—বদলের চিরন্তনী ভাবনার কথাকলি এক লহমায় বিস্ময়ের পরিপূর্ণ আহ্বান সংগীতে রূপান্তরিত হয়। প্রচল কথাসাহিত্য ও গদ্য রচনার নিতান্ত অবসরে কবিতা এসেছে—তা অবহেলে, অসীম অনন্ত জিজ্ঞাসার ভাব প্রত্যয়ে জীবনের সমন্বয়ের যাদুযন্ত্র হিসাবে (যদিও সৃষ্টির চমৎকারিত্ব খর দাবদাহের মধ্যে প্রবল বর্ষার আধারে নির্ণিত যেন)।

কবিতা ও শিল্পের সমন্বয় সোহারাব হোসেন এর সহজাত। শিল্পের দাবিতে কবিতার ভাষা, শৈলী ও ভাবনার ঐশ্বর্যময় কারুত্বের বহমান স্রোতধারা অবলীলাক্রমে ধরিত্রীকে রসসিক্ত করে তুলেছে যেন। কবিতা তাঁর কাছে প্যাশন হলেও কবিতার স্বতন্ত্র বয়ন নির্মাণে নিজস্ব অবয়বকে দাঁড় করিয়েছেন তিনি, তাহলে—

"কবিতা কোনো একজন মানুষের দ্বিতীয় জীবন, দ্বিতীয় ভুবন। প্রথম জীবনের ঘটনা- আচরণ- কথাবার্তা- দর্শন-ভালো থাকা-মন্দ থাকার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কবি শৈল্পিক উড়ানের মাধ্যমে সেই দ্বিতীয় ভবন রচনা করেন।"[১]

কবি সোহারাব হোসেনও ব্যক্তি জীবন দর্শন ও ঘটনা প্রবাহে লেখনির উত্তুঙ্গ মাতন এনেছেন পুরোপুরি যাত্রায় তখন তিনি একাদশ শ্রেণিতে, চোখে দেখা সত্য, ব্যক্তিক অভিভাষণ, উপলব্ধি-অনুভূতির সচেতন প্রয়াস ও অপরিমেয় মায়ায় রসায়নে 'দ্বিতীয় ভুবন' রচনা করেছেন কবি। সৃষ্টির অবিস্মরণীয় রতনফলে পূর্ণ সেই ভুবন। পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর বহমানতায় কবি অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছেন। শিল্পী ও শিল্প সেখানে একাকার, শিল্পত্বের মোহনীয় যাদুভাণ্ডের প্রকাশমান রূপগুলি হল—

১। রক্তদেহে অন্যস্বর।

২। বৃষ্টির নামতা।

৩। কবিতা সংগ্রহ

প্রথম কাব্যগ্রন্থ দুটি কবির তরুণ বয়সে, বলা ভালো কবিতা রচনার প্রাথমিক পর্বে প্রকাশিত। কবি নিজে কাব্যের জগৎকে অন্যভুবন বা দ্বিতীয় জীবন ভাবলেও সেই জীবনকে সচেতনে-সযত্নে রক্ষা করতে পারেন নি। সংরক্ষিত না হওয়ার কারণে খুঁজে

পাওয়া যায়নি প্রকাশিত কবিতার গ্রন্থমালাকে। কবির একমাত্র পরিকল্পিত সংকলন 'কবিতা সংগ্রহ'। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘদিন আগে প্রকাশিত কবিতা এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে অনেকগুলি কবিতাকে একত্রিত করে ২০১৩ খ্রীঃ 'কবিতা সংগ্রহের' আত্মপ্রকাশ। যদিও কবির ব্যক্তিগত আগ্রহের চেয়ে অনেকাংশে বেশী মাত্রায় রসগ্রাহী পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গের হার্দিক প্রচেষ্টার উচ্চকিত সাফল্যের শিল্পসম্ভার। আবার এ কাব্যগ্রন্থে 'রক্তদেহে অন্য স্বর' এবং 'বৃষ্টি নামতা' পূর্ব প্রকাশিত সংকলনের কবিতাও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে।

প্রকাশিত-অপ্রকাশিত অথবা গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত মোট কবিতার সংখ্যা ৮৫টি। অসংখ্য কবিতা সংগ্রহের অভাবে লুপ্ত হয়েছে। এমনকি অনেক লিটিল ম্যাগাজিনে প্রকাশের পর তা তাঁর কবিতা সংগ্রহে আসেনি বা আসলেও তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয় নি। পরবর্তীকালে 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশের জন্যে নানাভাবে নানাস্থান থেকে কবিতাগুলি সংগৃহীত হয়েছে।

সোহারাব হোসেন এর কবিতার সরণিকে মোটামুটি ভাবে অনুসরণ করলে লক্ষ করা যায়, তাঁর প্রথম কবিতা রচনা ১৯৮৩ খ্রীঃ। কবি তখন বয়সকাল ১৮ বছর। দ্বাদশ শ্রেণি ছাত্র তখন। প্রথমাবস্থায় প্রবলভাবে তিনি কবিতা রচনার চর্চা করেছেন। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তা আবার ম্রিয়মানও হয়ে গেছে। কবিতা রচনার সংখ্যামান ও প্রকাশকালে তথ্যগত বিস্তারে দেখা যায়—

ক্রমিক সংখ্যা	সাল (খ্রীঃ)	প্রকাশিত কমিতার সাংখ্যমান
১	১৯৮৩	০২ টি
২	১৯৮৪	০৮ টি
৩	১৯৮৫	১৫ টি
৪	১৯৮৬	১৫ টি
৫	১৯৮৭	০৬ টি
৬	১৯৮৮	০৪ টি
৭	১৯৮৯	০৩ টি
৮	১৯৯০	০২ টি
৯	১৯৯৪	০১ টি
১০	১৯৯৫	০২ টি
১১	২০০০	০২ টি
১২	২০০১	০২ টি
১৩	২০০২	০১ টি
১৪	২০০৪	০১ টি
১৫	২০০৫	০৩ টি
১৬	২০০৬	০৩ টি
১৭	২০০৭	০৩ টি
১৮	২০০৯	০১ টি
১৯	২০১০	০১ টি
২০	২০১১	০৩ টি
২১	২০১২	০২ টি

* তিনটি (০৩) কবিতার কোনো পূর্ব প্রকাশকাল নেই।

উপরিল্লিখিত তথ্যাবলি এ প্রমাণ করে যে প্রথমদিকে নিয়মিতভাবে কবিতা রচনা করা চর্চার অসীমান্তিক প্রচেষ্টা থাকলেও পরবর্তীকালে তা ক্রমাগত কমে গেছে, বলা ভালো একেবারে লুপ্ত প্রায়। দুটি বছরে সর্বাধিক ১৫টি করে কবিতা রচনা হলে ও পরবর্তীতে ১টি বা ২টি কবিতা নিতান্ত খেয়ালী রচনার বৃত্তান্ত বলে মনে হয়। আবার ১৯৯০ সাল থেকে চার বছরে কোনো কবিতা মেলেনি এবং ১৯৯৪ সালে ১টি ও ১৯৯৫ সালে ২টি মাত্র কবিতা রচিত হলেও পরবর্তী পাঁচ বছরে একটি কবিতাও রচিত হয়নি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে ১৯৯০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে মাত্র ৩টি কবিতা রচিত হয়েছে। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছরে রচিত কবিতা বলির মধ্যে প্রথম দশ বছরে রচিত কবিতার সংখ্যা ৫৫টি। মাঝের দশ বছরে ৮টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এবং শেষ দশ বছরে মোটামুটিভাবে ১৭টি কবিতা পাওয়া গেলেও কয়েকটি কবিতার প্রকাশকাল একেবারেই পাওয়া যায়নি। আবার শতাব্দীর নিরিখে একবিংশ শতকে এসে তার কবিতার নির্মাণের সংখ্যা অত্যন্তভাবে কমে এসেছে। মাত্র ২৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। নব্বই এর দশকের পরবর্তীতে দেখা গেছে কবিতা রচনা ভীষণভাবে কম। এ সময়ে এসে গদ্য রচনা তথা ছোটগল্প রচনায় অত্যন্তভাবে নিমগ্নতায় কবিতার সংখ্যা নির্দিষ্ট হারে কমে এসেছে। বছরে একটি বা দুটি, আসলে স্রষ্টার যথার্থ পরিচয় দান নয় তা খেয়ালী মনের নৈমিত্তিক অবসর যাপন যেন। প্রথমদিকে কবিতা সৃজনার মধ্যদিয়ে সত্যকার শিল্প স্রষ্টা হওয়ার আত্মিক অনুভূতিময়তা থাকলেও

পরবর্তীকালে কথাসাহিত্যের যশ ও খ্যাতি তাঁকে কিছুটা কবিতা রচনার স্বতস্ফূর্ত প্রয়াস থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদিও প্রকাশিত কবিতাগুলির অধিকাংশই লিটল ম্যাগাজিনগুলির সাবলিল আত্মপ্রকাশের অতি আবদারিতে এবং সময় না পাওয়ার তাৎক্ষণিকতায় লেখা। কখনো অফিস (মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষৎ এর সভাপতি) ফেরৎ গাড়িতে বসে, কলেজের ক্লাস পাঠের অবসরে গল্পের মেজাজে আবার বইমেলার মাঠে কবি লেখক বন্ধুদের সঙ্গে অবাধ অড্ডার মাঝে কবিতার লেখনি সচল হয়ে উঠেছে তাঁর। স্বভাবতই বলা যায় কবিতার জন্যে তার স্পেশ অনেকখানি কমে গেছে। আসলে কবিত্বের শিরোনামে তাঁকে চিহ্নিত করা বড়ই কঠিন কাজ। কাঠিন্যের চরম ভাবময়তার মধ্যেই কবিতাকারের যথার্থ সাবলীল শিল্পত্বের অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

বাংলা কবিতার পালাবদল ইতিহাসের সময় পরিবর্তনের মতো সাবলীল-স্বাচ্ছন্দ্যময়। অতীত ঐতিহ্য থেকে সমকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের হাজার-হাজার কবির আত্ম-উপলব্ধি ব্যথা-যন্ত্রণা-অনুভূতির প্রকাশ কখনো গীতিকবিতা, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য, সনেট বা আধুনিক কবিতার নানা ছন্দবন্ধে প্রকাশিত হলেও কালের অক্ষরটীকা যে সমস্ত কবিতাকারের ভালে চিহ্নিত হয়েছে তারা মহাকালীন অমরত্বে ভাস্বর। সাহিত্যিক হয়ে ওঠার প্রথম পর্যায়ে, কবি সোহারাব হোসেন বিস্ময়ের এক আকাশ কল্পনা নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন। অসংখ্য কবিতার বয়ন অবয়ব পায়। সে সময়ে দুটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেগুলি —

১। **রক্ত দেহে অন্যস্বর ঃ**

১ম প্রকাশ -১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রীঃ

কবিতা রচনাকাল-জানুয়ারি ও ডিসেম্বর, ১৯৮৭

অতি দ্রুততায় কবি এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা ঘটান। এক বছর যাবৎ রচিত কবিতার সংকলন কবির প্রথম আত্মপ্রকাশ। মূল্য ছিল মাত্র ২ টাকা। উৎসাহের অন্তহীন কলরবে নবকল্লোলের বাণী ধ্বনিত হয়েছে কবি কণ্ঠে। যদিও এ কাব্যের পরে কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

২। **বৃষ্টির নামতা ঃ**

প্রকাশকাল ঃ ১০ই জানুয়ারি, ১৯৮৯ খ্রীঃ

রচনাকাল ঃ ১৯৮৫-১৯৮৮

চার টাকা মূল্যের এ কাব্য প্রকাশিত হয়। প্রথম কাব্য প্রকাশের ঠিক এক বছর পরে। কিন্তু কাব্যের কবিতাগুলি প্রথম দিককার রচিত, এ গ্রন্থেরও অন্য কোনো সংস্করণ কখনো প্রকাশিত হয়নি।

৩। **কবিতা সংগ্রহ**

২০১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত অতীব মূল্যবান সম্পদের বিচ্ছুরণ এ গ্রন্থ। তিনদশক পরে প্রকাশিত এ কবিতা সংকলনে পূর্বতন দুই গ্রন্থের কবিতাও স্থান পেয়েছে। সময়ের অজস্র ঘটনা প্রবাহ-জটিল কুটিল রাজনৈতিক পাশাখেলা, হিংস্র-অমানবিক জন্তুর প্রবৃত্তির তীব্র দাহন থেকে উন্মুক্ত-উদার জীবনবোধের অফুরাণ বিস্ময়ের বরিষণ। গ্রন্থের উৎসর্গে তিনি স্মরণ করেছেন অতীতকে-অতীতের দর্শন, ভাবনা, গতির সমস্বরে তাল মেলানো বন্ধুবরদের। যদি ও এর মধ্যে কেউ কেউ কবিকে ছেড়ে গেছেন চিরতরে তবুও অনুভব-উপলব্ধি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সমন্বয়ে উদ্দাম কণ্ঠের সুমধুর তানে বিস্ময়ের অপরূপ প্রকাশ এসেছে এ সংকলেন।

বাংলা কবিতার ভুবনে, হাজার বছরের অতীত থেকে ঐতিহ্যের সরণি ধরে সমকাল পর্যন্ত, চর্যাপদের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে কবিতা যখন শিল্প হয়ে উঠেছে—কবিতার বিকাশ-সমৃদ্ধি ও উপলব্ধির স্রোতে, যে বা যারা মহান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সেই সরণিতে সোহারাব হোসেন উজ্জ্বল নক্ষত্র না হলেও তাঁর কবিতার সাম্রাজ্য বৈচিত্রময়। স্বপ্নশীল কল্পনার সীমানায় এক অনন্ত জিজ্ঞাসার রথ নিয়ে পরিভ্রমণ করেছেন তিনি। সময়-সমাজ ও বাস্তবতার কলতানে শিল্পত্বের জাদুমন্ত্রের নির্মাণ এসেছে—জীবনকে, জগৎকে কামস্টিক চৈতন্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে একক অভিব্যক্তির পরতে সাজিয়ে তুলতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি, তার দৈনন্দিন জীবন-জীবিকা-ধর্মচেতনা-বেঁচে থাকার হাজার রকমের প্রণালীবদ্ধ ধারণা থেকে সরতে সরতে কবি যে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সন্ধান দিয়েছেন তা এক কথায় অভিনব। স্বীকারোক্তি থেকে সত্যের ধ্বজাকে উড্ডীয়মান করে তোলার মতো সাহস খুবই কম জনই দেখিয়েছেন। আসলে গভীর বিস্ময়ের কৌশলী প্রকাশে কবি যেন জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কবিতার বিষয় বৈভব থেকে শৈলী প্রকরণে অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন তিনি। তাঁর সম্যক রূপকে ক্রমিক পরম্পরায় বিশ্লেষণ করা যেতে পারে—

বিষয় বৈভব ঃ

কবি মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা থেকে যে মর্মন্তুদ যন্ত্রণার উৎসারণ এবং তা থেকে ক্রমিক বিবর্তন-বিবর্ধনের নিয়ন্ত্রিত গতায়তে অনাবৃত রহস্যের দ্বার উন্মোচন হয়েছে —তা কবিতার ছত্রে ছত্রে বিভূষিত। বিংশ শতকের শেষলগ্নে মানুষের উদগ্র যৌন বোধ, লাঞ্ছিত আত্মহারা ব্যক্তিত্বহীন ধর্মীয় ভাবাবেগ, রাজনৈতিক লেলিহান জীবনবাস্তবতা, বিশ্বায়ন থেকে শুরু করে কবির আত্মদংশন, নীতি চেতনা, ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে

পাপাচার বদলে যাওয়া মানবিকতা ও প্রেম এর আকুণ্ঠ-রঙিলা জীবনকে কবিতায় বিষয়ে তুলে ধরতে নিষ্ঠা ও সততার বাহক হয়ে উঠেছেন। এবার পর্যায় ক্রমে কবিতার বিচিত্র বৈভবকে প্রকাশ করা যেতে পারে। যথা ঃ

১। **প্রেম ও পাক ঃ**

মানুষ তার জন্ম বৃত্তান্ত থেকে আমৃত্যু বেঁচে থাকে হাজারো সমস্যা-দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণা-অনাকাঙ্খিত প্রশ্নের উদ্ভাবন নিয়ে, মনের গহিন-গোপন অন্তরালে নব প্রশ্নের যথাযথ সমাধান বা উত্তরের ডালি সজ্জার সন্ধান পায় না। সেখানেই কবির বিস্ময়ের উর্মিমুখর আস্ফালন। আসলে প্রেম ও পাপ এ দুই ধারণার জন্ম আদি-অনাদি কালের। পৃথিবীর সৃষ্টি যুগের রহস্যের মধ্যেও এ ধারণার সম্মিহিত ভাব লুকিয়ে আছে। প্রথমে প্রেম ও পাক এই শব্দ বন্ধের অভিধানিক তাৎপর্য কী হতে পারে তা বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রেম = ভালোবাসা, নারী-পুরুষের মধ্যেকার যৌন আকাঙ্খিত সম্পর্কের সমন্বিত যাত্রা। এধারণা সম্পূর্ণত মানবিক অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল।

পাপ = মানসিক অস্বস্তি সূচক যাত্রা। অতৃপ্তির নির্দেশনা। নিতান্ত মানবিক হলেও বাহ্যিকভাবে সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের মাপকাঠিতে সীমায়িত। ন্যায় অন্যায়কে শাস্ত্রীয় বিধান ও অনুশাসনের নিরিখে বিচার করার মানদণ্ড।

শাস্ত্রীয় ও ধর্মীয় অনুশাসনকে এড়িয়ে লোকচক্ষুর আড়ালেই মানুষেরা প্রেম এর ডাক শোনে। আবহমান আদিম জৈব আকাঙ্ক্ষা ও বেঁচে থাকার অনাদি আমন্ত্রণ পায়। আবার অন্যদিকে মানুষেরা তার নিত্য নৈমিত্তিক স্বাভাবিক ক্রিয়া-কর্ম, সংসার যাপনের হাজারো বর্ণময় দায়বদ্ধতা থেকে শুরু করে সন্তান জন্ম দেওয়া বা আমৃত্যু নারীত্বের পূজারি হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যেই অভিনব ভাবনার প্রসারণ কবিতার বিষয়কে অন্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছে। মানব জন্মের মতো সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রবৃত্তির পাশাখেলা মনের গহনে লুকিয়ে থাকা হাজার অন্ধকার থেকে যে আলোকভূমির উৎসারণ সেখানেই কবির একার পথ চলা—অসংখ্য প্রশ্নের সীমাতীত রহস্যের বাঁধ ভেঙেছেন তিনি।

মানুষ যুদ্ধে রত-আদি-আদিকাল থেকে চলে আসছে যুদ্ধ। সভ্যতার বিকাশ ও ধ্বংসের পিছনে আছে যুদ্ধের উন্মত্ত লীলা। যুদ্ধের ভয়ংকরিতা ও বিভৎস রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করি আমরা। বাইরের এই ক্রমাগত যুদ্ধের লড়াই থাকলেও আমরা আরো এক যুদ্ধে ক্লান্ত হই এখনো। সে লড়াই একার সাথে, অনবরত সেখানে থামতি নেই, জয়-পরাজয় থাকে না, থাকে শুধু চিরন্তন বাসনা-কামনা-প্রবৃত্তিময়তার অন্তর্লীন কলতান।

সে সুমধুর কলগীতে মুখরিত হয়ে উঠি প্রাচীন সভ্যতার থেকে আজ পর্যন্ত—নারী বন্দনায় মাতোয়ারা হয়ে থাকি—নারীত্ত্বকে জীবনের একমাত্র চরমতাম প্রাপ্তি বলে মনে হয়—তা আসলে যৌন সম্ভোগচেতনার উম্মাদনা। সময়-দিনক্ষণ মেপে নয়; বরং অনাবরত অনতিক্রম যৌনতার রসসিক্ত প্রবাহে ভেসে যায় মানব সভ্যতা। সেখানে নারীত্বের অবমাননা নয়। ইন্দ্রিয় কামনার ভিতর দিয়ে অতীন্দ্রিয় চিন্তনে জীবনের মুক্তির দিশা নির্দেশনায় সম্পর্কের জটিল টানাপোড়েন থেকে সহজ স্বতস্ফূর্ত মানবিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিক যৌন আকাঙ্ক্ষার অফুরাণ প্রত্যয়ের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাকে কবিতার বিষয়ে এনেছেন তিনি।

'রক্তদেহে অন্যস্বর' আসলে মানুষের চেতনার অভ্যন্তরে বেঁচে থাকে আর এক মানুষ—তার সন্ধান মেলে না সহজে। পরিচয় ও লুকিয়ে থাকে চিরন্তন। নারীকে আঁকড়ে বেঁচে থাকা সারাজীবন—অসহায় জীবন যাপনের কালক্ষেপে একাকিত্বের বন্ধন ছেড়ে মানুষ বিশ্লেষণে বসে। নিজের মতো করে বিচার করে সে নিজেকে। সেই অনুসঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগত ও তার মধ্যে বিবর্তনের ঐতিহ্য নিয়ে বসবাসকারী মানবকুল ও স্বাভাবিক বসবাসের অনিবার্যতায় মানব সভ্যতার আদিপর্ব থেকে মানুষ বেঁচে আছে ধর্মীয় অনুশাসন নির্ভর সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে। জগৎ ও তার বিচিত্র রহস্যের দ্বার উম্মোচনে বারংবার মানুষ ব্যর্থ হয়েছে। আর সেখানেই ধর্মীয় দর্শনকে আরও দৃঢ়ভাবে মনের অন্তঃস্থলে মানুষ আশ্রয় দিয়েছে। 'রক্তদেহে অন্যস্বর' আসলে নারী ও প্রকৃতির অপার রহস্যময়তার অপরূপ নির্মাণ। হাজার বিস্ময়ের চোখে জীবনের প্রতি ছন্দ ও গতিময়তায় নারী ও প্রকৃতি যেন একাকার। চেনা জীবনকে নতুনভাবে অচেনার স্বপ্নালু বিভঙ্গিতে ধরতে চাওয়া ও পাওয়াই কবির ঐকান্তিক লব্ধ বিষয়। মানুষ বিশেষত পুরুষেরা (আবহমান কাল ধরে পুরুষ তার শক্তিমত্ত উদগ্রতায় শোষণের রথ চালিয়ে সমাজ ও নারী জীবনের উপর) ঠিকানা বদল করে ক্রমাগত। মোক্ষের নিদর্শ কোনো দিনই খুঁজে পায় না তারা—

> "কম্পমান গাছে প্রশ্ন করে শৈশব—আমার শৈশব
> একা, একক। বলে—ঠিকানা বলো ঠিকানা-গাছ।
> মানুষের ঠিকানা কোথায়?"[১]

সত্যিই মানুষ পোশাক বদলের মতো সময়ের সিঁড়িতে দাড়িয়ে ঠিকানা বদল করে। শৈশব থেকে কৈশোর তারপর আরো দূরে। নারীত্বের বন্ধনস্থ জীবনের কাঙ্ক্ষিত ফলকথা বলে মনে করে। কাম জেগে ওঠে শরীরে। দুধ-পুকুরে সাঁতার কাটার বাসনা নিয়ে সাধনার স্তবগান থামিয়ে দেয়—

"জমে ওঠে জীবাণু, মাটিতে পোকা লাগে,
সে মাটিতে পুঁজের গন্ধ
সে মাটিতে রক্ত স্রাবের গন্ধ
সে মাটিতে আঁতুরের গন্ধ
এ গন্ধ বড়ো মিষ্টি, মা-গন্ধ, বাবা-গন্ধ
গন্ধে পাগল হই আমি।"[১২]

বিচিত্র অভিসন্ধিতে জীবন পাগল হয়। দেহের স্তরে স্তরে সাজিয়ে আছে কামের আকুল জোয়ার। আর প্রচলিত কামনার প্রতীক নারী মুক্তির বন্দনায় মনের অতলান্ত গহ্বরে লাভা স্রোত বয়ে যায়। পুড়ে যায় হৃদয়। সমাজ-সভ্যতা থেকে লুকিয়ে বেঁচে থাকা। ভালোবাসার আগুন নিয়ে সবকিছুকে পরস করে দেখা। সেখানে দিনের আলো থেকে অন্ধকার গর্ভে দাঁড়িয়ে পাপের অন্বেষণ আনে। নারীর সঙ্গে পুরুষের মিলন বসতিতে আঁধারের গর্ভ ছেড়ে উঠে আসে মানুষ। সে শিশু, ভবিষ্যৎ বা আগামী সভ্যতার ধারক-বাহক। স্বপ্নের বয়ন সেখানে। নারী বন্দনা হয়। মাতৃ গর্ভে ফুল ফোটে। পুরুষ-নারী আকাঙ্ক্ষার সফলতা মেলে অন্যরূপে-বন্দনার ঠিকানাতে—

"ঘর গেরস্তি পুকুর ঘাট রান্নাবাড়ি এবং অচিন পাখি,
ছড়িয়ে দাও আমার সব কিছু হৃদয় সমেত।"[১৩]

আচার সময়ের কুহেলিকাময় আবহে দিশাহীন যাত্রাপথের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে কবি যৌন বোধকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির চোরাস্রোতে তা কলুষিত হলেও পাপাচার হলেও কামাতুর প্রবৃত্তি বাসনাকে হাতিয়ার করে জীবনকে চালিত করার পক্ষপাতি কবি—

"পাপ-প্রেম-পূজা খোঁজে নারীর নাভিমূল,
আমি এখন নারীর বুকে হাত রেখে ঈশ্বর লাভের মন্ত্র পড়ি।"[১৪]

ঈশ্বর লাভের আশায় কবি ঈশ্বর ও নারীকে একই ভাবনার অনুসঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছেন। তাই কবির বিশ্বাস মানব জীবনের মাতৃগর্ভ থেকে জন্মবৃত্তান্ত ও ক্রম পরম্পরায় মৃত্যুর মোহনীয় নির্মলকে অমৃত স্বাদে গ্রহন করার মধ্যেই যৌন জীবন যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ আক্রমণ লুকিয়ে থাকে—যার দ্বারা ক্ষতাক্তরিক্ত হয়ে এমনকি পাপের পঙ্কিলতায় ধ্বংসোম্মুখ হয়ে পড়েছে মানুষ। তা চরমভাবে সত্য-অনিবার্য। যুগ-যুগান্তের সীমাভূমিতে এ সত্যকে অস্বীকার করা যায়নি। সৃষ্টির মহালগ্নে আদি মানব

আদম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনও একচিলতে গ্লানি নেই, এ যেন আমরণ এক স্তব গাথা, এমনকি জীবন সায়াহ্নে এসেও কাঙ্খিত বাসনার উদগ্র স্তরকে আমরা সীমায়িত ভাবনায় চমকে দিই।

'বৃষ্টির নামতা' কাব্যে মাত্র চারটি (০৪) কবিতার সংযোজন। দীর্ঘ কবিতাগুলিতে, পূণ্যতোয়া নারীশরীর ও প্রকৃতির বিচিত্র লালরঙ্গের ভাবপ্রবাহে কবিমন বৃষ্টির অজস্র গান শুনেছেন। বর্ষার ভরা যৌবনে বিচলিত হয়ে মাঠ-মাটিময় কৃষি জীবনের অনাবিল স্বপ্নময়তা। মনের ঘরে লালন হয় এক অপার রোমান্টিকতা —কবি মনের বর্ণবিলাসী রোমাঞ্চের রসস্রোতে অবগাহন করে জন্ম নিয়েছে শিল্পের পরত। মাতন আসে মনে ঘরে। হু-হু স্বরে গীত হয় গান, বর্ষার গান। সে গান জীবনের অনুসঙ্গে সত্যের অপলাপ। 'বর্ষার গান' কবিতায় প্রেম প্রবাহর গভীরতাকে অন্যরূপে ধরেছেন কবি। নারীত্বের সৌন্দর্যবাসনা ও নারী শরীরের সত্যকার মর্ম উপলব্ধিকে অনুধাবন করার জন্যে শ্রাবণ মেঘের আমন্ত্রণ আসে। মেঘবতী নারীরা বৃষ্টির ধারায় ঝড়ে পড়ে। ভূমির শরীরে পূর্ণতা আসে—ফসলের সৃজনায় গর্ভবতী হয়ে নবরূপ ধারণ করে ভূমি—

'স্বাদময়ী নারীর দেহে জ্বর আসে,
ভূমিতে বিলীন হই,
চিনে ফেলি বর্ষামঙ্গল,
ফিরে পাই নবরূপে ভূমির ক্রোড়ে।"[১৫]

আসলে জীবন গ্রন্থির অজস্র প্রবাহ বর্ষায় গান কবিতা। নারী পুরুষের সহজাত সম্পর্কময়তা এবং প্রকৃতির অপার লীলারঙ্গ, মাঝখানে পড়ে থাকে জীবন গড়ে তোলার বর্ণালী আকাঙ্ক্ষা। সভ্যতার আদিকাল থেকে সৃষ্টির পূর্ণলগ্নে পুরুষের কাছে সত্যের দুই রূপ —

ক. পূণ্যতোয়া নারী
খ. ফসলের ডাক।

এ দুই আহ্বান-ই পুরুষকে জাগিয়ে তোলে। পুরুষেরা বীজ হয়। নারী শরীরে বর্ষার গান শোনার মতোই মাটির বুকে হাল চষে সে। ধাতু বৈচিত্র্যের বদল এলে অভিনব ছন্দে জাগরিত হয় কাম। সে সফলতার প্রার্থনায় ঈশ্বরমুখী হয়। সময়ের ঝঞ্ঝা সরিয়ে শ্রাবণ কন্যার দেহ সৌষ্ঠব নিয়ে—তার কল্পিত নারীত্বের বেশভূষাকে আরো বেশী চমকিত-যৌনকাঙ্ক্ষী আকর্ষণের করে, ভাবতে চেয়েছে। যে বোধে ভাঙন আসে 'মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় বাঁক আসে—

"পালঙ্ক শয়নেতে বৃক্ষ পরশ,
নেচে ওঠে ইড়ার পুরুষ,
গীত শুরু হয়,
আমার ভাঙনে তাই বিপুল গঠন।"[৭]

অবশেষে শ্রাবণকন্যা নারী হয়। সুখী গৃহীজীবনে আসে ফসলের ডাক। পুরুষের প্রার্থনায় জেগে ওঠে বর্ষার ছন্দ। নারীত্বের হাজার জটিল বর্ণ পূর্ণতা পায় শ্রাবণের গানে। ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিক চেতনার অন্তর্লীন ভাব প্রবাহে কবি সিদ্ধহস্ত। মানুষের জীবনের ভাবনার গতিরথ একমুখী নয় কোনো কালেই। আবাহমান জীবন আকাঙ্ক্ষায় মানুষ ভুলে যায় অতীত-ঐতিহ্য। বিলাস-বৈভবে মাতোয়ারা হয়ে সৃষ্টি ও সভ্যতার বিপরীতে চলতি স্রোতে গা ভাসিয়ে বেঁচে থাকে। ব্যক্তি সত্তার অন্তর্বিশ্লেষণে বলে সত্যের শাশ্বতরূপ উদ্ঘাটনে ভীত পুরুষেরা পলায়ন করে। স্বার্থপর মনন নিয়ে ছলনার আশ্রয়ে বেঁচে থাকে যুগ-যুগান্তর। কিন্তু নিজেকে নিয়ে উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার কালক্ষেপে পাপের জগৎ ছেড়ে ভেসে যাওয়ার জন্যে। অন্য অর্থে পরিত্রাণ লাভের আশায় ঈশ্বর মুখী মানুষেরা সর্বাগ্রে মোহের আবরণ থেকে নিজেকে ছিন্ন করে ফেলে। সততার প্রলেপ দিয়ে (যদিও তা অনেকাংশে লোক দেখানো কেননা, মনোজগতে আদিম জৈব বাসনা চিরকালীন ভাবনার পরম্পরায় বিরাজমান) সফেদ শুদ্ধ জীবনাচারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভয়ংকর জীবনযুদ্ধে মানুষের লড়াই সেখানে। অন্তহীন যুদ্ধে সে একা-একাকী হলেও সত্যের জয়টীকাকে ভালে নিয়ে আমরণ নিজের অস্তিত্বকে সে টিকিয়ে রেখেছে। কোনো মহাপুরুষের বরাভয়দায়ী আশ্রয় না পেলেও পাপসিক্ত জীবনের বিচার প্রক্রিয়াকে সে নিজ কাঁধে তুলে নেয়নি। এখানেই প্রথাগত পাপ বা পুণ্যের বিরুদ্ধে কবির প্রবল বিদ্রোহ। ধর্মের মোড়কে সত্যকে দূরে ঠেলে বঞ্চনার কোরাস গায় যারা তাদের বিরুদ্ধে এলড়াই আমরণ। আসলে কবি নিজেকে বিশ্লেষণে করেছেন সুচতুর প্রয়াসে। প্রবৃত্তির দাস সকল পুরুষই। তবুও ভণ্ডামীর গোপন ক্ষেত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে থাকা সভ্যতা রক্ষক, ধর্ম ধ্বজাধারকেরা ছাড়পত্র পায়। আর যারা মানুষের সাথে মানুষের পাশে ধর্মের লেলিহান কুমিরগ্রাসকে সরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয় তারা। কবির সচেতন বিরোধ এখানেই। স্ববিরোধের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ুক ধর্ম বিলাসী মানুষেরা। দেখুক তাদের ঐতিহ্যের গহ্বরে কীভাবে লুকিয়ে আছে প্রবৃত্তি কাল জাদুমন্ত্র—

"দ্রাক্ষার বিছানায় মাতাল হয় নোহ,
সভ্য নোহর দেহে পোশাক নেই,
নোহর নগ্ন দেহে কি গড়িয়ে ওঠেনি যৌন-যৌন বৃক্ষ?"[৮]

কবির এ প্রশ্ন সহজাত-সাবলীল, সত্যিই সমাজ-সভ্যতাকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নোহ কি প্রবৃত্তিহীন হয়ে উঠতে পেরেছিল? আসলে পারা যায় না, পৃথিবীর আদি পুরুষেরা পাপ এবং প্রবৃত্তির বীজ থেকে মুক্ত হতে পারেনি কেউই। আদম-হাওয়া বিবিরা পারেনি বলেই সভ্যতার শেষ দিন পর্যন্ত উত্তর পুরুষেরা বিভ্রান্ত। তাই সাধনা সীমান্তে পৌঁছানোর আগেই, ইড়ার আসর থেকে, পিঙ্গলার আসর থেকে অথবা তাহাদের নামাজকে শেষ না করেই মানুষেরা প্রবৃত্তির পঙ্কিলতায় ডুব দিতে ছুটে যায়। ভালো মানুষির মুখোশ ধারণ করে ছদ্মবেশে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অথবা ঠুনকো বিচার সভায় লোক দেখানো সততার আশ্রয় নিয়ে পঞ্চাশ থেকে একশ বছরের ইহলৌকিক জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। কিন্তু মহাকালের বিচারে অন্যরূপে ধরা পড়ে সে জীবন। দৃষ্টির শক্তিমত্তাকে বদলে দিতে হবে। অন্তরাত্মার সত্যকার আহ্বান সংকেত শুনতে হবে—সেখানেই পাপাচার—প্রবৃত্তিময়তা ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনবোধের অনিবার্য সংঘাত থেকে ক্রমে জন্ম নেমে আপাপবিদ্ধা এক মানবতাবোধের।

এক ভয়ংকর যুদ্ধের সত্যে, আমন্ত্রণে কবি বিহ্বল। সময়ের বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়াইতে নেমে এপথে একাই হেঁটে চলেছেন কবি। বিশ্বায়নের সুচতুর ফাঁদে হারিয়ে গেছে তৃতীয় দুনিয়ার জগৎ। বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই জীবনের উপর যেন নেমে এসেছে অপঘাতের খাঁড়া। প্রেম-প্রণয় ও পাপাচারের জটিল ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে গেছে জীবনের শুভাশুভ ভাবনার প্রত্যয়। মানুষের মতো বেঁচে থাকার স্বপ্ন আলেয়ার মতো হারিয়ে যায়। বিশ্বাসহীন এক অন্ধকারে পথ খোঁজার মতো কবি দাঁড়িয়ে আছে। ভোগবাদের রঙিন মোহচ্ছন্নতায়, যৌনতায় কলুষিত হাহাকারে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের গতিময়তা থমকে যায়। মানুষ ধীরে ধীরে ডুবে যায় পাপের পঙ্কিলতায়। বিচ্ছিন্ন একাকী জীবন যাপনে বিপর্যস্ত হতে-হতে পাপময় দংশনে আত্মশরীরকে যেমন, তেমনি কালের ক্ষয়িষ্ণু ধ্বজাকে প্রবলরূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। 'সুন্নি' নামের কোনো এক আইডলকে কবি এখানে কেন্দ্র করে সমকাল ও যৌনচেতনার প্রশমিত মাত্রাকে চমকিত করে তুলেছেন। আসলে মানুষের সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার ইতি নেই কোথাও বরং তার পরিপূর্ণতা দিতে মরিয়া লড়াই। এ লড়াই দ্বিমুখী—

এক) নিজের মধ্যেই সমকাল করা আর এক অন্য সত্তার অনুভব। অনুভূত সেই মানুষের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই চলে সেখানে। হার-জিতের প্রবল দ্বন্দ্বে অস্তিত্বের বিপন্নতা আসে। আর আভ্যন্তরীন প্রবল ক্ষোভ তার বাইরের ব্যক্তিজীবনের অভিব্যক্তিকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করে।

দুই) ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের লড়াই। পরিবার —সমাজ ও আত্মসুখ ঐশ্বর্যময় যে

জীবন, প্রতিনিয়ত পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সমাজবদ্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে জীবনকে আরো বেশী উপভোগ্যময় সুন্দরতর উপলব্ধির স্রোতে ভাসমান করে তোলা। এ কথায় সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনাচারণ।

এই দুই লড়াইকে সামনে রেখে, বেঁচে থাকার অদম্য কৌতূহলে, মুন্নির মতো মেয়েদের যাঞ্চা বা প্রত্যাশা অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্লান্ত-অবসন্ন-হাহাকার লিপ্ত হৃদয়ে প্রেমের মায়াঘোর, কবি হৃদয়কে বিহ্বল করে দেয়। কঠিন-কঠোর বাস্তবতার নাগপাশকে ছিন্ন করতে, সময় থেকে দূরে সরে যায় মন। আরাম-বিলাশ-ব্যসনে জীবনকে ভাসিয়ে দেয়। সেই ভাবনার বেনোজাল ছিন্ন করে যৌবনের বনে মন হারিয়ে অন্য তার এক ইতিহাস রচনা করে মুন্নি। 'কবিতা সংগ্রহে' প্রেম-যৌনতা ও মুন্নির প্রতি কবির ব্যক্তিক উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হয়েছে বারে বারে কবিতাগুলি হল—

১। মুন্নি প্রজাপতি ও আমি (১৯৮৬ খ্রীঃ)

২। মুন্নি ঃ ১ (১৯৮৬, শারদ)

৩। মুন্নি ঃ ৩ (১৯৮৬, শারদ)

৪। মুন্নির প্রতি ষোল বছর পর (২০০২ খ্রীঃ)

কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি কবিতা ১৯৮৬খ্রীঃ লিখিত ও প্রকাশিত। কিন্তু চতুর্থ কবিতাটি ২০০২ সালে অর্থাৎ ১৬ বছর পর লেখা। মুন্নির স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে কবির নিবেদন যেন। মুন্নির প্রতি প্রথম প্রেম নিবেদনে কবি তখন সদ্য প্রেমের মাতনকে আত্মস্থ করেছে। বছর একুশের যুবক অন্তর দিয়েই যৌন জীবনের সুগভীর আহ্বান ধ্বনিকে উপলব্ধি করেছেন। আবার কাল বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ অনুভবের স্বীকারোক্তি এসেছে তার কণ্ঠে যে, মুন্নিরা বদলায় না। নাম ও মুখের মধ্যে মুন্নির কোনো মুখোশ নেই। মুন্নির প্রতীকি শরীর মাত্রক যা মোহনীয়, মদমত্ত, উদগ্র যৌনতার ভয়াল প্রকাশ—

"মুন্নির বালিশ বুড়ি ছোঁয়ার মতো ছুঁয়ে বোধি লাভ করেছিলাম আমি।"[৯] এক নবজন্ম প্রাপ্তি। এ বোধ জীবন সায়াহ্নে অনিবার্য। তার প্রথম পদক্ষেপও অন্তহীন লড়াই দিয়ে শুরু। ভয়, জড়তা ও লজ্জাকে দমন করে নবতর প্রতিযোগিতার অংশ নেওয়া এক মানুষের গভীর রাতের আত্মহারা উল্লাস। আবার ছন্দবদ্ধ বাঁধা ধরা জীবনের বাইরে এক আকাশ মুক্তি কামনায় নতুনভাবে বাঁচার দিশা, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে।' তাই মোহভঙ্গ হয়। যন্ত্রণার দাপটে সুচতুর মন চায় অন্য মুখাকাঙ্ক্ষা—মুন্নির মহাকাব্য নতুন হোক। যৌন বিলাসী দেহ মন ভারক্রান্ত হয়ে ওঠে।

"খাঁচায় ছিল যে পাখি
আদরে আহ্লাদে
ছিলাম মোহভঙ্গে ছেড়ে।"[১০]

এখানে আত্মমুখী লড়াই ও অস্তিত্বের অভিনব প্রকাশ। সময়ের গহ্বরে দাঁড়িয়ে মুন্নির প্রতি প্রেম, যা ছিল ক্ষণিক দিশাহীন তা আবার সৃষ্টির পূর্ণতায় ভরে উঠেছে। কবির আত্মজিজ্ঞাসা—"কঙ্কাল হলে তাকেও কি ফেল দেব?"[১১] মুন্নি কখন নিজের সঙ্গে অন্তরের একান্ত আপণে বদলে যায় তার হিসাব থাকে না। মুন্নির শরীরকে ঘিরে যে মোহময়ী বাতাসের শিহরণ তা বদলে গেছে। যৌথ স্বপ্ন সুখের গৃহকোণের প্রত্যাশী হয়ে উঠেছে মানুষেরা। অনিমেষ আকাঙ্ক্ষা, মনোভঙ্গি ও বহুকাল ধরে শুদ্ধ জীবন প্রবাহে আবারো মুন্নির ছায়াপাত। কাঠের পুতুলকে সজাগ করে তুলে মুন্নির ময়ূর পেখমের মতো নরম দেহ নিয়ে লালিত স্বপ্নবিভোর হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে কবি। আদি-অনাদি থেকে সভ্যতার চরম পৌঁছে ও মানুষ একস্থানে আত্মহারা হয়ে পড়ে। সংযমের বাঁধ ভেঙে প্রবল বন্যার মাতন আসে, সেখানে তাই মুন্নিকে দপ করে, পুজো করে—আবার বাঁচার, সুস্থ স্বাভাবিকভাবে পরিবারবদ্ধভাবে সকলকে বাঁচিয়ে রাখার পথ দেখায়—

"আমার পরাজয়ে তুমিই পরিত্রাতা।"[১২]

পুরুষ পাখি চিরন্তন সত্যের শাশ্বত বাণীকে বহন করে নাব্যতা খোঁজে যুগান্তরের মধ্যেও কিন্তু নারী রূপী মুন্নিরা ভাবাদর্শে বদল আনে। সভ্যতা সৃষ্টির ধারক বাহক হয়ে বেঁচে থাকে—

"তোমাকে প্রণাম, না-সাগর, না-বন্দর, না-পুষ্পলতা, এখন বুঝেছি নারী তুমি সভ্যতা।"[১৩]

বিশ্বায়ন পৃথিবীর তৃতীয় দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, তা গত শতকের নয়ের দশক থেকে আজও। সে কাঁপুনি ভম্বুকের স্বরের মতো চিরস্থায়ী, ভারতীয় তথা বাঙালির জীবনে। ভোগের কল্পনায় অলস দেহভাণ্ডও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। রূপকথার গল্প পেরিয়ে সাদামাঠা বাস্তবতায় সুগন্ধী ভালোবাসায় জীবনের যে ছুটে চলা—বন্ধাহীন নদী তার সুগভীর খাদ-সময়ের কাল পোকার বিধ্বংসী আক্রমণ প্রতিহত করতে চেতনার বলিষ্ঠ প্রয়োগে জন্ম নেয় সভ্যতা রমণ। কামনা বাসনা ছেড়ে নারী শরীরে ভূমির স্পর্শ জেগে ওঠে। সুজলা-সুফলা নারী শুদ্ধি মন্ত্রের কথা শোনায়। শরীরহীন মায়া 'পাপ পদাবলী'র গীত শোনায়। আসলে সবই সুখপ্রত্যাশী জীবনের অনিবার্য সংঘাত। সেই

আভ্যন্তর দৈনন্দিন সংঘাত ও যন্ত্রণার দাপটকে কমাতে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের বিস্ফোরণ প্রয়োজন। শুদ্ধতার প্রলেপ এসেছে জীবনের মহামন্ত্রে আবাহনের মতো—

"পাপবীজের মালা বদল করে এসেছিল আমার সিদ্ধি।
পদ্মফোটা নাভি ছুঁয়ে তারপর আমি/পৃথিবী প্রথম পুরুষ
দৌড়াতে শুরু করি। ছুঁয়ে দিই সব পাপধারা,
বৃক্ষ-শিশু-নারী এবং /অঙ্কুরিত বীজ।"[১৪]

২। সময়ের রূপকথা ঃ

রূপকথার কোনো লেখক থাকেনা। আবহমান জনজীবনের অনুসঙ্গে বিচিত্র রং-বেরঙের কথাকলি রচিত হয় সেখানে। কবি সোহারাব হোসেন বাঙালির বর্ণবিস্ত জীবনের বিচিত্র ইতিহাসের স্রোতে যে রূপকথার বয়ন করলেন তা এক কথায় অবিস্মরণীয়। সময় বদলের পূর্ণাঙ্গ ধারাবিবরণী ধরলেন। মানুষের সামগ্রিক হালচিত্র বদলে গেছে। তার অর্থনৈতিক বাস্তবতার সমসূত্রে। ১৯৮৩ খ্রীঃ থেকে ২০১২ খ্রীঃ পর্যন্ত রচিত কবিতার সাম্রাজ্যে দেখা যায় মূলত মার্কসীয় সাম্যবাদী ভাবাদর্শের অভিসন্দর্ভ। চোখে দেখা বাঙালির গ্রামীণ সমাজ তার নিত্য পরিবর্তনের সীমায়িত স্বরূপ তথা বিবর্তনের ধারাপাতকে কবিতার ছত্রে নির্মাণ করেছেন। তিন দশকের বাংলাদেশের গড়পড়তা অর্থনৈতিক বিবর্তন ও বিবর্ধন এর সাথে সামাজিক আন্দোলনের সারসত্তা ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসা ও তার প্রথম সর্ববৃহৎ পদক্ষেপ অপারেশন বর্গা বা বর্গা আন্দোলন। বাঙালি মেহনতি-শ্রমজীবি-কৃষি জীবনে যে সুফল বহন করে এনেছিল তা একথায় অবর্ণনীয়। সেখানে গ্রামজীবন তার সম্পূর্ণ অবয়ব নিয়ে বদলে যাচ্ছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে এ লড়াই ছিল কঠিন কঠোর ভীষণতম। শ্রেণি লড়াইতে পিছপা হয়নি কোনোদিন। কৃষকদের লড়াই-বাঙালির সম্যক জীবন যাপনের মানদণ্ডকে পুরোপুরি বদলে দিচ্ছিল। আবার সেই পরিবর্তমান ইতিহাসের হাত ধরে খোলা বাজার অর্থনীতি এবং কেন্বারে শেষের দিকে এসে কৃষির ভিত্তিময়তার উপর দাঁড়িয়ে শিল্পের শ্লোগান তুলে দিয়েছিল সেই প্রতিচ্ছবিও কবিতার কথায় এসেছে।

মানুষের জীবনের লড়াই সর্বাত্মক-আমরণ। নিজের জন্যে, পাশাপাশি সমাজ বদলের নিরন্তর প্রচেষ্টায় যেন মিশে আছে মেহনতি, শ্রমজীবী মানুষের রক্তে। বঞ্চনা-ব্যর্থতার হার্দিক হাহাকারের কলতানে মুখর জীবনে বদল আসে প্রতিনিয়ত। যন্ত্রণার কাতরানিতে বিপর্যস্ত জীবন নিয়ে ক্রমাগত রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প থাকে সেখানে। যুগ বদলের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের চিন্তন-অভিজ্ঞতা- ও ব্যক্তিসত্তার শুভ উন্মোচন ঘটে।

কবি সেই সত্যের প্রতিরূপ এঁকেছেন 'বেনোজমি', 'চরদখলের লড়াই, 'কৃষি বিপ্লব', 'ধ্যানস্থ' প্রভৃতি কবিতায়।

সংসার-পরিজন-আত্মীয় সকলকে ছেড়ে, পরিবারের সকলের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্যেই "চর দখলের লড়াইতে নামে মানুষ। এক টুকরো ভূমি, নিজের মতো করে সারা জীবন ফসল ফলানোর স্বপ্ন দেখতে জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি তারা—

"সন্তানের মুখে চুমো না খেয়ে ওরা মসকেটে চুমা দেয়।"[১৫]

সন্তানকে লালন-পালন করা, তাকে স্বাদে-আহ্লাদে দুবেলা দুধে-ভাতে রাখার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হাতে আগ্নেয় অস্ত্র তুলে নিয়েছে। মসকেট মারণ-অস্ত্র। জোতদার জমিদারদের বিরুদ্ধে একদল মানুষের সম্মিলিত লড়াই এর আহ্বান-এ সাড়া দিয়ে উত্তর পুরুষকে বাঁচানোর সীমাহীন প্রত্যাশায় শারীরিক সোহাগ নয় বরং জীবন-মৃত্যুর সামগ্রিকতায় জীবনের জন্যে মৃত্যুর আমন্ত্রণ যেন—

"পেটে দু'মুঠো যোগাবার অছিলায় শুধু
ঘর সংসার পিরিতের মানুষ সভ্যতার নিরালম্ব ওম ছেড়ে।"[১৬]

আবার কৃষি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে মানুষ। পরিশ্রম ও প্রাপ্তির স্বপ্নশীল সাগরের ঊর্মিমুখর আকাঙ্ক্ষা যেন। সকলের সম্মিলিত প্রত্যাশার গল্প ছেড়ে ফসল ফলানোর সীমাহীন চাহিদা নিয়ে বেঁচে আছে কৃষক ঃ

"বয়স তো গড়ালো কালে কালে,
এগোতে চায় না পা, বিগড়ে গেছে কল,
তিনকুড়ি লঙ্কা চারায় দিতে হবে জল,
যাওয়া তো হবে না।"[১৭]

মাটির সঙ্গে যে মানুষের আমরণ সম্পর্ক সে যুদ্ধের সংঘাতে প্রেরণাকে সেখানেই পায়। তাই নেতার জ্বালাময়ী ভাষণ, মঞ্চ আর অজস্র কলতানের বাইরে নিজের মধ্যে সে খুঁজে পায় অন্য আর এক সত্তা—সে কৃষক-লড়াই এর দূত ঃ

"মিটিং মিছিল ময়দানে নয়
বিপ্লবী তেজ জেগে ওঠে লোকটির গায়।"[১৮]

আবার মাটির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন—ঐশ্বর্যের ডালি নিয়ে মানুষ মাটি মুখী হয়ে ওঠে। মায়ের মমতার মতো যুগ-যুগ মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে—

"এই মাটি
এককালে ছন্দময় ছিল
মায়ের মমতায় টেনে নিতে সবই।"[১৯]

কৃষি জীবন বাঙালির কাছে সভ্যতার ধারক-বাহক হয়ে বেঁচে আছে। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অনুসঙ্গে বাঙালির জীবনে সম্পদের শিহরণ এসেছে। খাদ্যের অভাব ঘটেনি আর। ভয়ংকর মন্বন্তর এর ছায়াপাত বাঙালির জীবনে কোনো অভিসম্পাত আনেনি বরং সুন্দর সমুজ্জ্বল ভাব থেকে ঘরে এসে শিল্পে স্থাপনে সরকার যে ভূয়সি প্রচেষ্টার পরত সৃষ্টি করলে ও রাজনৈতিক কলুষতা ফলভোগে ব্যর্থতার ক্রন্দনে বাংলার আকাশ গুমরে উঠেছে। 'পুতুল বেতাল' কবিতায় সদ্য বাংলার চলচ্ছবি ফুটে উঠেছে ঃ

'জমির জন্যে লড়াই নামি লড়াই নিয়ে জমি
ঐ ছেলেটা জানে নাকো
কৃষি শিল্পের নেই কি সাঁকো
স্বপ্ন ছেড়ে মাটির ওপর স্বপ্ন পড়ে ভ্রমি।"[১০]

রাজনৈতিক পাশাখেলার দাবদাহে অগ্নিগর্ভ ভাব নির্মাণ ঘটেছে বাংলায়। প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তির নিজেদের মধ্যেকার কঠিন কঠোর লড়াই এ মেতে আছে। বাঙালি জন মানসের সমূহ কল্যাণবোধ নয় অনেক বেশী করে নিজেদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে সুচতুর কৌশলী হিসাবে মত্ত। সময়ের বাস্তবতাকে জীবন্ত রূপে কবিতার অবয়বে স্থান দিয়েছেন কবি। আবার অন্তহীন রূপকথার চমকিত বয়নে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রবল অভিঘাতকে কবিতার বিষয়ে এনে সাফল্যের সৃষ্টি তাৎপর্যে বিভূষিত হয়েছে কবিতা। 'সৃষ্টি মন্ত্র-এক' কবিতায় মানবিক যন্ত্রণার দগদগে ঘায়ে কবি নুনের ছিটে দিয়েছেন। শান্ত-সৌর্য্য-সত্যের, ধ্বজা ওড়াতে গিয়ে কৌশলে, মানুষ মারার কল পেতে রেখেছেন সভ্যতা রক্ষকেরা। সুস্থ-স্বাভাবিক গতিময় ছুটে চলা জীবনে ক্ষত-বিক্ষত যন্ত্রণার রূপায়নে ফোকাস পড়ে।"—

"বিকল্প স্বদেশ ভেবে শস্য জালে জড়িয়ে জড়িয়ে দাঙ্গায় হয়েছে স্বজন হারা।"[১১]

সহায়ক গ্রন্থাবলি ঃ

১। কবিতা সংগ্রহ, সোহারাব হোসেন, ছোঁয়া, অক্টোবর-২০১৩।
২। স্মারক ৫০শে পা সোহারাব হোসেন, এমদাদুল হক নূর (সম্পাদিত), নতুন গতি।
৩। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী, দে'জ
৪। নিয়ামুল কোরান' আ. ন. ম। আব্দুল মানান ও মাওলানা মুহাম্মদ মুসা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা

তৌষিক আহমেদ, গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রসঙ্গ ঃ ফিরে এসো, চাকা ও ব্রাত্য কবি বিনয়

পীযূষ কান্তি অধিকারী

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের কবি বিনয় মজুমদারের কবিপ্রতিভা বাংলা সাহিত্যের এক বিপুল বিস্ময়! আকাশের অসীম শূন্যতা, পাতালস্পর্শী সমুদ্রের অতল গভীরতা যেমন চির রহস্যে মোড়া কবি বিনয়ও তাই। যে প্রতিভার সূর্য ১৯৩৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর সুদূর বার্মার এক নমঃশূদ্র পরিবারে উদিত হয়েছিল নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সেই দীপ্ত জ্যোতি ক্রমশ দিগন্তের কোন্ ছেড়ে বিদেশী সংস্কৃতির ক্ষেত্রকেও আলোকিত করে আসছে। একলা কবিতায় বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেমন লিখেছেন ঃ "তাঁর কবিতা যেন এক কঠিন মানস যাত্রা, ঠিক একই মন্তব্য পরবর্তীকালে যেমন করেছেন বিষ্ণু দে'র কবিতা সম্পর্কে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়; তেমনি এই কথা বলা যায় বিনয় মজুমদারের কবিতা সম্পর্কে। গণিতজ্ঞ কবি বিনয়ের গণিত প্রভাবিত দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি তাঁর কবিতার বিষয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হওয়া স্বাভাবিক। কারণ একমাত্র তাঁকেই বলতে দেখি 'আমি গণিতের শূন্য'। একদিকে আবেগ ও কল্পনা, অন্যদিকে গাণিতিক প্রমিতি—এসবের রসায়ণে সৃষ্ট কবিতাই তাঁকে বিশ্বনাগরিক করেছে।

'স্মৃতিকথায় বিনয় মজুমদার নিজেই বলেছেন যে, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১৩ বছর বয়স থেকে তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'নক্ষত্রের আলোয়' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সালে। এরপর তিনি লেখেন 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা', 'আমার ঈশ্বরীকে', 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা', 'বাল্মীকির কবিতা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী', 'অধিকন্তু', 'এক পংক্তির কবিতা', 'আমাকেও মনে রেখো', 'আমাদের বাগানে', 'কবিতা বুঝিনি আমি', 'এখন দ্বিতীয় শৈশব', কাব্য সমগ্র (১ম), কাব্য সমগ্র (২য়) প্রভৃতি অমর সাহিত্যকৃতি। এছাড়াও তিনি প্রাবন্ধিক, ছোটগল্পকার, ভাষাতত্ত্ববিদ, গণিতজ্ঞ, অনুবাদক, সমালোচক। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কবি, বাঙালি কবি, চণ্ডাল কবি, ব্রাত্য কবি। তাঁর কবিতায় একটা স্বতন্ত্র ঘরাণা আছে। কবিতায় তাঁর জীবনবোধ, আঙ্গিক, উপমা, ছন্দ, শব্দ, চিত্রকল্প দেখে পাঠক হামেশা চিনে নিতে পারেন। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া বিনয় মজুমদার, গণিতজ্ঞ পণ্ডিত বিনয় মজুমদার আঙ্কিক নিয়ম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে কবিতার প্রাণে পৌঁছানোর চেষ্টা করে সফল হয়েছেন। তাই কবিকুলের মধ্যে বিনয়ের তুলনা বিনয় নিজেই।

বিনয় মজুমদারের অমর প্রেমকাব্য 'ফিরে এসো, চাকা' (১৯৬২)। এর আগে

১৯৬১ সালে মাত্র ১৪টি কবিতা নিয়ে 'গায়ত্রীকে' কবিতার বই দেবকুমার বসুর প্রচেষ্টায় বেরিয়েছে। এই ১৪টি কবিতার সঙ্গে আরো ৬৩টি কবিতা জুড়ে ১৯৬২ সালে দেবুবাবুই ছাপালেন 'ফিরে এসো, চাকা'। একাব্যে প্রকাশিত হয়েছে ৮ মার্চ ১৯৬০ থেকে ২৯শে জুন ১৯৬২ পর্যন্ত রচিত কবিতাগুলি। মোট ৭৭ টি কবিতার মধ্যে ৭টি 'ষাট' সালে রচিত। এর মধ্যে আবার চারটি অক্টোবর মাসে রচিত। লক্ষ্যনীয়, এরপর ১৯৬১ সালে ১৩ জুনের আগে পর্যন্ত কবি কোনো কবিতা লেখেননি। ১৯জুলাই তিনি লিখলেন ঃ

"বেশ কিছুকাল হ'লো চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো
একবার এসে ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার মাঝে থাকা
শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি জীবনযাপন করি;
কদাচিৎ কখনো পুরোনো দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল
রেখা থেকে কোনো মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা
দিয়েছিলে।"

এবং আরো লিখলেন 'নেই কোনো দৃশ্য নেই, আকাশের সুদূরতা ছাড়া।' ঠিক পরের দিন ২০ জুলাই কবি আমাদের দুর্লভ চারটি কবিতা উপহার দেন। এই চারটি কবিতার মধ্যে যে কোনো একটি কবিতা লিখে পাঠকের হৃদয়ে কবি চিরস্থায়ী আসন করে নিতে পারেন। এখানে প্রথম কবিতাটি তুলে ধরা হল ঃ

"আর যদি না-ই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত যদি বাতাসের মতো নয়-ই মেশো
সেও এক অভিজ্ঞতা; অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—
নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ দর্শন বহু আছে।"

বিশ্ববরেণ্য লেখকগণের শ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণে বেরিয়ে এসেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। আর তাঁদের 'সৃষ্টির মহাবিস্ফোরণে'র সুদীর্ঘ প্রস্তুতও পাঠক মাত্রের অবগত। ব্যতিক্রম শুধু বিনয় মজুমদার। কোনো ভূমিকা ছাড়া উল্কার মতো আবির্ভূত হয়ে তিনি 'ফিরে এসো, চাকা'র মতো কাব্য লিখলেন। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতার সৃষ্টি-রহস্য ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। তবে 'গায়ত্রীকে' কাব্যের

'প্রারম্ভিক' বক্তব্যে কবি যা বলেছেন তা কবিতার রহস্যভেদে অনেকটা সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন "একজন বান্ধবীকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র প্রেমার্তির কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জী বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংঘাত প্রতিটি অংশ যে-কোনো পাঠক কিম্বা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থিতির বিশ্লিষ্ট রূপায়ন বলে মনে হবার কথা। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

"আবার যেহেতু যে কোনো একটিমাত্র অংশেই প্রেম, সমাজনীতি, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য সেহেতু পাঠক বা পাঠিকার জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিরই সফল রূপায়ন এ পুস্তকে খুঁজে পাবার কথা।....শুধু আমার কথা ভাবলে কাব্যখানি শুধু প্রেমার্তির। অন্যদের বিষয়ে ভাবলে যে কোনো বিষয়ের। গ্রন্থস্থ কতিপয় কবিতা দেশ, অমৃত, কৃত্তিবাস প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।"

অতএব 'ফিরে এসো, চাকা' কবির প্রেমার্তির কাব্য। একাব্যে বিশেষ নারী গায়ত্রীকে পাবার কামনা ভাষারূপ পেয়েছে। অবশ্য তাঁর এই প্রেমের পথ ধরে তিনি বিশ্বমানবের স্পর্শাতীত অস্তিত্বে মিলিত হতে চান। 'ফিরে এসো, চাকা' সম্পর্কে কবি নিজে এক সাক্ষাৎকারকে বলেন; "ফিরে এসো' ফিরে এসো চাকা —আমি কাব্যখানিকেই সম্বোধন করে বলছি ফিরে এসো। হে বই তুমি ফিরে এসো। ফিরে এসো রথ হয়ে চিরন্তন কাব্য হয়ে। অনেকে বলেন মহিলাকে নিয়ে লেখা—এটাও মিথ্যে কথা নয়, বাজে কথা নয়। তবে আমি মূলত বলতে চেয়েছিলাম কাব্যখানিকেই। যদি জিজ্ঞেস করো যে দাদা কবিতাগুলি কাকে নিয়ে লিখেছো?— কবিতাগুলি ওই বইখানিকে নিয়েই লেখা। মহিলাকে নিয়ে লিখেছিলাম বটে —শুরুও করেছিলাম ওইভাবেই। কিন্তু প্রত্যেকটি কবিতাই কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কীয়। কবিতাটা আসলে কবিতা নিয়েও লেখা। একটি কবিতা পড়ে কিছুকাল না পড়ে রেখে দিতে হবে। তারপর পড়ে যদি ভালো লাগে তবে বুঝতে হবে কবিতাটি ভালো হয়েছে। এটা হচ্ছে প্রথম বক্তব্য। দ্বিতীয় বক্তব্য মহিলাকে নিয়ে লেখা। কবিতা নিয়েই কবিতা লেখা। পাঠকের জীবন নিয়েও।" (অভিষেক, ১-২৫ আশ্বিন, ১৪০৫) ৭ জুন ১৯৬২ সালে লেখা কবিতায় লক্ষ্য করি ঃ

"আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছো; ফিরে এসো, ফিরে এসো চাকা,
রথ হ'য়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হ'য়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হ'য়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।"

এখানে কবি কোন 'বিশুদ্ধ দেশে'র স্বপ্ন পাঠককে দেখালেন তা বুঝে ওঠা কঠিন

কাজ। কারণ সে এক রহস্যময় দেশ যেখানে গান, প্রেম, অবয়বহীন সুর ব্যাপ্ত হয়ে আছে সমস্ত আকাশে। সেখানেই কবির যাবার কথা থাকলেও নিশ্চলতার জন্য যাওয়া হয় না। তাই তিনি আহ্বান করেন গতির প্রতীক রথচক্রকে। এখানে কবি কি আড়ালে স্মরণ করে দিলেন পুষ্পক রথের অনুষঙ্গ! তাহলে কল্পরথের প্রত্যাবর্তন কল্পনা কি কবির আপাত গতিশূন্যতার বিরুদ্ধেতাই! এখানে 'সুর'-এর 'অবয়হীন' বিশেষণটি 'গান', 'প্রেম', 'সুর' এই তিনটি পদেই ছিল। শুধু তাই নয়, 'বিশুদ্ধ দেশ' টিও যে 'অবয়বহীন' তাও গভীর পাঠে ধরা পড়ে। একজন আদর্শ কবি-শিল্পী এখানেই কবিতায় রহস্যাপর্দা সরানোর আয়োজন ভবিষ্যৎ পাঠকের জন্যে রেখে যান।

ডিলান টমাসের মতো শব্দ নিয়ে খেলা করার অসাধারণ ওস্তাদ ছিলেন বিনয়। 'শব্দজব্দ' খেলতে খেলতে যেমন একধরনের দারুণ আবিষ্কারের স্বাদ পাওয়া যায়, গণিতজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার কবি বিনয়ের কবিতাতেও সেই আনন্দ প্রবাহমান। কবিতায় প্রতীকের পর প্রতীকের চারা রোপণ করতে করতে তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেন—এভাবে চলতে চলতে কখন যে পাঠকমন রসাস্বাদনে মেতে ওঠে, তা পাঠকের বুঝে ওঠার সুযোগ থাকে না। ১৭ এপ্রিল ১৯৬২ তে লেখা কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

"বাতাস আমার কাছে আবেগের মথিত প্রতীক,
জ্যোৎস্না মানে হৃদয়ের দ্যুতি,
প্রেমংমেঘ-শরীরের
কামনার বাষ্পপুঞ্জ: মুকুর, আকাশ, সরোবর,
সাগর, কুসুম, তারা, অঙ্গুরীয়—এ সকল তুমি।
তোমাকে সর্বত্র দেখি..... ।"

কবি বিনয় নিজের জীবনের থেকেও কবিতা ভালোবাসতেন। কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন। মানবিক অনুভূতি তাঁর কবিতায় পল্লবিত হয়েছে। আর এই মানবিক ভাবনার স্বর্ণফসল 'ফিরে এসো, চাকা', অঘ্রাণের অনুভূতিমালা', 'বাল্মীকির কবিতা' প্রভৃতি ১৯৫৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত লেখা ২৯টি মহৎ কাব্য। সমাজ ব্যবস্থার অনুর্বর ক্ষেত্রে অবস্থান করেও সারা জীবন যেভাবে তিনি সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতেছেন তা আজ মানব জাতির কাছে গৌরবের বিষয়। শ্রদ্ধেয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ঃ "বিনয় মজুমদারের কবিতার মধ্যে এমন এক মানুষী অস্তিত্বের আশ্বাস পাই যে, বিশ্বজাগতিক প্রাণ অপ্রাণেরই অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণ বিশেষ; যে সংগত হয়ে ওঠে আত্মিক অভিজ্ঞতাকে নৈরাত্মিকতার ক্রমপ্রসারণে এবং বহির্বিশ্বকে অন্তর্গত করার মধ্য দিয়েই। যার কোনো নিকৃষ্ট ধর্ম নেই, তা' বলে সে কিন্তু ধর্মহীনও নয়। বিশেষ যা কিছু দৃশ্যমান এবং যা অদৃশ্য, যা উপলব্ধ, যা প্রাপনীয়, যা সৃষ্ট তার সমস্তই যে বহির্বিশ্ব এবং

এই চরাচর মিলিয়েই এই অখণ্ড বিজ্ঞান—এটাই তাঁর কবিতার একেবারে মূলকথা।"

এমন এক প্রতিভার আগ্নেয়গিরি জীবনের যোগ্য সম্মান পাননি। বাংলা সাহিত্যের জগতে এই নতুন আগ্নেয়গিরিকে চেপে রাখার একটা আন্তরিক প্রয়াস ছিল, আছে। কিন্তু এই প্রতিভাধর কবিকে নিয়ে যখন আমেরিকান তারুণ কবিগণ চর্চা শুরু করলেন, আমেরিকান সাময়িক পত্রিকার তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ একের পর এক ছাপা হতে লাগল, ইউ. এন. ও তাঁর কবিতা ছাপতে শুরু করল তখনও আমরা তাঁকে চিনতে পারিনি, চেনার চেষ্টা করিনি, এখনও করছি না। শুধু কবিতা লেখার লোভে তিনি সুখের স্বর্গ ত্যাগ করে অনিশ্চিত জীবনকে বেছে নিয়েছিলেন। গণিত প্রভাবিত তাঁর অমূল্য কবিতা ও কবি জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে কথা বলেছেন তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় ঃ "সেই কফি হাউসের আড্ডার আমলে, বিনয়ের মুখে তাঁর কবিতার চেয়েও বেশি শোনা যেত অঙ্কের কথা। তাঁর উদ্ভাবিত অঙ্কের নতুন নতুন থিয়োরি, যা বোঝার সাধ্য আমার ছিল না। অনেকেরই ছিল না, বিনয় সেইসব অঙ্ক-পদ্ধতি পাঠিয়ে দিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, বেশ পয়সা খরচ করে। আমাদের মনে হত, অঙ্ক নয়, সে এক জটিল স্বপ্নে মশ্‌গুল হয়ে আছে। তখন থেকেই বিনয় তার কবিতা ও স্বপ্নের জন্য বাস্তব জীবনের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে শুরু করে। কিন্তু ত্যাগের একটা সীমা আছে, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা কবিতা লিখতে যায় না। বিনয় তার বিদ্যুৎ চমকের মতন পংক্তিগুলি লিখে বাংলা কবিতাকে ধন্য করেচে, কিন্তু ক্রমশই জীবন থেকে সরে গেছে সে। তার কবিতা পড়ে আমরা বন্ধুরা বা পাঠকরা আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু সে নিজে কি পেয়েছে? কিছুই পায়নি বলতে গেলে। এতটা না পাওয়া কোন কবির সাজে না।"

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় একসময় বাংলা তথা দেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠিত প্রত্রিকা-প্রতিষ্ঠানগুলি সুকৌশলে চক্রান্ত করে বিনয়ের কবিতাকে এড়িয়ে চলেছে। তার এসব দেখে শুনে তিনি সাহিত্য সাধনায় গভীরভাবে ডুব দিলেন। তিনি কবিতার মধ্য দিয়ে যেমন নিজের 'আত্মজীবনী' লিখতে থাকলেন; তেমনি তাঁর দার্শনিক ভাবনা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে কবিতার জগতকে সমৃদ্ধ করতে লাগল। এটা ঠিক বিনয় জ্ঞানের যে উচ্চতায় বিচরণ করতেন, ভাবে যে গভীরতায় মগ্ন থাকতেন তার মূল্যায়ন করার মতো ব্যক্তিত্বের অভাব ছিল, আছে। তাঁর 'বাল্মীকির কবিতা'র কিছু কবিতা নিয়ে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠলেও কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন যে, একজন মেজর কবি হিসেবে বিনয়ের সমস্ত কবিতা সংরক্ষণ করা দরকার। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেসব কবিতার বিচার করুক।' এই পৃথিবীতে যিনিই নতুন দর্শন, নতুন ভাবনা, নতুন আদর্শের স্রষ্টা, তাঁকে সমাজ প্রথমে ভালোভাবে মেনে নেয়নি। পাগল ভেবেছে। পাগল করেছে। এটাই স্বাভাবিক। সকলের জানা নতুন ভাবনার প্রচার করে মরতে

হয়েছিল সক্রেটিস, গ্যালিলিওকে। মরতে হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবকে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তো অনেকে পাগল বলতেন। কবি বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রেও হয়েছে একই ঘটনা। সেই সময়ের কিছু মুখোশধারী কবি ষড়যন্ত্র করে কবি বিনয়কে শেষ করার জন্য। এ বিষয়ে অমলেন্দু বিশ্বাস তাঁর 'ছিন্ন এ্যালবাম ঃ আমাদের বিনয় মজুমদার' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ "বারবার ওনাকে (কবি বিনয়) উন্মাদ প্রতিপন্ন করর জন্য সেই সব মুখোশধারী কবিতা লেখকরা এক গূঢ় ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। একে নষ্ট করার, মেরে ফেলার।....আমার তো মনে হয় বিনয়দা কোন তথাকথিত উন্মাদগ্রস্ততার মধ্যে ছিলেন না। বড় প্রতিভাধর ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন এক ধরণের শক্তি, স্ফুরণং সর্বোপরি দিব্যোন্মাদ ভাব থাকে যে ভাবে বিভোর থাকে তাঁর চিন্তা, কল্পনা, দর্শন ও চেতনা। তবে খুব সামান্য প্যারানোনিয়ায় আক্রান্ত থাকলেও এই নিঃসঙ্গ, অকৃতদার কবির প্রতিভাকে সেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বলে মনে হয়।" এক আলাপচারিতায় কবি বিনয় বলেছেন, 'আমি পাগল নই, আমাকে পাগল বানানো হয়েছে।' একাধিক, একজন মানুষ যাঁকে বিভিন্ন সময়ে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে; অথচ সেই মানুষই সৃষ্টির আনন্দে সবসময় মেতে আছেন—এটা কী সম্ভব? সম্ভব নয়। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়া; 'নক্ষত্রের আলোয়' (১৯৫৮) থেকে 'নির্বাচিত কবিতা' (২০০৬) পর্যন্ত ২৯টি কাব্য লেখা; Geometrical Analysis and Unital Analysis -1965, Interpolation Series-1965, Root of Calculas প্রভৃতি গণিতের গ্রন্থ লেখা। মানসিক হসপিটালে নিয়ে যাবার সময় পড়ার জন্য গাড়ি থেকে নেমে একগুচ্ছ সাময়িক পত্র কেনা প্রকৃত অসুস্থ মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় তিনি শুধু কিছু কবি বন্ধুই নয়, বড় ধরনের চক্রান্তের শিকারই হয়েছেন।

জ্ঞানপাগল ছিলেন বিনয়। জীবনের সমস্ত নিশ্চিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ তুচ্ছ করে, উর্বর মেধাকে কর্ষণ করে সাহিত্য, গণিতের যে সোনার ফসল তিনি ফলিয়েছেন তার প্রকৃত কদর বুঝতে আরো সময় দরকার। সমাজের ধারক-বাহকদের আরো আন্তরিক হতে হবে। শ্রদ্ধেয় অমল কুমার মণ্ডলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বিনয়বাবু অনুযোগের সুরে বলেছিলেন ঃ 'তিনি ভারতবর্ষে ব্রাত্য হলেও, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে ব্রাত্য নন।' উত্তম কুমার ঘোষ এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ 'তাঁর কবিতা নাকি আমেরিকা, জার্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। ইংল্যাণ্ড, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড ও ম্যাকমিলান নাকি তাঁর কবিতা প্রকাশ করেছে। ইউ. এন. ও তাঁর কাব্য ছেপেছে। আমেরিকার তরুণ কবিরা তাঁর কাব্যের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছেন'। অথচ দেশে তিনি অস্পৃশ্যই থেকে গেলেন। অস্পৃশ্য হওয়ায় হিন্দুরা একসময় এত অত্যাচার ও অবিচার করেছিলেন যে বিনয় একসময় মুসলমান হয়ে যাওয়ার মনস্থির করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে

বলেছিলেন ঃ "তখন এতো কষ্টের ভিতরে চলছিল অবস্থাও হিন্দুদের নির্যাতনে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাওয়ার যোগাড়। টিকে থাকা কষ্ট হয়ে পড়ছিল। তখন আমি পালিয়ে চলে গেলাম ফরিদপুরে। বাল্যকালের বহু বন্ধুদের সঙ্গে দেখা। আমি বললাম, আমি মুসলমান হব। আমাকে তোমরা তোমাদের ধর্মে নিয়ে নাও"। (লোক, বিনয় মজুমদার সংখ্যা, ২০০১, ঢাকা, পৃষ্ঠা, ৩৪৫) সুতরাং একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না, এমন একজন মানসিক ঝড়ে বিধ্বস্ত জ্ঞানের গম্বুজ, মহত্বের মহীরূহ, প্রতিভার পিরামিড বিনয় এবং তাঁর সৃষ্টিকে জানতে গেলে অনেক সাধনার প্রয়োজন। 'মানুষ নিকটে এলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়' —এই হীরক-দ্যুতি-ময় লাইনের স্রষ্টা যিনি, কেমাত্র তাঁরই অধিকার আছে 'আকাশের দিকে থুথু ছিটিয়ে দেওয়া কিংবা পাতালের মুখে লাথি ছুড়ে মারা'র, সাগরে সজ্জা পেতে কেউ শিশিরের ভয়ে ভীত হন না। এমন সন্ন্যাসী ঋষি কবিকে সম্মান জানানোর সাহস, যোগ্যতা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের নেই।

কবি বিনয়ের কবিতা যেন এক একটা না পাওয়া আবিষ্কার। তাঁর সৃষ্টির সৌধ বিজ্ঞান-গণিতের নিখাদ উপকরণে তৈরি। তাঁর প্রথম দিকের কবিতাগুলি প্রেমের সাধনায় সমৃদ্ধ। প্রেম মানুষকে সত্যসন্ধানী করে তোলে। কবিতার পর কবিতায় তিনি প্রেম চর্চার মধ্য দিয়ে 'ঈশ্বরী' অর্থাৎ নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। গায়ত্রী রূপ কাব্যলক্ষ্মীর যে সাধনা আমরা প্রথম থেকে তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করি সে তো নিজেকে জানারই সাধনা। তাইতো হাজার বার দেখা পৃথিবীও কবির কাছে যৌবন রহস্যে মোড়া চিরনতুন। এই নতুনের সন্ধানে তিনি কবিতায় অপ্রতিরোধ্য, অপরিহার্য অমোঘ শব্দকে, উপমাকে ব্যবহার করেছেন ঃ

> 'যে গেছে, সে চলে গেছে, দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে
> বারুদ ফুরায় যেন অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে আপন অন্তর
> লোকে।'

কখনো কবির বেদনায় নক্ষত্রের মিছিলও ম্লান হয়ে প্রেম জ্যোতির্ময় রূপ লাভ করে। এভাবে বিশ্বস্ত কবি-প্রাণের মানুষ বিনয় অন্তর্যামীর হাত ধরে 'পৌঁছে যান বাণী বৈকুণ্ঠে। তাঁর কবিতার ব্যর্থ প্রেমের যন্ত্রণা এক অদ্ভুত প্লেটোনিক মাহাত্মের স্পর্শ পেয়ে পাঠক মুগ্ধ হয় ঃ

> 'রক্তের ভেতরে জ্যোৎস্না,
> তোমার দেহের কথা ভাবি—
> নির্বিকার কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে অন্ধকার সুখ
> এমন আশ্চর্যভাবে মিশে আছে।

অথবা, 'প্রাচীন চিত্রের মতো চিরস্থায়ী হাসি নিয়ে তুমি

চলে যাবে, ক্ষত নিয়ে যন্ত্রণায় স্তব্ধ হব আমি।"

অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা, তীক্ষ্ণ মেধা, লাবণ্যময়-দীপ্ত শৈলীর মিশ্রণে সৃষ্টি বিনয়ের কবিতা। কেউ কেউ বলে থাকেন, কবি বিনয় মজুমদার জীবনানন্দ দাশের রেপ্লিকা মাত্র। তাঁদের এই দাবি সঠিক নয়। এই সমস্ত সমালোচকেরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিনয়ের বিখ্যাত কিছু কবিতার লাইন ব্যবহার করেন। যেমন—

(ক) মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়!'

(খ) 'করুণ চিলের মতো সারাদিন, সারাদিন ঘুরি।
ব্যথিত সময় যায়, শরীরের আর্তনাদে, যায়
জ্যোৎস্নার অনুনয়; হায়, এই আহার্যসাধন।'

(গ) 'তবু কী আশ্চর্য, দ্যাখো, উপবিষ্ট মশা উড়ে গেলে
তার এই উড়ে যাওয়া ঈষৎ সংগীতময় হয়।'

(ঘ) 'আমি চুপে অতি এটা এদের নিকটে গিয়ে শুই।"

(ঙ) 'অত্যন্ত নিপুণভাবে আমাকে আহত করে রেখে
একটি মোটরকার পরিচ্ছন্নভাবে চ'লে গেলো।' ইত্যাদি।

—এসব উদ্ধৃতিতে জীবনানন্দ দাশের প্রভাব থাকলেও সে প্রভাব বড় হয়ে ওঠেনি। একজন কবি অন্য কোনো মহৎ সৃষ্টি থেকে সৌরভ সংগ্রহ করতেই পারেন। স্বয়ং জীবননান্দের উপরেও দেশি-বিদেশি কবির প্রভাব ছিল। তাতে সৃষ্টি-মহিমা অক্ষুন্নই থেকেছে। বিনয়ের কবিতায় জীবনানন্দের প্রভাব নিয়ে রে-রে করে ওঠা কিছু সমালোচকের বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিনয় অন্য একটি গদ্যে বলেছেন ঃ

"দুই পাচক দুইভাগ করা একই জিনিসগুলি দিয়ে দুই জায়গায় ডাল রান্না করল। খাবার সময়ে দেখা যাবে যে দুই ডালের স্বাদ দু-রকম, গন্ধ দু-রকম ইত্যাদি। তেমনি একই বিষয়বস্তু, একই বাংলা ভাষায়, একই উপমা অলংকার নিয়ে দুজন কবিকে আলাদাভাবে লিখতে দিলে দুই কবি দুই কবিতা লিখবে। দুটি কবির কবিতা একই পাঠক পড়ে দেখবে যে দুইজনের কবিতার স্বাদ আলাদা, প্রকার আলাদা। একে আমি বলি কবির নিজস্বতা। অর্থাৎ পাচকের নিজস্বতা। পাচকগণ ও পাচিকাগণও মহাশিল্পী বোঝাই যাচ্ছে। এই হল আরেক রহস্য-শিল্প রহস্য।"

শ্রদ্ধেয় সমালোচক জহর সেনমজুমদার এবিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয় ঃ

"...বিনয়ের কবিতায় গ্রহনক্ষত্রের তাৎপর্য অপরিসীম। বহু কবিতায় তিনি নক্ষত্রদের ফিরিয়ে এনে এক সামগ্রিক চিত্রকল্পের অভিঘাত সৃষ্টি করেছেন। অনেকটা জীবনানন্দকে এ-ক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ বিনয়ের মতো এইভাবে প্রতিনিয়ত দেহ ও আত্মার সঙ্গে নক্ষত্রের ঘনিষ্ঠ যোগস্থাপনে অগ্রসর হননি। বিনয় যেন প্রত্যেকটা নক্ষত্রের সঙ্গে তাঁর ভাব বিনিময় করেছেন।" একথা চিরসত্য বলে মনে হয়।

কবি যখন বলেন ঃ

"গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর সব
মানুষের শরীরের যোগাযোগ আছে।
অমাবস্যা পূর্ণিমায় সব
মানুষের বাত বাড়ে। আমারি তো বাড়ে।"

একথা ঠিক, স্বল্প পরিসরে কবি বিনয়কে জানা বা তুলে ধরা অসম্ভব। নিমচাঁদের পৌত্র, বিপিনবিহারী ও বিনোদিনীর পুত্র বিনয় সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবি, কবিতার শহিদ; যিনি নিজের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। অন্যান্য কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা যায় 'গণিতের শূন্য' কবি শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর স্বর্ণ-দ্যুতি-ময় অজস্র কবিতার লাইন প্রবাদ প্রবচনের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্য দিয়ে এক ধরনের আবিষ্কারের আনন্দ লাভ করা যায়। যেমন—

(ক) সকল ফুলের কাছে এত মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষরা কিন্তু মাংসরন্ধন কালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।

(খ) মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।

(গ) সূর্যগ্রহণের কালে কিছু লেখা ভালো ভেবে আমি লিখি।

(ঘ) ক্যালকুলাসের এক সত্য আমি লিপিবদ্ধ করি।

(ঙ) সমুদ্র, নক্ষত্র, চাঁদ, নদ, ফুল সহজেই এক সঙ্গে কলরব করে।

(চ) পিঁপড়ের এত সরু পায়ে হাড় আছে, মাংসপেশী আছে।

(ছ) সারাটি জীবন আমি বিশ্বকে দেখেছি যতদেখা যেতে পারে।

(জ) প্রকৃত চুলের মধ্যে অমেয় জলের উৎস আছে।

(ঝ) বৃষ্টি পতনের কথা কোন দিন গোপন থাকে না।

(ঞ) কেবল আঁধার নয়, আলোও আড়াল করে।

(চ) ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম? ইত্যাদি।

বলেছেন ঃ "....ওর কবিতার আমি বরাবর মুগ্ধ পাঠক। ওর কবিতায় অজস্র সংকেত আছে, যা অন্যরকম বোধ নিয়ে বোধগম্য হতে পারে বলে মনে হয়। সেমিটিক শাস্ত্রে জ্ঞানকে পাপ বলা হয়েছে কেন, সেটা যেন বিনয়ের জীবন এবং এই পরিণতি দেখলেই বোঝা যায়। ওর এই পরিণতি একদিক থেকে দুঃখের। কিন্তু আমার মনে হয়, একজন যথার্থ কবি যেহেতু প্রকৃত দার্শনিক, এ ধরণের পরিণতি খুবই স্বাভাবিক। ধিওজেনিসের কথা মনে পড়ে যায় আর কী!" সবশেষে এখানে কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের 'বিনয় মজুমদারকে' নিয়ে লেকা কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরা হ'ল ঃ

"তখন তোমার বয়েস
কতই বা হবে! তের চোদ্দর কিছুতেই বেশি নয়।
তোমার শ্যামল বিষণ্ণ মুখে লেখা ছিল কত কথা
কত যুগ কত শতকের কত নৈসর্গিক রঙের
ছবি আঁকা ছিল অদৃশ্য কত চিন্তার মায়াপটে।
একটি লেখার নাম 'প্রজাপতি' অপর লেখাটি কয়লা
দুটি বিপরীত ধর্ম বিষয় সৃষ্টির আলোছায়া
উপলব্ধি একই বৃন্তে ফোটানো যুগ্ম ফুল
আজো অম্লান হয়নি সুরভি যাঁর। তারপর বহু বর্ষ
কালের জোয়ারে ব্যাধি-সমুদ্রে সাঁথরে একান্তরে
পৌঁছে বলছি 'প্রাণাধিক' তুমি লেখো, লেখো, শুধু লেখো।"
('অনুভব' পত্রিকার সৌজন্যে)

তথ্যসূত্র ঃ

১। আকাশ বিশ্বাস—'পঞ্চাশের প্রবণতা ও বিনয় মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ', ২০১২
২। জ্যোতির্ময় দত্ত—'বিনয় মজুমদার ঃ কবিতার শহিদ', প্রচ্ছায়া, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৯
৩। জহর সেনমজুমদার—'বিনয় মজুমদার ঃ একটি পর্যালোচনা'; 'প্রচ্ছায়া'—১৫ অক্টোবর ১৯৯৯
৪। অমল কুমার মণ্ডল—'আমাদের কবি বিনয় মজুমদার', চতুর্থ দুনিয়া, ২০০৪
৫। যতীন বালা—'উপেক্ষিত কবি', প্রচ্ছায়া, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯৯,
৬। মঞ্জুষ দাশগুপ্ত—'কবিতার স্বয়ং ঈশ্বর', প্রচ্ছায়া,"
৭। প্রসঙ্গ ঃ বিনয় মজুমদার—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক মোদক,—সীমান্ত সাহিত্য, ১৯৮৬
৮। বিনয় মজুমদার—কাব্যসমগ্র ১ম খণ্ড; প্রতিভাস, ২০০০
৯। বিনয় মজুমদার—কাব্যসমগ্র ২য়খণ্ড; প্রতিভাস, ২০০২

পীযূষ কান্তি অধিকারী, অধ্যাপক, সুন্দরবন হাজী দেসারত কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

কবিতায় ভাবপ্রকাশে গদ্যরীতির গভীরতা

সুকুমার মোহান্ত

মানুষের মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম হোল ভাষা। এই ভাষা কাব্যিক হতে পারে, আবার কাব্যিকতাও যে পদ্যের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পাবেই এমন কোনো কথা নেই। গদ্যের ভেতর দিয়েও কাব্যিক অভিব্যক্তি ঘটে। মোদ্দা কথা হোল ভাব। অবশ্য মনের ভাবকে প্রকাশ করার প্রথম রাস্তাই হোল গদ্য। দৈনন্দিন বা চলতি জীবনে মানুষ নিজের ভাব প্রকাশ করে গদ্যে। সাধারণ চিঠিপত্র থেকে শুরু করে কথাবার্ত্তা হয় গদ্যেই। এর বিশিষ্ট রূপ পাওয়া যায় সাহিত্যিক গদ্যে। আবার একটি বিশেষ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পদ্য বা কাব্যিক ভঙ্গী প্রকাশ সুন্দর হয়ে ওঠে। কবি সমর সেনের মহুয়ার দেশ' কবিতাটি ঠিক এইরকম ঃ—

ক্লান্ত সায়াহ্নের মেদুর অবকাশে
অলস সূর্য নদীর জলস্রোতের বুকে
এঁকে দেয় উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আগুন লাগে যেন জলের গভীর অন্ধকারে
আর আপাত ধূসর জলের ফেন রাশিতে।

এখানে গদ্যের ভাষা থাকলেও বর্ণনা হয়ে উঠেছে কাব্যিক। গদ্য রীতিতে রচিত হয়েছে রম্য কবিতা। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে গদ্য কবিতা রচনার প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠেছিল বাঙালী কবিদের মধ্যে। কারণ বিদেশী ভাষায় রচিত কবিতাগুলির গভীর অধ্যয়ন, এই রীতিটিকে বুঝতে সাহায্য করেছিল বাঙালী কবিদের। কাজেই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পাশ্চাত্য সাহিত্যই গদ্য কবিতার প্রসূতি প্রকোষ্ঠ।

গদ্য রীতিতে কবিতার মধ্যে দুটি ভাগ আছে (১) কাহিনীমূলক গদ্য কবিতা, এবং (২) শুদ্ধ অনুভূতি প্রধান কবিতা। এখানে থাকে অনুভবের একমুখী ও সংহত প্রকাশ। অবশ্যই মিলনহীনতা গদ্য কবিতার একমাত্র লক্ষণ নয়। এখানে ছন্দের ঝংকার থাকে না, এমনকি পংক্তি বিন্যাসেও সমমাত্রিক পর্বও থাকে না। ফলে পর্ব সংখ্যাও নিয়মিত। এক্ষেত্রে প্রতিটি পর্বেই অন্তর্গত যে কোন প্রথম ধ্বনিতে ঝোঁক পড়ে অর্থানুযায়ী। মৌখিক গদ্যের বাক্‌স্পন্দ আর কথ্যচালই গদ্য কবিতার জায়গা পায় বেশি।

গদ্যকবিতার প্রথম দেখা মেলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে। ইউরোপে নিরুপিত ছন্দে কবিতা লেখা হ'ত অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত। অবশ্য পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের নাট্য সংলাপে কাব্যস্পন্দিত গদ্যের ব্যবহার দেখা গেছে। শেক্সপীয়রের নাটকে এর

হলিশ মেলে। সপ্তদশ শতকে মিল্টন ব্ল্যাংক ভার্সকে কাব্য রচনার মূল মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন, যদিও এই ছন্দ তাঁর সৃষ্টি ছিল না। 'অন্ত্যানুপ্রাস' কে ব্ল্যাংক ভার্স স্বীকার করে না। কবিতা যে নিরূপিত ছন্দে বন্দী থাকবে না তার ইঙ্গিত দেয় 'ব্ল্যাংকভার্স'।

লিখিত গদ্য ভাষার উন্নতির সঙ্গে গদ্য কবিতার সম্ভাবনা বিকশিত হয় উনিশ শতকের আগেই। তবুও গদ্য কবিতার আগমনের জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যকে উনিশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ঊনবিংশতাব্দীর প্রথম দিকেই ওয়ার্ডসওয়ার্থ' তাঁর "লিরিক্যাল ব্যালাডস"এ পরিষ্কারভাবে বলেছেন—"The language of prose may yet to be well adopted poetry's and I have previously asserted that a large portion of the language of a very good poem can in no respect differ from that of good prose.............. There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition"

ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই অভিমত সমসাময়িক কবি 'কোলরীজ' মেনে নিতে পারেননি। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের বক্তব্য অনেকটা মেনে নিয়েও বলেছিলেন কবিতা বিশেষে বিষয়বস্তু এবং কবির উপলব্ধি সঠিক ব্যঞ্জনার জন্য ছন্দের প্রয়োজনকে সরিয়ে দেওয়া যায় না (বায়োগ্রাফিয়া লিটারিয়া—১৮১৭)। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, 'সুপারফিসিয়াল ফর্ম' এর দিক থেকে কবিতায় নিরূপিত ছন্দ ও গদ্যের প্রভেদ করা উচিৎ নয়।

গদ্য কবিতা লেখা যে সম্ভব সে কথা রোমান্টিক যুগের ইংরেজ কবিরাই প্রথম বলেছিলেন, যদিও এদের কবিতায় তেমন প্রতিষ্ঠা পায়নি। এ ব্যাপারে পথিকৃতের সম্মান দিতে হয় ফরাসী কবিদের। কারণ ফ্রান্সে অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছিল একটি একাদেমী। এই প্রতিষ্ঠানটি কবিতার গঠন এবং ছন্দ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দিয়েছিল। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ এর মধ্যে কোন কবি এই নিয়মের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে না। ফ্রান্সেও প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছিল 'কাব্যস্পন্দিত' গদ্য রচনা। তার পর এই স্পন্দিত গদ্য' হয়ে উঠেছিল বিদেশী কবিতা অনুবাদের মাধ্যম। কিন্তু এদের ভাবসংহতি যুক্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে প্রকৃত গদ্য কবিতা বলা যায় না। এর পরই, অনুভব সমৃদ্ধ প্রকৃত গদ্য কবিতার জন্ম হল বিভিন্ন কবিদের হাতে। এই সব কবিরা হলেন আলয়সিয়াস বাত্রাঁ' (১৮০৭-১৮৪১)। ইনিই প্রথম লিখেছিলেন গদ্য কবিতা। এই ফরাসী কবির প্রথম গদ্য কবিতা সংকলন 'গ্যাস পার দ্য লা নুই' (Gaspard-de la nuit), প্রকাশ পায় ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে। তার পর নাম করতে হয় 'মরিস দ্য গুঁয়েরা' (Manrice-de-Guierin/১৮১০-১৮৩৯)। এঁর গদ্য কবিতার দুটি সংকলন যেমন 'ল্য সাঁতার' (Le centaur) আর 'ল্যে বর্শং' (Le Bacchante) এটি প্রকাশিত

হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থটি প্রকাশ পাওয়ার আগেই গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করেন 'বোদ লেয়ার'। 'মরিস দ্য গুয়েবার' তার আগেই লিখে ছিলেন গদ্য কবিতা। তবে বোদলেয়ারের পূর্ববর্তী এই দু জন কবিই কবিতা সংখ্যায় সংযুক্ত করেন 'গদ্য' কথাটি। বোদলেয়ার গদ্য কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় তাঁর কবিতা সংকলন "ক্লেদজকুসুম"। এই সকলন তাঁকে এনে দিয়েছিল বিরাট খ্যাতি। সংকলনটি প্রকাশের কয়েকবছর পরে তিনি সংকলনটির নামের সাথে 'গদ্য' শব্দটি যোগ করেন। এর নামকরণটি হল 'Petits poemes en prose, or Le splen de paris"। এর পর থেকেই গদ্য কবিতার মাটি শক্ত হল।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে গদ্য কবিতা বেছে বেছে ফ্রান্সকেই পছন্দ করল কেন? ফ্রান্সেই কেন রচিত হল প্রথম গদ্য কবিতা? সত্যি কথা বলতে কি এখানের পরিবেশ ও পরিস্থিতির জটিলতা ছিল এর প্রধান কারণ। কঠিন জীবন যন্ত্রণা, শোষণ এবং কঠের বাস্তব থেকেই গড়ে ওঠে সাহিত্য। সমাজ এবং সমকালের ভিত্তি থেকে বেরিয়ে আসে সৃষ্টি; জীবন ধর্মী সাহিত্য কর্ম। একটি সাহিত্য অনুষ্ঠানে একজন অতিথি বলেছিলেন যে সব কবিতাই কবিতা নয়। নির্জ্জলা খাঁটি কথা! তবে সুস্থ ও সুন্দর জীবনের বন্দনাই যে কবিতা হবে এমনটা মেনে নেওয়া যায় না। কবিতার মধ্যে জীবন যন্ত্রণার অভিব্যক্তি যদি সুন্দর হয়ে ওঠে তবে তাকে নিশ্চয় জীবনধর্মী বা জীবনমুখী কবিতা বলতে কোন বাধা নেই। ঠিক সেই কারণেই ফ্রান্সের পরিবেশ জীবন যন্ত্রণায় এবং প্রবল সংকটের ভেতর দয়ে চলছিল। ফলে কোমল লালিত্য পূর্ণ সাহিত্য কলার অপমৃত্যু ঘটেছিল। কাজেই জীবনের কদর্যরূপে কঠোর ভাষায় প্রকাশ পেয়েছিল গদ্য কবিতার মধ্যে। যন্ত্রণা, শোষণ ও অত্যাচারের অন্ধকার ভেদ করে, ফ্রান্সই করেছিল মানবমুক্তির ঘোষণা। মানুষের স্বাধীনতা আর সাম্যের বাণীই নিয়ে এসেছিল রক্তাক্তফরাসী বিপ্লব। কিন্তু অসংখ্য জীবনের বিনিময়েও স্থায়ী হয়নি সেই মহান আদর্শ। নেপোলিয়ন আবার প্রতিষ্ঠা করলেন রাজতন্ত্র। অভিজাত সামন্ততন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়েছিল 'রক্তাক্ত বিপ্লব'—তা আর ফিরে এল না। তার স্থান দখল করল বিশ্বশাসনের উদগ্রকামনার উন্মত্ত সাম্রাজ্যবাদ।

আসলে উনিশ শতকে ইহমুখী জীবন উপভোগের প্রবল চেতনা, সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল সমগ্র ইউরোপে। শিল্পী সাহিত্যিকরা এই চেতনাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। জীবন যে সবসময়েই মঙ্গল এবং কল্যাণপ্রদ নয়, ভয়—ঘৃণা-ক্ষতি-নিষ্ঠুরতা, মৃত্যু আর দ্বিধা দ্বন্দ্বের, মিশ্রণে জীবন যে জটিল এবং কঠিন—এই সত্যকেই উপলব্ধি করেছিলেন স্রষ্টারা। এই জন্য তাঁরা এই কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে লালিত্যপূর্ণ শব্দ, চিরাচরিত কাব্য বিষয় ও প্রকরণ জীবনের এই জটিল ও বাস্তব রূপকে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম।

সেজন্য তাঁরা খুঁজে ছিলেন নতুন বিষয় এবং প্রকরণ। বোদলেয়ারের কবিতায় তার প্রকাশ ঘটল। বাস্তব চেতনাই ক্রমশ বিস্তৃতি এবং শক্তি পেতে থাকলো। এর পরই এলেন র‍্যাঁবো। গদ্যে কবিতা রচনার রীতিকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা দিল তাঁর "নরকে এক ঋতু" (une saisonon/ 1873) এবং Les illumination/১৮৮৬)। এই সংকলন দুটি তীক্ষ্ণ অনুভব -স্পন্দনে দীপ্ত গদ্য।

ইউরোপ, বরাবোরই নতুনকে গ্রহণ করেছে। যেমন রেঁনেশাসের জন্ম হয়েছিল ইতালিতে। কিন্তু তাকে বুকে জড়িয়েছে ইউরোপ, ১৫১৬ এবং ১৭ শতাব্দীতে এর বিকশিত রূপ দেখা গেছে ইউরোপেই। নতুন কাব্য রীতিকে বা আধুনিক সাহিত্য রীতিকে গ্রহণ করতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। যাই হোক ইংরেজ কবিরা গদ্যকেই কবিতার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেন। এর পেছনে যে ফরাসী কবিদের প্রেরণাই যে মূল পরিচালিকা শক্তি সে কথা বলাই বাহুল্য। অবশ্যই এ কথাও মানতে হবে যে, বিশ শতকের প্রথম দু'দশকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জটিল পরিস্থিতির প্রভাব এক্ষেত্রে ছিল খুব গভীর। আধুনিক বিজ্ঞান, সমাজের আগের সুস্থিতির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ঈশ্বর বিশ্বাসে ফাটল দেখা দিয়েছিল। উপনিবেশ-অধিকার নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘাত হয়েছিল তীব্র। অপরদিকে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতার প্রশ্নকে ঘিরে রাষ্ট্রের সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্বও শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরিবেশ ও পরিস্থিতির কঠিনতার জন্যই ইংরাজী কবিতার ক্ষেত্রে অক্ষরের ওপর নির্ভরশীল 'স্প্রাংরিদম' ছন্দের ওপর ঝোঁক দেখা দিল। ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সর্বাধিক নির্দেশহীন 'মিশ্র মুক্তছন্দ' (verslibre)। সেই ছন্দের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ইংল্যান্ডের কবিরা জন্ম দিলেন নিজস্ব ছন্দ (Free verse)। সেই সঙ্গে এল গদ্য কবিতা 'প্রোজ পোয়েম'। এই Prose Poem সে দেশে প্রতিষ্ঠা পেতে সক্ষম ও সফল হয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইংরাজী সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল গভীর। এই শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী সাহিত্যিকরা গদ্যে কবিতা রচনা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। এ কথা শুনলে অবাক হতে হয়, যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম গদ্য রীতিতে কবিতা রচনার কথা সচেতন ভাবে ভেবেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা 'কবিতা পুস্তক' (১৮৭৮) এর ভূমিকা এর প্রমাণ দেয়। তিনি ভূমিকায় বলেন—'আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্য অপেক্ষা গদ্য' কাব্যের উপযোগী। বিশেষ বিশেষ পদ্য কাব্যের উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু অনেক স্থানে গদ্যের ব্যবহারই ভালো। যে স্থানে ভাষা ভাবের, গৌরবে আপনা আপনিই ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ বক্তব্যে 'ওয়ার্ডসওয়ার্থ' ও 'কোলরীজে'র চিন্তাধারার মিল খুঁজে নিতে কষ্ট হয়না। কাজেই এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে বাঙালী কবিরা ইংরাজ

রোমান্টিক কবিদের খোঁজ খবর ভালোই রাখতেন। কোলরীজের 'Rime of the ancient marriner' 'রাইম অব দি এ্যানসিনেয়ন্ট ম্যারিনার' কবিতাটি Moralism বা 'নৈতিকতা'র একটি জীবন্ত রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতা পুস্তক' এ গদ্য কবিতার প্রতি ঝোঁক ধরা পড়ে। এই সংকলনে বঙ্কিম লিখিত তিনটি গদ্য কবিতা যথেষ্ট শক্তিশালী। কবিতাগুলির মধ্যে 'বৃষ্টি' এবং 'খদ্যোত' বিশেষ মূল্যবান এবং শক্তিশালী কবিতা। এই গ্রন্থটির পরবর্ত্তী সংস্করণের নামকরণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র 'গদ্য পদ্য' শব্দ বন্ধটি যুক্ত করেছেন—'গদ্যপদ্য কবিতা পুস্তক'। এছাড়া 'আর্যদর্শন' পত্রিকার (১৮৮১-১৮৮৪) সংখ্যায় প্রকাশিত 'বর্ষার মেঘ' কবিতাটি 'পদ্য পঙ্ক্তিক' গদ্যকে ব্যবহার করেছিলেন 'রাজকৃষ্ণ রায়'। কবিতা হিসাবে তেমন ভালো না হলেও 'অন্ত্যমিল' ও পর্ব সমতাহীন ভাবনির্ভর পঙক্তি' বিন্যাস দ্বারা ভাবের সামগ্রিক ঐক্য নির্মাণের পরীক্ষা করেছিলেন রাজকৃষ্ণ। তাই বাংলা গদ্য কবিতার ইতিহাসে কবিতাটির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে যেমন

'আকাশ নীল—অনন্তনীল
মানব চক্ষু অনন্ত নয়—
সুতরাং আকাশ অনন্তনীল।'

কবিতাটির সঙ্গে কবি একটি পাদটীকাও সংযুক্ত করেছিলেন যেমন—"যে সকল গদ্যে, পদ্যের কাব্যাত্মক ভাব থাকে, সেই সকল গদ্যের কোন কোন বিষয় এই রূপে পদ্যপৌঙ্ক্তিক' প্রণালীকে সাজাইয়া লেখা আমার বিবেচনায় ভাষার একটি নতুন অঙ্গ।" নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গদ্যকবিতা রচনা করেননি, তবে অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে গদ্য ও পদ্যের সমতা নিয়ে বিশেষ চিন্তা করেছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩১৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রলালের দীর্ঘ প্রবন্ধ 'কালিদাস ও ভবভূতি'। প্রবন্ধটির একজায়গায় তিনি বলেন—কোন কোন সমালোচক বলেন Wordswarth'এর পদ্যের ভাষা গদ্যের মত। যদি গদ্য পদ্য অপেক্ষা ভাব সুন্দরতর রূপে প্রকাশ করে, তাহলে আমরা পদ্যে চাইনা, গদ্যই চাই।" অপর দিকে গদ্য রীতিতে কবিতা রচনার পক্ষে মতামত দিয়ে বলেছেন—"পদ্যের ঝংকার গদ্যে দেওয়া যায়, কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাগতি পদ্যে নাই।" কাজেই কবিতার ভাব প্রকাশে গদ্য রীতির গভীরতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়।

সুকুমার মোহান্ত, **অধ্যাপক, বিনোদবিহারী মাহাতো কলেজ, বালিয়াপুর, ধানবাদ**

COST REDUCTION IN STEEL INDUSTRIES SPECIALLY BOKARO STEEL PLANT

B. N. Singh

ABSTRACT

Cost in any business firm is a pivotal part in the process of production as it helps in determining the profitability of any form and helps in fixing the price. This means establishing itself in the market as market control depends on the price of the production operating in the market. Cost is the determining factor upon which the price of any production be fixed. The logic is that higher the cost of production higher is the price and lower the cost of production lower is the price. In order to stand in the market, effort should be in minimizing the cost and maximizing the profit. Cost control is the tool by which the management price to control the cost from fobbing.

Our emphasis is on the cost control of Bokaro Steel Plant. Considering the importance of cost in determining profitability, steps have been taken by the cost control department, which provides valuable information on cost and cost related topics, which could help in improving the profitability by reducing cost of production .So, it is understood that cost is the essential factor in determining the profitability of the firm. Through this article emphasis is made on every alternation or options by which cost can be effectively reduced with the view of maximizing the profit.

INTRODUCTION

In the modern age of cut-throat competition, the nature and functioning of business organizations have become very complicated. The main function and responsibility of a business manager is to keep an exercise and effective control over the cost. He has to serve the needs of varieties of parties who are interested in the functioning of business. These parties constitute the owners, employees, creditors, government agencies, tax authorities, prospective investors, and last but not the least the management of the business. The business has to serve the needs of different category of people by way of supplying various information from time to time. In order to satisfy the need of these people a sound organization of accounting system is very essential. In the ancient days the information required by those who were interested in a business organization was met by a system of accounting known as financial accounting system. But, financial accounting is mainly concerned with preparation of two important ie; income statement and position statement or balanced sheet. This information served the need of all those who are not directly associated with management of business. Thus financial accounting is concerned with external reporting as it provides information to external authori-

ties. But management of every business organization is interested to know much more than the usual information supplied to the outsiders. In order to carry out its functions of planning, decision making, and control it requires. The financial accounting to some extent fails to provide required cost data to management and hence a new system of accounting which could provide internal report to management and convince of.

Accounting is a part of management system of a business enterprise. It provides financial information concerning the activity of an enterprise to diverge group of people such as share holder, manager, tax authority etc. On the basis of purpose of which information is used, accounting is divided into three parts -1. Financial accounting 2. Cost accounting and 3. Management accounting

Cost accounting is the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of the cost of product and services and for the presentation of ascertainment of cost of every order, job contract process, and service or until as may be appropriate. It deals with the cost of production, selling and distribution. It is thus the provision of such analysis and provision of expenditure as will enable the total cost of any particular unit of production or service to be ascertained with reasonable degree of accuracy and at the same time to disclose exactly how such total cost is constituted (i.e. material, labour, and other expenses) so as to control and reduce its cost.

"Cost accounting" is the processing and evaluation of monetary and non-monetary data to provide information for external reporting, internal planning and control of business operations and special analysis and decision: cost accounting deals with the pecuniary and non - pecuniary data and the cost information's are useful for both outsiders and management. It includes the recording and reporting forms and procedures as well as the principles of cost measurement. Cost accounting provides as means of evaluating a proposed activity/goal by analyzing its different cost generating components and determining cost estimates for those components and for the overall activity.

In other words the cost accounting is that portion of the accounting discipline concerned with the development of cost information related to the activities of an economic entity. This cost information may be estimated future costs developed for planning purposes or accumulated actual costs directed towards evaluation of performance, it may emerge somewhat routinely out of a carefully designed system which has been developed to provide information regarding recurring activities, or be the result of a special cost study directed to an objective not considered in the design of the regular system. Cost accounting is the process of accounting for costs from the point at which the expenditure is incurred or committed to the establishment of its

ultimate relationship with cost centers and cost unit. In its widest usage it embraces the preparation of statistical data, the application of cost control methods and ascertainment of profitability of activities carried out or planned.

Iron and Steel industry has a long history in India. There are many instances to show that the technique of iron and steel making was known to Indian artisans from time immemorial. Indian steel was even exported to several countries and was widely sought after in Persia and central Asia for making the so called Damascus blades. But the industry could not keep pace with time for various reasons.

There are wide varieties of reasons for cost increase in the Indian steel industry, both intra - plant factors and factors beyond the control of a plant such as inflationary pressures, legislated cost increases, consumer resistance, labour unions and Government policy etc. A well-conceived cost accounting system is an integral part of sound management.

Steel being the mainstay of industrial and economic development of a country, the industry has attracted a large number of scholars and agencies to investigate its various aspects via, Finance, personnel, Marketing, Materials, production and Administration. These persons and agencies have also made some valuable suggestions to make its functioning more effective. But the field of cost account, although of vital importance has not attracted the attention of these persons and agencies. Realizing the importance of an efficient system of cost management, an attempt is made in this dissertation to study the cost accounting practice followed by Indian Steel Industry.

OBJECTIVES:

The study concentrates mainly on the practices followed in Steel Plant. This study discusses the practices followed in the field of cost determination, cost control, cost reduction and cost aided decisions. Whatever product your company makes, the cost of your materials is probably one of your largest expenses directly affecting profitability.

But how do you reduce material cost without impacting the quality of your final product and altering what your customers have come to expect and rely on?

Like most effective business cost cutting measures, reducing the cost of goods starts with a thorough analysis of the various direct and ancillary ways in which your base materials consume cash flow and ways to reduce cost.

" Substitute lower cost materials where possible
" Reduce waste
" Eliminate unnecessary product features

" Provide ware house and distribution service

"The so-called "Kautilyan Economics" (400 B.C) laid great emphasis on Cost control for better management of financial systems of Chandragupta, the then first emperor of Maurya Dynasty".1Cost control is no longer a myth, it's a reality at this juncture of 20th and 21st century. To fight cost-push inflation and prevent industries becoming sick, the benefits of this discipline are uncontested. Motivation by corporate management and Government's mandatory measures can only help the industries to survive and grow with a view to strengthening National Economy. Today's cost accountancy is probably better equipped than any other discipline to assume leadership in the field of cost control

Between the twin objectives of cost accounting viz., cost determination and cost control, the latter is of fundamental importance in as much as the fullest and the most efficient utilization of the relatively scarce input resources depends upon the managerial efforts directed towards cost control. Cost control does not come about automatically nor does the cost accountant control costs. The cost accountant is only an instrument of assistance in bringing to the notice of those who are responsible and who can control costs, the strategic points at which executive interference is necessary and on which executive action is demanded.

The new thinking generated would have us believe that the pendulum has swung the full way from "production at any cost to production at rock-bottom cost".

In India, the steel industry is now passing through the critical phase in which technological upgradation with schemes to bring down costs and raise productivity have assumed great importance. The management of steel plants (both in public and private sector) as well as the union Government are attaching due importance to it.

One of the main objectives of an industrial house, whether in private or in public sector is to earn "adequate profits". These profits are the result of the interaction of two factors viz. sales revenue and cost. Therefore, it is imperative to probe into the possibilities of increasing the revenue and reducing the costs in order to achieve the desired goal. The increase in sales revenue is subject to various constraints of market and governmental regulations. Further, in the prevailing period of economic crisis in our country, it is of utmost national importance that adequate attention is devoted to bring to the fore the techniques which can help reduce the costs and thus permit him maximum scope for the optimal use of scarce resources. Besides, the adverse impact of inflation on our export can also be reduced, if attempts are made to reduce the costs. Therefore, in this state of affairs, constant endeavor to

reduce the cost seems to be the only solution to overcome the constraints facing the economic system

COST REDUCTION

Cost reduction is a program involving reducing the cost involved with manufacturing activities. Cost reduction is achieved though: Substitution, Innovation, Elimination, Modification, Reduction.

When cost reduction is implemented, through analysis is under taken for each activity under substitution. When looking at reducing cost, the following factors are taken into accounts - cost per manufactured unit, Human resources hours per/ unit, Unit production / amount of time it takes to produce the unit, Work elimination, Fuel, Energy, and water consumption, Load time, Speed of inventory turnover

Cost reduction is implemented anytime companies need to shave costs their budgets. It helps to eliminates waste production and increase profit and productivity.

Cost reduction strategy can be considered as a specific skill which is necessary for every organization and as a result organization seeks affordable items.

The cost control process in a steel plant is a multi-variety system which is subjected to large number of enter influencing variable affecting the cost performance of steel plant. It is necessary to isolate the role in for influencing of the variable to understand cost performance of the steel plant. Major variables affecting the cost performance of a steel plant are discussed below

PRODUCTIVITY - It is the specific rate of production higher the productivity of the units of a steel plant, lower will be the cost of production. Higher productivity results in better utilization of plant and machinery.

PRODCTION - Production is the physical output from a unit for good cost control, it is necessary that lack unit of the steel plant should run to its maximum capacity. When production from a unit is lower then its capacity then there is the increase in the specific consumption loud. If any unit is underutilized then it will result into higher fixed cost. (overhead, depreciation , interest etc.) per / unit output further , it is needed that the capacity of each succeeding unit should match with the preceding unit so that there is no unit utilization of any unit.

RAW MATERIALS - In the present day scenario, raw materials constitute major cost of production , hence specific consumption of the raw materials should not be more than what is required by the technology employed. Any wastage of raw materials and there detoriation during storage should be totally outside farther raw material quality plays very important role

in cost control lower quality raw materials through cheaper per ton results into higher consumption of not only of its own but also of other raw materials as well as higher consumption of feel and energy. Hence, there is a big effort on the cost of production

FUEL - All metallurgical process in a steel plant takes place at high temperature and hence they are fuel intrinsic. Further cost of fuel is always on the increase. Hence specific consumption of the fuel should be controlled within the limits as needed. Further technologies upgradation in this area should be given priority so that specific consumption of the fuel can be reduced.

ENERGY - Besides fuel, there are other forms of energy that we use in a steel plant. Out of these, energy has a substantial contribution to the cost of production. The quality of electrical power (power factor) is very important since it has a big contribution on the energy consumption and hence to the cost. To reduce electrical consumption there should be correct motor rating. The idle running of the motor is also to be controlled. There should be reduction in specific power consumption to reduce cost. Another area where usually large potential of power saving available is in the area of lighting.

UTILITES - Under utilities comes oxygen gas, nitrogen gas, compressed air, steam and oxygen gas etc. This is the area where cost control steps can be very effective. Leakages of the utility gases in the air are usually ignored.

MEN POWER - There can be utilization of both labour intensive technique of production and capital intensive technique of production. People early on labour intensive considering the shortage of men power. Further labour intensive motivation of work force Is very important for the output. Any drop in motivation means lower production and have higher cost investment in automation level of the plant contribute a lot towards the cost reduction

INVENTORY - Inventory is a double edge sword as far as cost is concerned large inventories means blocked working capital and interest on this capital increases the cost.

TECHNOLOGY - Technology is another area where maximum attention is needed if the cost of production is to be kept low. All those technologies which reduce consumption of row materials fuel energy and utilities and improve the quality of production are to be selected for adoption even if they are having higher capital cost. The increase in the capital cost will be paid off in a short time but the advantages gained by lower consumption and improved product quality will remains for the life time of the plant.

RECYCLING OF WASTE - Most of the process in a steel plant generated a large amount of solid (dust, sludge, scale, scarp, and slag etc. or liquid waste). These wastes if recycled reduce the consumption of raw materials fuel and water investment needed for recycle these work materials has very low pay back period. Hence for cost control these investments are to be made with priority.

RECOVERY OF WASTE ENERGY - Recovery of waste energy has a major contribution in the cost reduction waste gases from the processes are usually at a very high temperature and contain a lot of energy in them betting out these waste gases in the air amounts to throwing valuable in the river recovery of these energy results into lower consumption but also results into lower emissions of CO_2.

COST SHEETS - Details cost sheets along with cost variance analysis prepared based on scientific principle reflects accurately the areas where correction actions are needed for effective cost control.

PRODUCT MIX - Steel plants should have a product miss which should maximize its margins. Stress should be to reduce the production of intermediate saleable products and maximize production of finished products.

SAFETY - Safe working of the processes and equipment aids to the cost management the unsafe working can cause process disturbance equipment break down and injuries to the operators. This in term means loss of production and increase in costs.

COST OPTIMISATION INITIATIVE OF SAIL (COIS) SALIENT FEATURE

* COIS is a strategic approach prepared by SAIL Corporate which outlines areas and actions required to reduce the cost of production on short term and medium term basis for SAIL plants/units and also the sustainability of the cost reduction initiative and the need to make cost reduction a way of life across the organization.

* Following core areas have been identified for cost reduction on continuous basis: Input cost reduction, improving the optng. Efficiency /TE parameters, Quick stabilization of modernized/expansion units, Reducing HR overhead cost and improving productivity

* To achieve the goal of reduction in the overall cost of production (at constant prices) by saving more than Rs. 5000 crores during the period April 2013-March 2016 for entire SAIL.

* Primary focus on identification and implementation of actions, as results are expected to be achieved if the process is followed.

* Identified areas for BSL- Increased use of soft coking coal, Redn. In coke rate, Redn. In GMI, Increase in CC prdn & added steel prodn., Petrol

fuel consumption, Sp refractory consumption, Redn. In sinter recycling, Mills Yld. & reduction in arising, Rolls & lubricant consumption, Utilisation of Engg shops, Salvaging of conveyor belts & waste utilization

* For BSL against the target of Rs. 150 crore in 2013-2014 the actual savings is Rs. 92 Cr.

COIS PLAN FOR 2014-15, BSL

Sl No.	Areas	Unit	Parameter		Fin. Imp(wrt Last Year) Rs.Lakh
			Actual 2013-14	CR Target 2014-15	2014-15
1	Use of soft coking coal (%)	%	5.72	5.00	42
2	Reduction in coke rate	KG/THM	516.70	500.00	13844
3	Reduction in HM-Si	%	0.96	0.94	721
4	Reduction in GMI (SMS-I)	Kg/TCS	1139.50	1139.00	180
5	Reduction in GMI (SMS-II)	Kg/TCS	1145.14	1143.00	977
6	Increase in CC production	000T	2988.32	3100.00	2940
7	Sp. Al. Consumption (SMS-II)	kg/tcs	2.49	2.48	43
8	Redn in Sp. Power consumption	KWH/TSS	460.64	436.00	3748
9	Petro Fuel consumption	Kg/TSS	1.427	0.840	930
10	Redn in Sp. Refractory consumption	Kg/TCS	12.76	12.60	463
11	Redn in Sinter recycled percentage	% on skip sinter	37.40	37.00	83
12	Slabbing Mill Yield	%	87.15	87.20	29
13	Hot Strip Mill Yield	%	96.32	96.40	372
14	HRCF Yield	%	96.17	96.16	0
15	CRM (HR to CRC)	%	93.49	93.60	6
16	Lubricants Consumption	L/TSS	0.97	0.91	229
17	Arisings : overall	%of finished despatch	2.63	2.58	151
18	Roll consumption				
	• HSM	Kg/T HRC	0.90	0.88	135
	• CRM	Kg/T CRC	1.04	0.98	91
19	Salvaging of Conveyor belts	Mtrs/year	4713	3000	96
20	Utilisation of Engg. Shops	Rs. Lacs	4025	3500	3500
21	Spl./ Value added steel production	T	811531	937000	735
22	Sale of Idle Asset	Rs. Lacs	1818	1000	1000
23	Waste Recovery / Utilisation				
i	Sale of Waste Refractory	T/Month	485.51	500	154
ii	Use of LD Slag in SP	Ton	96380	100000	47
iii	Granulated slag sale	T/Mth	69000	75000	296
iv	Sale of Lime Spillage from RMP	T/Mth		150	47
	GRAND TOTAL				29866

TREND OF COST REDUCTION SAVINGS

YEAR	TARGET	ACTUAL	%
2000-01	197	166	84
2001-02	112	114	102
2002-03	155	115	74
2003-04	149	110	74
2004-05	113	27	24
2005-06	106	80	75
2006-07	100	104	104
2007-08	135	136	101
2008-09	90	3	3
2009-10	164	64	39
2010-11	240	-131	-55
2011-12	209	-71	-34
2012-13	218	-139	-64
2013-14	150	92	61

* Drive to reduce losses - Bokaro steel plant has now decided to control monthly mobile bills, house rent allowances and other benefits it provides to employees. The company will also reduce expenditure on public welfare activities. The PSU's has suffered significant losses in the past quarters of this financial year and there are no signs said of revival in the next few months. Sources SAIL said the reassures are been taken assuming that BSL will incur losses in the 2015-16 fiscal. Therefore it becomes necessary to work out effectively on cost reduction measures of Bokaro steel plant in such activities which unnecessary inflate the cost, affecting the overall cost. SAIL used to provide mobile instruments and reimburse telephone bills under closed user group (CUG). "Under the revised scheme, the upper limit of monthly mobile bills from deputy manager rank to GM has been curtailed by 50% The BSL management has also declared that in case where both the spouse are employed in the company and are posted at the same location, only one of them will be paid house rent allowance (HRA). BSL management is serious about cost cutting to cope with the situation Techno economic parameters are being implemented as per international industry bench mark in production process to curtain unnecessary expenses". The management has also cut expenses on public welfare activities. Some examples of reduction in the cost

of welfare activities "The flower show which BSL organized in a ground way in city park every year for several decodes have not been organized. Similarly, the popular basant mela and a National level football tournament have not been announced yet.

TIPS TO ELIMINATE WASTAGES

* Eliminate leakage of gases, oxygen, steam etc.

* Eliminate leakage of water and compressed air lines. close the valve after use

* Stop leakage in lubrication and grease lines as they leak foreign exchange

* Switch off electric lamps / bulbs during day light to conserve power

* Switch off lights , fans and AC before leaving the room

* Consume the welding electrode up to the end

* Repair / Reclaim conveyor idlers, wire ropes, bearing, valves, rollers, electrical, instruments, cable, motor etc.

* Avoid damage of conveyor belt from burning and jamming.

* Reclaim more and more value added items in engg. Shops.

* Grease / lubricate bearings to avoid premature failure

* Operate the cranes properly to avoid pre mature failure.

* Return all unused spares like nut bolts, electrodes, rubber seals, bushes, bearing, rollers etc. To stores. Don't leave them at work spot.

* Empty the oil and grease barrels completely before sending to store

* Avoid breakage of refectory bricks in handling.

* Minimize diversion / rejection in steel melting shops and rolling mills

* Recirculate waste , arising to reduce cost of production

* Eliminate delay in raising invoices of saleable products for faster realization

* Return used lubricants for reclamation and recirculation.

* Avoid running of exhausters, mill stand rollers tables and other equipment, when not required

* Reduce idle running of locus and trucks as diesel is input costly

The following point mentioned above seems to be simple, but if not handled effectively it will lead to inflate cost. In the process of production, the input cost plays the vital role in determining the cost of output. If in the process of production cost is not controlled the final output cost will inflate unnecessary. It is often found that sometimes employees and concerned departments are unaware and reluctant on the points mentioned above therefore such wastages and negligence on the part of the employees and management needs to be looked at seriously.

CONCLUSION

Important object is to exercise control over cost. Idle time of machine and labour need take controlled. Materials are controlled so that they cannot unreasonably inflate cost. Standards are set and actual composed with the standards if any differences are detected are brought to the notices managements for proper action for the propose control costs of different periods. Costing exerts control over all elements of cost in detail in order to minimize cost and maximize profit

Cost is important determinant in fixing the selling price of any products. Unless costing ascertains the cost of sales, the selling price cannot be fixed. Selling price is fixed by adding the margin of profit to cost. From the article presented we come to know that cost reduction plays an important role in leading the market and sustaining in market. As we have seen cost reduction can be attained though small steps which are very crucial in reducing the overall cost.

REFRENCES :

1. Cost control handbook 2014-15 by cost control department, Bokaro Steel Plant, Page 6-8
2. Production planning control and sales coordination Bokaro Steel Plant, annual statistics 2013-14, page 1-46.
3. Highlights of performance of Finance and Accounts department of Bokaro Steel Plant 2013-14, page 4
4. "No likely end to high cost regime Annual survey of Industry 2014, The Hindu, page- 165.
5. SAIL News vol. 42, sep. and oct. 2015, page 4-5
6. Prasad, G., Cost Reduction The management Accountant, vol.-13 No. 3, March 1978, page 241
7. Ray, K.G. Cost Control X-rayed, The Management Account, vol. -22 No. 01, Jan 1987, page 53.
8. Lyengar, S.P., Cost Accounting Sultan Chand and sons. New Delhi, 2013, page 931.
9. The ICMA (London) Cost Reduction 2014, OP. Cit., page 8-9
10. Ibid

Dr.B.N.Singh, Deptt. Of Commerce, P.G.Centre, R.S.P.College, Jharia

Potential & Prospects of Industrial Development in Jharkhand-- A Study.

Manoranjan Singh

Abstract

After the creation of the state on Jharkhand of 15.11.2000 to optimally utilize the available resources of the State in a planned manner and to accelerate the Industrial development of the State, an Industrial Policy has been formulated. To achieve expected Industrial growth the districts of the State has been categorized into three categories. So as to capitalize the industrial potential through planned utilization and development of natural and human resources and to gradually increase the employment opportunities.The industrial development in Jharkhand had already started on 15th Nov, 2000 of the 20th century. After that many industrial units had been chronologically set up in this region. Among them Tata Iron & steel company Estd., 1907, Indian Aluminum Company, Moori Estd., 1938, Fertilizers Company, Sindri, Estd. 1951(Now closed) HEC, Hatia Estd., 1958, (now closed) & Bokaro Steel Company Estd.,1964 etc are important.

Apart from it, Kodarma & Surrounding areas of nearby, several Mica industries in Tundi (Dhanbad) Copper refinery unit in Mau stock, Ghatshila Hindustan Copper Company etc. have actively promoted the Industrial development here, VC has been established in the year 1948, by which electrical productivity has also an important role in the Industrial development of Jharkhand.

Introduction

Jharkhand Industrial Policy-2001 was formulated and implemented after the creation of the state of Jharkhand. The basic objective of the policy was to optimally utilize the available resources in planned and systematic manner for the industrialization of state. It was aimed at enhancing value addition of the natural and human resources in efficient manner to generate additional employment and recourses for the growth and development of the state.Considerable progresses in industrialization has been achieved the during policy period. As many as 26 mega industries, 106 large & medium industries and 18,109 micro and small industries have been set up in the state during the period with an approximate investment of

Rs.28,424.06 crore & about 63,000 people thus far got employment in these industries. It has contributed to the revenue collection of the state besides improving the quality of life in certain pockets like Jamshedpur -Saraikela- Chaibassa, Ramgarh-Patratu- Latehar-Hazaribag, Chandwa, Ranchi - Lohardaga , Bokaro - Chandankiyari - Dhanbad , Giridih etc.

Jharkhand is one of the youngest states of the union of India. In Jharkhand the process of Industrial development has continued for one century but its growth rate is very slow, especially after 1970 the inter activities have been gradually decreased. Although, If we analyses the physical background of Jharkhand it appears clear that several natural factors are available here for the development of industries such are as follows:-

Damodar Vally, North Koyal Valley and Hills of Rajmahal have the best qualities of coal stocks which is not only famous in Jharkhand but also in India. Today Coal is the most important source of energy production in India.In different areas of Jharkhand many types of Metallic minerals such as Iron ore, Copper, Bauxite etc. are presentbeside these non metallic minerals such as Mica, asbestos, lime stone & Dolomite are available The establishment of DVC in 1948. The development of many coal based power stations which are functioning at pataratu, Bokaro, Chandrapura & Sindri are located. In deciduous forest of Jharkhand and many types of strong & long lasting stock of logs Lakh, bamboo, Thickets , Tendu leaves Timber leaves Medicinal Plants and some hidden wood products are found.The water supply for Industrial works have been possible by the presence of several rivers such as Swarnarekha, Damodar, Sankh, North Koyal, Baraker, South Koyal, karo, kharkari etc. On account of the availability of coal in Jharkhand, the process of development of railways had been started in later 19th century. Today many eastern & south eastern branches of railway pass Through it and by which means raw & prepared goods for transportation have been possible . Various National highways such as- NH 02,06, 23,31,32,33,78 &80 also pass through this area.Most past of Jharkhand in made up of ancient Archaean granite and gneiss. There fore , for the building of Industrial units & constructions earthquake proof and are available in sufficient amount. Due to rough ups & down surface of hill, many small & big rivers have bred several waterfalls, with the help of that various small hydral power stations could be developed. The import and export has become easier due to the nearness

of Kolkata port. In additional to that a big marketing centre is available. It is also one of the richest states of India in terms of mineral resources.

TABLE-1

Minerals	Quantum (0000t)
Asbestos	40
Apatite	3070
Barites	15
Bauxite	68135
Coal	6208485
China Clay	45930
Chromate	334
Copper ore	108690
Cobalt (m.t)	9.00
Dolomite	29864
Fireclay	50462
Feldspar	5152
Garnet	72
Granite(000cm.m)	19105
Gold Ore	7.20
Graphite	389678
Iron Ore	308326
Manganese Ore	2363
Kyannite	90
Limestone	964917
Nickel ore	9.00
Mica	13554
Quartz (Sillicasand)	135429
Talc/Steallite/Soapstone	289

Quarzite	219842
Vermiculale	15.024

Source: Majore Mineral Reserve in Jharkhand

As large as 40% of the total minerals of the country are available in this state . The state is the sole producer of cooking coal Uranium & pyrit. It ranks first in the production of coal , Mica Kyanite and copper in India 80% of the Coal & 100% of the Cooking coal, 50% of the bauxite and epetite, 40% of the iron & 95% of the Kainite resources in India. The J M D C website claims that the geological exploration & exploitation of gold, silver, base metals precious stones etc. are the potential areas of futures.

Table_2

Year	All India (per Capita) (Rs.)	Jharkhand (per capita) (Rs.)
2004-05	24143	18510
2005-06	27131	18326
2006-07	31206	19789
2007-08	35825	24789
2008-09	40775	25046
2009-10	46249	28223
2010-11	54021	34721
2011-12	61855	36554
2012-13	67839	40238
2013-14	74380	46131
From CAGR 2004-2005		
To 2013-2014(%)	13.32%	10.68%

Per Capita SDP Vs. Al GDP at Current Prices (Rs.)

Source: Dainik Jagaran, Dhanbad. P.11 Dated 22.01.2016

The state has been, consistent in maintaining its per capita SDP significantly lower than all India GDP over the years since inception. While it was 76.77% of G D P in 2004-05, it has rather fell to 62.02% in2013-14 .Real

Growth Rates of state the Jharkhand at constant prices as seen alongside also shows that except for the year 2012-13, SDP of Jharkhand has always grown at a rate lower than growth of India , if we ignore the year 2006-07 when the growth over 2005-06 had been slightly over GDP rate of growth.

So, we find that the state has very rich recourses but poor production and slow growth of the SDP. Obviously, the state is home to a poor populace despite being rich.

Table-3

State	BPL Population %
Orissa	32.59
Bihar	40.69
Chhatisgarh	39.93
Jharkhand	36.96
Uttrakhand	11.26
M.P	31.65
All India Average	21.92
Punjab	5.26
Chandigarh	21.81
J & K	10.35
Goa	5.09

Source : https.

The statistics supports this assumption we see that Jharkhand has a major population living below poverty line. Next only to orissa, Bihar & Chhatisgarh, Jharkhand is one of the only four the Indian States having more than 32.59% of population below poverty line. while that of India (Table-3) stands at 21.92 % .

It is necessary to ponder and introspect why Jharkhand has not been able to establish itself as an Agro-industry state with the available wealth of forests, cultivable land and age old Industries like TATA Steel, TELCO, HEC, even BSL for last more than 45 years. It is also to be pondered that SDP growth rate has not been very encouraging since it's becoming a separate state. In such situation, it is not very important to enquire explore establish or explain the

comparative position of Jharkhand vis-a-vis other states in terms of Industrial development. As its 23% area is covered by forest and nearly 35% is over mines there is limited scope for Jharkhand to become a Punjab of Agriculture with only around 45 per cent land area being arable and that too having Archean metamorphosis as most dominant hard rocks in the State .So, if it has to improve its state of affairs, Jharkhand cannot think of doing so without having a high pace of Industrial Development.It is with this backdrop that we shall discuss something about factors for Industrial Development and shall expose ourselves to certain questions that need to be pondered upon seriously so that answer can be found out for achieving real ground-based development.

PRESENT INDUSTRIAL SET UP OF JHARKHAND

Tata Motors ,Tata Steel Heavy Engineering Corporation and Bokaro Steel Plant are the biggest industrial assets of Jharkhand. Public sector units established in Jharkhand include -Metallurgical and Engineering Consultants India Ltd (MECON), Hindustan Zinc Limited , National Mineral Development Corporation (NMDC) , Pyrex Phosphate and Chemical Limited and Indian Aluminium Company Limited. There are a number of medium and small-scale units in the State manufacturing a variety of products. Besides, a number of business giants like Rungtas, Birlas, Bajaj and poddars are associated with the state.Many foreign and national industry leaders like Posco, JSW, and Arcelor Mittal are interested in associating with the state. BCCL produces the best varicity of coking grade in the courtry. Following are the different varities of coking coal and washed coal produced in the collieries of BCCL - coking-coal, semi -coking coal NLW-coking coal, non - coking coal, hard coal, washed and beneficiated coal, middlings & rejects. BCCL caters to coal demand primarily in the states of Jharkhand & W.B. across industry sectors namely power and steel. It also supplies coal to priority fertilizer companies in Punjab and Haryana.Principal reasons for this include availability of basic raw material and cheap labour. At present, there are three industrial development authorities under industrial policy of the government. These are as under:-

Adityapur Industrial Area Development Authority, Adityapur(150 acres), Bokaro Industrial Area development Authority, Bokaro (755 acres) and Ranchi Industrial Area Development Authority , Ranchi (975 acres).These agencies are responsible for development of infrastructure like roads, drainage, parks, water supply , public utility etc. Within industrial areas under their jurisdiction.

SUGGESION FOR IDEAL INDUSTIAL DEVELOPMENT OF JHARKHAND

Though Industrial development is influenced by several social , political, economic and even psychological factors; it mainly depends on political will, Commitment of Statutory Authorities and exiting Industrial units. For accelerating development of industries in any region, it is essential to have the facilitating factors strengthened and inhibitory factors restrained. The important factors are discussed below-

INFRASTRUCTURE

Efforts need to be made by the State Govt. to provide quality infrastructure to investors like all weather road, uninterrupted power supply, adequate water,connectivity through railways etc. In the development of industries the availability of means of transport and communications are important. It includes telecommunication, air service road and rail links for movement of men and material both within and outside the State. Growth in infrastructure not only alleviates the supply side constraints in industrial production, but also stimulates additional domestic demand required for industrial growth. A brief account in the context of Jharkhand is as follows:

ROAD NETWORK : The Road network of Jharkhand includes 1600 km of national highway and 2711 km of State highway. India as a whole has 66,754 km of National Highways and 1,28,000 km of State Highways. Improvement of existing road networks, widening busy roads, provisions of new road linkages/bypasses with bridges over rivers, development of Inter State & intra- state bus terminus across the state etc. are certain measures that would aid further development by facilitating quick /efficient movement of raw materials and finished products. Besides length, quality of road network is equally important. Jharkhand has a long way to go to improve the Safety and security related issues with Road Transport through the State.

RAILWAY : Rail system in the State provides links to major cities and ports in India. Important mining centers in Jharkhand are well connected by rail. Handling facilities for goods are adequately available at Ranchi, Bokaro, Dhanbad, and Jamshedpur. In addition, ore loading facilities are available at Kiriburu, Lohardaga and all the coal mines. Development of Inland

Containerization facility in the state may help to facilitate movement of export cargo. Connectivity of the state with major trade and business centers of India like Mumbai, Kolkata, and Bangalore etc. is still poor.

AIR SERVICE : There is immense potential for improvement and up gradation of Air transport infrastructure in Jharkhand. Ranchi is connected with Delhi, Patna, and Mumbai by air service. Airstrips are available at Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Giridih, Deoghar, Hazaribagh, Daltonganj and Noamundi. A deveopment Air Cargo complex and regular Air Taxi/Cargo Service in major towns in State may be a further fillin.

SEA ACCESS: Being a land locked state, Jharkhand routes its export shipments through Kolkata and Paradeep ports. Having a dedicated berth for the state at Haldiya and Paradeep ports would facilitate export/import cargo. Navigational infrastructure can be development on Suvernrekha and Ganga to provide inland water transport facilities to facilitate seaport access.

TELECOMMUNICATION: The telecommunication network in the State is enabled through presence of major telecom service providers, Six Internet nodes of BSNL including 'A' category node at Ranchi Optical Fiber Cable media connectivity in all district HQ, Local Dialing Internet access throughout state etc. However, an effectively narrow broadband is a major concern.

ENERGY/POWER : Adequate/uninterrupted supply of power is an essential input for sustained industrial growth. Jharkhand has a total installed capacity of 2590MW. Although exact data related to power deficit for Jharkhand is not available. The state proposes to promote increasing use of renewal and environmental friendly sources of energy.The per capita energy consumption of state is low (552KWh) as compared to the national average consumption (720KWh).The state Government has targeted to achieve cent percent rural electrification.We do not need statistical evidence to know that Jharkhand performance is poor compared to other Indian state. The deficiency in power situation is the main impediment for healthy industrial growth. Voltage fluctuations and frequent power cuts result in production loss and erosion of cost competitiveness of industries. Also, rural electrification has considerable potentialities for the development of small industries like carpentry, blacksmith etc. To improve the situation, it is necessary to make the working of State

Electricity Board more efficient. With a number of waterfalls, rivers and huge coal belts, the State has immense potential for power stations and non-conventional energy Other options include privatization of electricity. Another area of concern is the transmission loss of power. Power suppliers are always worried about the huge transmission losses caused not by the bleeding power lines but by the doctored energy meters.

GOVERNMENT MACHINERY: Government machinery, with in the given policy framework, may be proactive, neutral, indifferent or even restrictive in its approach. Any state can impact the regional Industrial development most directly through its machinery even more than through its policies. proactive machinery can be the most potent tool in the hands of people of any state to enable all-round development including industrial. The important point here is that data cannot establish the extent of enabling attitude of government machinery. Withdrawal of multinational companies and non-participation of reputed infrastructure service providers can be an indication of our lack of will to industrialize our state. Self-analysis and introspection by the government functionaries coupled with effective training and development intervention for them by government are the only ways to indentify rooms for improvementand to effect those improvements.

GOVERNMENT POLICY: A forward-looking industry policy with due emphasis on bridging the gaps and benchmarking with best practices elsewhere can surely accelerate development of industries in any state. The policies should not be repetitions of the beaten path, statements of intentions without complementary procedures, or susceptible to bureaucratic misinterpretations. Ambiguity, rigidity and porosity in policies are great restrainers of industrial development and practically every state needs to revisit their policy for possible imperfections in view of contemporary realities.

GOVERNMENT PROCEDURES AND MECHANISMS: In order to ensure that Industries are set up and run without sacrificing the overall social development plans, it is essential that these be subjected to rules, regulations, procedures and supervision. This is achieved through governmental mechanisms of clearances, leasing, licenses, permits, registration, reports, returns, inspections and controls. These procedures and mechanism are necessary and are aimed at

balanced social development including those of industries. However, if the procedures and mechanisms become unduly cumbersome, they would impede industrial development particularly if the procedures and mechanisms in one state are restrictive and other drivers of competitive advantage are similar in other states, the entrepreneurs would surely prefer the latter. Every state should endeavor to examine its procedures and mechanisms vis-a-vis other state and make necessary adjustments towards simplifications of rules.

Land acquisition : Land acquisition for major project and factories is the main problem of Jharkhand today . Because here CNT Act , 1908 is effective in today Rehabilitation & migration problem is also a disturbing elements. Strong & strict rehabilitation act should be constructed.

LAW AND ORDER : Appropriate and legal system of law & order & peaceful atmosphere should be constructing. General law and order status of state is always an important determinant for decisions of business houses about setting up industry in the state. Jharkhand needs to create a confidence amongst all concerned that the general law and order situation in its territory is better than what is perceived today. Investors need to be made to feel that they are safe and their investments are secure in the state.

INSURGENCY : A serious detriment to any effort of Jharkhand for encouraging industrial development in the state is the widespread belief that the areas is challenged by insurgency . The problem is one of socioeconomic nature having political and criminal hues. Tackling the same in right earnest with due sense of urgency is necessary.

AVAILABILITY OF FINANCIAL RESOURCES : The bank coverage of Jharkhand is good enough. Jharkhand had 1119 bank offices and they had lent Rs 10,560 Crores - around 47% of that being in priority sector.But, industrial development in the state may be accelerated if banking system is more generous in financing small entrepreneurs in Small-Scale, Rural based and labour intensive industry projects.

FACILITATE THE GROWTH OF LABOUR INTENSIVE INDUSTRIES :

Labour laws and labour market regulations need to be reviewed so as to facilitate the growth of labour intensive industries.But, industrial development

in the state may be accelerated if banking system is more generous in financing small entrepreneurs in small-scale, Rural based and labour intensive industry projects.

R & D, grow skills and Innovation : To have commendable industrial development, it is necessary to technologically upgrade the manufacturing units by incorporating contemporary methods of production resulting into value added items. The swiftness and efficacy in skill up gradation, facilitation of technological innovations and promotion of research and development are areas of immediate concern for the industries operation in this region. That will aid to their development and to the development of the state. Strengthening and encouraging further the various research institutions operating in the state under aegis of SAIL, CIL, CSIR etc. as well as the important technical ones like NIFFT, ISM, BIT Mesra, BIT Sindri and management institutions like XLRI, XISS etc. should be helpful in aspect. Entrepreneurship Development : Entrepreneurship Development programmers at XLRI, Jamshedpur has already has been started and the second batch of trainees are being trained the programmers is proposed to be continued further.

Role of Ancilarisation : The aspect of anciliarisation would require some serious thought. Strengthening ancillary development by large industries is prima-facie considered the panacea of industrial development. That may sometimes prove quasi-truth.It is undisputable that ancilarisation is beneficial both the large industry and their ancillaries at their nascent stage. The former get access to nearby capacities for parts and spares while the latter get assured market conducive for investment.But as the industries age, the large one induces entry of other suppliers into their supply chain and some ancillaries also grow appreciably. The truly efficient ancillaries grow well and transcend dependency on parent industry. They get entry to bigger world of customers. The average efficient ancillaries too become developed into cost and quality competitive suppliers. However, the ancilarisation serves as a detriment to development of the not so efficient me-too type ancillaries. These are the ancillaries who invested because of assured customer and survived because of it. They now after coming up age, face severe competition from external suppliers to the parent industry as well as the above two categories of ancillaries. The parent industries- in their own quest of quality and cost competitive advantage in the market - find it

difficult to patronize the me-too ancillaries. They bootstrap themselves a little and pull up the parent a little whenever the survival becomes at stake . This struggle and sometimes combat for survival gives them life for a while - sometimes at the cost of other ancillaries and also the parent.

This state of affairs is detrimental to development of both the ancillaries and the parent. There appears to be a need that the large industries periodically review the development and growth status of their ancillary to relieve the well grown ones from ancillary status, to help growing ones and also to motivate the truly complacent ones to find a place in the big wide world of competition without relying on ill-deserved crutches.Most of units making auto parts. forgings/casting are either tied up with Tata Steel ,Tata Motors , HEC and BSL or are selling their products in the local market . This domestically centered approach of these units has not allowed them to think beyond. Outward orientation of these units is necessary for preparing them to undertake growth.

CONCLUSION

Industrial development is necessary to be encouraged in Jharkhand to improve its GSDP and Gini Coefficient. A lot needs to be done by Industries. Public Servant, Public representatives and Government. Sectorally differentiated initiatives may be required in various industry sectors and action areas. Much study, thinking and research is required by scholars and development organizations to find out exact opportunities of action and to benchmark Jharkhand with its neighbors, its same age states and also the best practice states in different aspect. Jharkhand can be enabled to earn its due place on the map of India. Honest pursuit in this connection can make the way easier. But today some regional as well as local problems suppress the way of development . Solution of such rehabilitation and migration problem should be resolved. severe and stern measures could be taken to get rid of the problem. Tough policy be made so as to sustain the inhabitants of Jharkhand. In this respect it is clear that all natural resources are available in Jharkhand. The only need is to implement such resources & to make an ideal Co-ordination between them. The history says that a nation develops through the coordination.

References :-

1. Jharkhand Industrial policy 2001 & 2012.
2. Jharkhand General knowledge, lucent publication.
3. J L J R., (various Issues). & J B C J., (various issues)
4. The Possibility of industrial development in Jharkhand - Accst., Research Journal, Siwan, Bihar. [Vol. VII(2),April, 2009] , PP. 92-96
5. Economic Survey (various issues) .
6. Economic Development & Planning of India, SBPD. Publications, Agra.
7. Institutional Finance & Industrial Development, Scientific Book Agency, Calcutta. 1977
8. B S F C., Annual reports (Various issues).
9. Institute for social development of Research, Ranchi , Jharkhand
10. Journal News paper & others etc
11. Jharkhand and industrial Development - 2008, PP. 1-7. www.Google.com.

Dr. Manoranjan Singh, Guest Lecturer, Deptt. of Commerce and B.B.A.
R.S.P.College, Jharia, Dhanbad

A Study of Dhanbad District Revenue Administration in Jharkhand State

Sharmila Sengupta

INTRODUCTION

This study aims at delineating creation aspects of Revenue administration of a district (Dhanbad) in Jharkhand state .The study of district revenue administration at a macro and micro levels occupies a significant role in the investigation and analysis of the different facts of the Indian Administrative system. Outwardly what happens at the nation level has its root in the state administrative system in which operates at the district level in turn has its impact on the state politics as well. The micro study of the district revenue system clearly explains the varying Administration of the evolutions. Growth and working of the district revenue Administration (and its functionaries).

In the Indian Administration district as a main Administrative unit plays a significant role, as it maintains linkage with state administration and national Administration.

The political scientists have so far concentrated on National administration and to some extent on state Administration. But the district as a unit of study has been neglected.

An attempt has been made to highlight importance of district revenue Administration in the newly emerging pattern of state and national system of Administration.

The district of Dhanbad, although a new district (created after the state Reorganisation commission's Reports, 1956-57 occupies a key place in the revenue Administration of the state of Jharkhand. It has also significant place in the national economy due to rich mineral resources and industries. Its revenue earnings a very very significant place in states exchequers as well as on the national Exchequers and role of the revenue Administration of Dhanbad districts become doubly important because of richness of mineral resources and as a result of huge quantities of revenue earnings to state and central government being essentially and industrially and mine rally rich district. Dhanbad has all the ingredients of a traditional as well as a modern society the most characteristics of the population of the districts is that its dependence

on a mineral and industrial economy. Only a fringe of the population depends on agricultural operations. To the revenue collection in this country Is very poor and negligible. In this way it varies from the districts of the northern and central districts of Jharkhand.

The purpose of this study is to critically examine the present system of the revenue administration, its structural hierarchy its varying roles and shortcomings. It has also been though appropriate to suggest remedies for the shortcoming in this system augmenting of the resource becoming more important because of the present day financial crunch faced by the Government. For the further development of the areas and for performing large number of welfare activities this availability of funds are required. The district revenue can in no small measure contribute in this regard.

The familiarity of the system in our state was also a crime factor motivating the present scholar to undertake this study.

The Dhanbad revenue Administration a case study is taken for in depth study because of the fact that Administration is last realm of affairs. For the purpose of micro study only the revenue Administration of district was taken for this study. Primary because it is considered that revenue system constitutes the core of the Administration. For a successful and effective Administration system of this part Administration deserves more attention of civil servants, government, people and politicians alike.

The source of this study constitute a large number of Government circulars revenue manuals records (old and new), acts and other legislative enactments in the record room of the district and the collector's revenue section of the district.

A good many book by the learned writes of public Administration are available. They had been of some help to the present scholar. District Gazetteers (old and new) papers, records, charts and registration of revenue Department officials of the district had been properly utilized with due courtesy of the officials and journals and some archrivals for background study has also been utilised in this study.

The present in-depth study pinpoints the shortcoming of a system. The present scholar has taken the liberty to suggest the remedial measures for for augmenting the revenue receipts and also to removing other defects in the working of revenue Administration the district level.

BACKGROUND

(Pre-Independence and Post-Independence Period)

After independence much importance has been the given in the Indian constitution to the Development of district and its rural areas. The district is a very important unit of Indian Administration. In the Indian Administrative structure state Administration has been divided into districts the importance of the district is increasing day by day. In pre independence days the functions of district Administration were collection of revenue and maintenance of law and order. But in the post-Independence day the function of the district Administration have been diversified. The micro economics changes have added new dimensions to the responsibilities of all around development of areas of the District Administration. So far development is concerned; a district has been made an important and very crucial unit.

District Administration or Collector ate type of Administration had been introduced by the British east India company as early as in the time of Lord Cornwallis. But the origin of district as an unit of Administration can be traced back to Vedic age. In ancient India the state was divided into a number of units for convenience of Administration.

The Districts Administration include Magistrate as the head and the Police Superintendents Headquarters and district zail, Addl. Collectors subdivisional officer, Block Development officer, circle officer, circle inspector, Nayab Tahasildar (in U.P and M.P) Dy. Superintendents of police, treasury officer, District Judge and other important functionaries in Jharkhand Functionaries are Known as Dy. Commissioner Addl. Collector, Subdivisional officer, Block development officer, circle officer, circle inspector etc. their Functions are maintaining peace, collection of case etc.

The concise oxford Dictionary defines district as a Territory marked off for special Administrative Purpose. This fairly well defines what exactly a district in India is.

Administration is the management of public affairs.

Thus, Districts Administration is the management of public affairs within a territory worked off for the purpose. The history of revenue Administration is very old. We found land Revenue Administration during the Mughal period too.

Babur and Humayun allowed the land revenue system of the sultanate period in existence and generally collected revenue on the basis of old records without surveying the land and ascertaining the actual produce of the soil.

The land revenue Administration of shear shah was a great improvement upon that of sultanate period.

Sher shah changed the system of assessment of land revenue and also introduces some Improvements in the method of its collection. He aimed at introducing a system of land revenue where the cultivator was asked to pay primarily in kind one-third of the expected produce of the crop from the land under cultivation. Land was measured and the name was record against every cultivator. The unit of measurement was the yard of Sikandar Lodi, 32 digits long and average of the produce for a Bigha for every crop was stick by taking the produce of the beat the middling and the worat land for a very crop. A per bigha schedule of rates in kind was prepared for every crop and the cultivator was required to pay according to the areas he had under various crops. Every season the amount of the areas under each crop was entered in the records for the every cultivator against his name. The areas were supposed every season, but it is possible that original measurement prepared at the time of the introduction of the system served the purpose later on also. The record of the holdings cultivators were detailed and showed not only the entire areas cultivated by him but also its subdivision. Latter on, it was considered enough to record the sub units under cultivation, and their areas could be copied from the earlier records.

The village land revenue was collected by the village headman. The revenue officials gave to the village headman the demand alips indicating was every cultivator had to pay. It appears that all the headman did their best to collect all the money due from the cultivators, as it was mandatory on them to pay into the exchequer the amount due from the villagers under their control. Cultivators were given receipts for the money paid by them so that there may not be double payment. A patwari kept the accounts for one or more villages on behalf of the cultivators.

The pargana was the main unit for revenue collection. It consisted of a large number of villages. The shiqdar was responsible for the collection of land revenue. He had one clerk to help him to keep local records in the local

language. Another clerk prepared the records in Persian for submission to the capital. The shiqdar for sending to the centre all the revenue collected, whether in cash or in kind according to the orders. There is also a mention of an Amir or a collector-in-chief who was at the head of the revenue establishment

STRUCTURAL HIERARCHY

There is no uniform Administrative practice regard to number of intermediate links or agencies between the state Government headquarters and the districts. These links or agencies are found in two categories. In the first category, there is the group of southern states namely- Madras, Kerala, Andhra Pradesh which have only one intermediate link in the form of board of revenue. In the second category there is provision for two intermediate agencies in the form of board of revenue and divisional commissioner. This second category of Administrative practice is followed by the largest number of states: - Bihar, Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Assam, Odisha, Rajasthan, and Karnataka. Thus in Bihar we find two intermediate agencies - Board of revenue and divisional commissioner - between the states headquarters and the district.

According to hierarchical forms the revenue Administration in Bihar, now Jharkhand is divided into following levels:-

(1) Secretariat
(2) Board of Revenue
(3) Commissioners
(4) District
(5) Sub-Division
(6) Circle.

The organ which plays a pivotal role in a state Administration is called the Secretariat. East state has its own Secretariat which is located at the capital. The Board of Revenue is the creation of East India Company. The latter formed the board of revenue to relive is of the detailed work in the field of both revenue Administration and general administration. In the field of revenue Administration it attend to both administrative and judicial work it is the head of the hierarchy of revenue courts.

The judicial work of the board is to hear appeals from the Divisional commissioners, District Collectors and other Subordinate Executive magis-

trates, while the administrative work of the board is to look after the entire revenue Administration of the state and also the collection of areas of revenue due to other departments.

The main functions of the board of revenue may be summed up as:

(1) Appellate authority to her appeals and revisions in revenue cases;
(2) Charge of revenue administration;
(3) Duties under various statutes;
(4) Selection of officers for creation posts and transfers and promotions of officers of a certain category and
(5) To tender advice to government. All matters which affect governments policy and not only these dealing land revenue and other revenue matters are referred to the board for the advice of the member who are a core of senior officers on whom government can rely for experienced and mature advice. It also assists governments in any enquiry of some importance. The board conducts departmental enquiries into the conduct of creation categories of officials and hears appeals from officials against whom departmental disciplinary action has been taken.

For Administrative convenience each state is dived into number of regains or divisions and maintains, regional Headquarters' in each region headed by a regional officer.

ROLE DIFFERENTIATION

(Administration Work and Responsibilities and Development Work, Revenue Work)

In respect of District Administration and local self government each organ of local Administration or area Administration executes a prominent role. The head of this local Administration is the district Magistrate who perform important job being sub ordinance to the state state government. Balwant Rai Mehta committee in 1957 and after Ashok Mehta Committee's report 1977, efforts were made to bring about the required Development in the District level.

Pandit Nehru had firm belief in democratic process. It was on his initiative

That community Development programme was launched in 1952. After spending much on community development programs and claim of achieving big success a study team was appointed in 1957 for its investigation Mr Balwant Rai Mehta was the chairman of this study team. At the end of 1957 Mehta Team in its report recommended for immediate setting up of Panchayati Raj Institution to achieve to success through democratic decentralisation and community development programme.

The study team named it as democratic decentralisation.

Indeed, Article 40 of the constitution of India articulated that the state "Shall take stapes to organise village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self Government".

Panchayati Raj is being set up in India in order to give a corporeal shape of the Principles of democratic decentralisation. The government appointed a committee under the chairmanship of Sri Balwant Rai Mehta to make effective this principle. This committee emphasized the need of strengthening the democratic bodies for the success of democracy. For this the committee recommended for the implementation of the democratic decentralisation policy.

THE WORK OF REVENUE COLLECTION AND ITS MACHINERY

The revenue administration in Bihar now Jharkhand is reckoned as one of the most complicated and subtle organ. District Administration mainly revolves round the revenue Administration. The head of the revenue administration is district Magistrate that's why he is known as collector too. In Chotanagpur he is known as Deputy Commissioner.

Land revenue and the collection of revenue provides the function which gives the head of the district the designation by which he is more commonly know them by only other collector. Although there are revenue and other collectors of all kind the term in its application to this particular functionary carries overtones of something rather prestigious and powerful. Essentially, however the district collector is exactly what the name says a collector of revenue "collector is the pivot of the revenue and general administration".

The Chotanagpur Tenancy Act, 1908 plays an important role in determination as well as collection of revenue in Bihar now Jharkhand. This act:-

for section 244 of the Chotanagpur Tenancy Act, 1908 the following shall be substituted namely:-

244 recoveries of the arrears of rent under the certificate picadors where there is a record- of rights:-

(1) When an arrear of rent accrues in respect of a Mundari Khunt tenancy for which a record of rights has been prepared under this act or under any law in force before the government of this act,

No suit shall be maintainable in any court for the recovery of the arrear; but the Land lord may apply in writing to the deputy commissioner to sign a certificate authorising the recovery there of with ample interest not exceeding twelve and a half or (in the case of money recoverable under the case act, 1860) at twelve and a half par centum per annum, under the Bihar now Jharkhand and Odisha public Demand Recovery Act, 1914.

(2) Every such application shall be signed and verified by the landlord making it, in the manner prescribed by rule 1 in schedule IT to the said Act, as amended for the time being by rule made under section 48 there of; and shall be chargeable with fee of the amount which would be payable under the court fees Act, 1870, in respect of a plaint for the recovery of a sum of may equal to that a tatted in the application as being due.

(3) Upon receiving any such application the deputy commissioner may after making such enquiry and taking such evidence as he may consider necessary and if he is satisfied that the arrear is due sign a certificate in the prescribed form stating that the arrear is due; and shall include in the certificate the fee paid under sub-section (2) and shall cause the certificate to be filed in his office.

(4) The person in whose favour any such certificate is signed shall be deemed to be the certificate-holder for the amount mentioned in the certificate and the person against whom the certificate is signed shall be deemed to be the certificate-debtor for the said amount: and all proceeding taken by the certificate

officer for the recovery of such amount shall be taken at the instance of the first-mentioned person, and at his cost and on his responsibility, and not otherwise. There is a record room in the District office of Dhanbad for for the Preservation of Documents realating to Revenue. Racks, in well manner, are arranged in this record room to keep the records. Record settled cases, submitted departmentally, are kept in these racks.

CONCLUSION

While analysing critically the existing system of revenue Administration in Bihar now Jharkhand we found many demerits or shortcoming in the existing system.

This system is based on age-long 'The permanent settlement of Bengal' drafted by Lord Cornwallis in 1973.

The permanent settlement Regulation of 1973 (by Lord Cornwallis) dealt only with the interest of landlords.

A top-moat Politician and communist leader of our country who has been in the chair of the chief Minister of West Bengal for the last 16 year has also criticised the permanent settlement system. According to him "This administrative reforms transplanted from Britain which had the unintended result of creating an unjust and parasitical social order. It disrupted village communities, eroded their self-sufficiency, created a class of absentee landlords and retarded agricultural development".

It was also noted by the present scholar that the Deputy Commissioner of Dhanbad was also not satisfied with the present system of revenue Administration. According to him the revenue Administration of Bihar now Jharkhand is based on 'the Permanent Settlement of Bengal' which is very old and is continuing since the period of Lord Cornwallis. During those periods the lords the intermediaries and the farmers were the main deciding factors for determination of amount or quantum of taxes, collection of revenue. But situation are changed now and due to the abolition of Zamindari-System, the role of the intermediaries has ended. Even then no change has been made in this system to accommodate present day requirements and needs. Besides in this system lots of disputes arise during the curse of dividing lands among the shareholders. These disputes can be solved by mutual understanding failing

which the affected parties file 'title suit' in a civil court and the court generally takes a long time to decide the case. And ultimately the revenue work is affected due to this problem.

The Additional Collector of Dhanbad is, however, completely satisfied with the existing Revenue Administration System but at the same time he suggested that more alternates is needed to achieve the objective of effective execution of the revenue machinery.

The land revenue administration and land records system have also not been subjected to an in depth study and a cru tiny in the country as a whole. Land records in the country are not in a good shape. While some parts of the country were without any land record system, in large parts of a country land records have not been updated as provisional surveys had not been carried out and periodical updating through autations correction of maps and crops enumeration is also generally is huge arrears.

Major difficulty experienced in updating land records was that the land revenue administration had not kept pace with tasks assigned to it after the importance and infrastructure facilities and suffered neglect in allocation of research.

Two important problems of the office of the collector in India needs re-examination the function of the collector, and the type of people who can be ant rusted with his responsibility. The social and political changes that have taken place in the country have raised new problems for any collector who has come to preside over the administration of his district. At circle levels also few short coming of this system are found the lack of proper coordination between a circle officer and a Mukhiya is one of them. In many blocks sometimes the uneducated and corrupt people are elected as Mukhyas. In this situation if the circle officer happens to be honest an awaked situation and strained relation always prevail between them and this effects the revenue works badly.

Reacting to the question on the performance of his sub ordinate officers and staff the Deputy Commissioner of Dhanbad said that although the performance of some of the officers and staff were not up to the mark but on the whole he was quite satisfied with the performance and activities of his sub-ordinate officers and staffs.

Common people always believe that the instances of corruption are often noticed in the land reforms Deputy Collector's court and in the circle officers. But the Deputy Commissioner of Dhanbad denied this charge vacantly. Although the additional collector of Dhanbad did not deny it. But at this some time he countered the charge by alleging that meat of the time people themselves offer bribes for illegal work failing which they makes false charges of corruption.

The Deputy Commissioner should be kept away from political pressurisation by the political parties and their activities. He should not be made 'overburdened' with responsibilities.

The Deputy Commissioner should be allowed to away at a place for a sufficient period so that he could face the Challenges of the administration effectively. Then only the District revenue Administration can perform the allotted revenue work properly and efficiently.

Now each state in India has launched the Panchayati Raj Yojna. As such now a district magistrate has to take after multiples of assignments at a same time. To discharge these multiple assignments it is necessary for the District Magistrate to established proper co-ordination with his Sub-Ordinate officers and staffs.

The circle Inspector, Kanungo, Karamchari, other also enjoy significant role n the maters of revenue administration. Hance special training program should be arranged for these staffs to carry out the revenue work properly.

The work of revenue collection in Bihar become easy and convenient with the all round Co-Operation of all Administrative machineries functioning under the revenue Administration. The Percentage collection of land revenue in Dhanbad district is quite satisfactory as per the version of both the Deputy Commissioner and the Additional Collector.

State of Bihar also earns royalty from various coal companies. Being industrials areas so many industries and factories are running in the district of Dhanbad. The Government collects 'Tikuri Rent' from these Industries Factories. It may be suggested that the amount of rent collection at present is fixed or determined long ago revision of rates of rent is overdue. The state Government can raise the rates. It will increase manifold the revenue receipts of the state.

It has been observed that in urban areas of Dhanbad District, the nature of land has enormously changed. The agricultural lands, due to vast increase of the population, are being converted into 'Homestead' lands. If proper Verification and survey work is done on these lands a good source of income will emerge out. The quantum of 'Salami' with higher rate of rent may be collected. Naturally this will result in huge increases in revenue receipts of the District. Thus it will contribute its share in the total revenue earnings of the state. It may partially meet the financial crisis, facing the State.

References -

(1) Indian Government and Politics, Pragati Prakshan.
(2) Public Administration, Ratan Prakshan Mandir, Agra, 1978-79.
(3) District Administration in India, Asia Publishing House New Delhi, 1965.
(4) The Mughal Empire, ShivLal Agarwal & Co., Agra, 1976.
(5) Mughal Rule In India, Chand & co. Ltd., New Delhi-55, 1982.
(6) Bhartiya Sambidhan Aur Sashan, Bharti Bhawan, Patna, 1980.
(7) Indian Administration, Orient Longman Ltd., New Delhi, 1989, Reprinted 1991.
(8) Revenue Inspections at the District Level, Indraprastha Estate, Delhi, 1965.
(9) Public Administration, Sahitya Bhawan, Hospital Road Agra,1985
(10) Indian Journal of Public Administration, Indraprastha Estate, Being Road, New Delhi.
(11) District Administration in India, Asia Publishing House New Delhi, 1965.
(12) Research Journal of Ranchi University, University of Ranchi, Bihar, 1978.
(13) J.C.J.R. (Journal)
(14) J.B.C.J. (Journal)
(15) News Paper and Others
(16) Journals and etc.

Dr. Sharmila Sengupta, Guest Lecturer, Department of Political Science, R.S.P. College, Jharia